বন্দর

শিবনাথ ভাদুড়ী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৫

প্রচ্ছদ অঙ্কন : গৌতম রায়
মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

আলোকচিত্র
মোনা চৌধুরী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

বন্দর

পিওনের কাছ থেকে রেজিস্ট্রি চিঠিটা সই করে নিয়েই অবন্তী বুঝতে পারল চাকরিটা হয়ে গেছে। আনন্দ উত্তেজনায় হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রথমেই মায়ের কাছে চলে গেল ও।

ঠাকুরঘরে পূজোর আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন যোগমায়া দেবী। বৃহস্পতিবার অন্যদিনের চেয়ে আড়ম্বর কিছু বেশিই থাকে। অসময়ে মেয়েকে ঠাকুরঘরে আসতে দেখে অবাক হলেন তিনি। মেয়ের ফর্সা মুখ উত্তেজনায় রাঙ্গা হয়ে এসেছে। একটু যেন উৎকন্ঠিত হলেন যোগমায়া দেবী তা দেখে। চকিতে মনে হোল কোন অঘটন ঘটল না তো? ওঁর প্রশ্নের মধ্যেই ধরা পড়ল মনের সেই আশঙ্কা।

—কি হয়েছে বিন্তী? তোর মুখচোখ এমন দেখাচ্ছে কেন? কোন খারাপ খবর পেলি নাকি?

লজ্জা পেল অবন্তী। সত্যি এভাবে বাচ্চা মেয়ের মত উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসা উচিত হয়নি। মায়ের হৃদযন্ত্রের অবস্থা খুব ভাল না। বাবা দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর থেকে এই অসুখটি সৃষ্টি হয়েছে। ওরা ভাই-বোনেরা বাড়ি ফিরতে দেরি করলে ভয়ানক দুশ্চিন্তা ভোগ করেন। সমানে ঘরবার করেন। যারা বাড়িতে থাকে তাদের সমানে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

এসব কোন কিছুই অজানা নয় অবন্তীর। তবু আনন্দের উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে এভাবে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত ছুটে এসেছে ও। ত্বরিতে নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তভাবে ধমক দিল মাকে।

—এই এক রোগ তোমার। সব সময় খালি খারাপ চিন্তা করবে। কেন ভালো খবর আসতে পারে না?

ম্লান হাসি ফুটে ওঠে যোগমায়া দেবীর মুখে। জোরে জোরে চন্দন ঘষে অসমাপ্ত কাজটুকু শেষ করতে ব্যস্ত হন।

—সত্যিই এটা আমার রোগ বিন্তী। তোদের বাবার খবরটা আচমকা ওভাবে পেয়ে যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে এই রোগ। সব সময় বুকটা ধুকপুক করে কেমন। তোরা কেউ ফিরতে দেরি করলে মনে হয় আবার বুঝি কোন অঘটন ঘটলো। ভাবি অতবড় দাগা দিয়েও হয়ত খুশি হননি ভগবান। আরও অনেক দাগা রেখে গিয়েছেন আমার জন্য।

মায়ের দিকে তাকিয়ে গভীর মমতা বোধ করে অবন্তী। আগের থেকে অনেক খারাপ হয়ে গেছে শরীর। গায়ের রঙ অনেকটাই ময়লা দেখায় আগের তুলনায়। চোখের কোণে কালি। ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা ঘন হয়ে চেপে বসেছে মুখে চোখে। মায়ের হতশ্রী চেহারা দেখলে কে বলবে একদিন কত অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন উনি?

অবন্তী শুনেছে বাবা নাকি মায়ের সৌন্দর্যে মোহিত হয়েই তাকে বিয়ে করেছিলেন। দাদু ঠাকুমার সম্পূর্ণ অমতে। মামাবাড়ির অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। দাদু ঠাকুমার ইচ্ছা ছিল না বিদ্বান উপযুক্ত ছেলের বিয়ে এরকম পরিবারের মেয়ের সঙ্গে হয়। কিন্তু বাবা বেঁকে বসেছিলেন। বলেছিলেন বিয়ে করলে ঐ মেয়েকেই করবেন। অন্য কাউকে নয়।

উপযুক্ত একমাত্র ছেলের ইচ্ছা অগ্রাহ্য করতে পারেননি দাদু ঠাকুমা। মেনে নিয়েছিলেন তার পছন্দ। যোগমায়া দেবী বউ হয়ে এসেছিলেন মিত্র বাড়িতে। কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীর মন জয় করতে পারেননি। তাদের আপত্তি সত্ত্বেও এ মেয়ে যে মিত্র বাড়িতে পদার্পণ করেছে বউয়ের সম্মান নিয়ে তার জন্য বরাবর যেন গাত্রদাহ ছিল তাদের।

আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাদের মনের জ্বালা দূর করতে পারেননি যোগমায়া দেবী। বাবা মায়ের বরাবরের বাধ্য ছেলেটি তাদের অমত সত্ত্বেও অন্য এক বাড়ির মেয়েকে পছন্দ করে যে ঘোর অন্যায় করেছে তার জন্য দায়ী করেছেন তার ছেলেকে নয়, ঐ মেয়েটিকে।

ঠাকুমার কাছেই অবন্তীরা শুনেছিল যে বিরাট বড়লোকের বাড়িতে ছেলের সম্বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি। মেয়ের বাড়ির সকলেরই খুব পছন্দ ছিল অবিনাশকে। খুব সুন্দরী ছিলনা বটে সেই মেয়ে। তবে লক্ষ্মীশ্রীর অভাব ছিল না তার চেহারায়। আর চেহারার কথা বাদ দিলে অন্য সব দিক দিয়ে সেরা মেয়ে ছিল সে। ঐ মেয়েকে বিয়ে করলে নগদ টাকা আর সোনাদানা তো বটেই বাড়িঘর জমিজমারও কমতি থাকত না ছেলের। যোগমায়া দেবীকে দেখে চোখে ওভাবে রঙ না ধরলে ওখানেই বিয়ে হয়ে যেত নির্বিঘ্নে। এভাবে ভাড়া বাড়িতে জীবন কাটাতে হোত না তাদের।

কিন্তু ছেলের মন এমনভাবে মজে গিয়েছিল যে কোন হিতকথায় কান দিল না। একেবারে 'হাঘরে' বাড়ি থেকে বিয়ে করে আনল। সহায়সম্বলের কথাটাও ভাবল না।

ছোট বেলায় এ ধরনের কথা শুনে অবন্তীরা বুঝতে পারত মায়ের প্রতি ঠাকুমাদের আক্রোশের কারণটা কি? ওরা চার ভাই বোন অবাক হয়ে দেখত মা

এত করছেন শ্বশুর শাশুড়ীর মনোরঞ্জনের জন্য। তবু তাদের তুষ্টি নেই যেন।

শ্বশুর অবশ্য নিজের বুদ্ধিতে চলতেন না খুব একটা। শাশুড়ী নানাভাবে কানভারি করতেন তার। ফলে যা হবার তাই হোত। অকারণে ছেলের বউয়ের ওপর অসন্তুষ্ট হতেন। শ্বশুর শাশুড়ীকে নিয়ে অশান্তি তাই লেগেই ছিল।

স্বামী কিন্তু কোনদিন অশ্রদ্ধা করেননি স্ত্রীকে। বাবা মায়ের সামনে হয়ত স্ত্রীর পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসেননি। কিন্তু মায়ের কাছেই শুনেছে তারা যে আড়ালে নাকি মাকে সান্ত্বনা দিতেন, প্রবোধ দিতেন।

—বাবা মা আর কদিন? তুমি একটু ধৈর্য্য ধরে সয়ে যাও মায়া। দেখছ তো আমি কত নিরুপায়? বাবা মাকে কিই বা বলতে পারি? এক ছেলের বউ হয়ে যখন এসেছ এ সংসারে তখন এসব তো সইতেই হবে।

অবন্তীদের কিন্তু খুব ভালবাসতেন দাদু ঠাকুমা। স্নেহে ভালবাসায় আদরে ভরিতে রাখতেন। তাদের যত রাগ ছিল শুধু ছেলের বউয়ের ওপর। বউয়ের কোন কিছুই ভাল ঠেকতনা। একটু বড় হয়ে মায়ের পক্ষ নিতে গিয়ে অবন্তীরা দেখেছে আরও বেশি বিভ্রাট হচ্ছে। রেগে গিয়ে তুলকালাম শুরু করছেন ঠাকুমা।

মায়ের হোত তখন আরেক জ্বালা। ছেলেমেয়েকে ধরে বকুনি দিতেন। বলতেন ছোটদের সব ব্যাপারে থাকার দরকার কি? লোকে তো মাকেই দোষ দেবে। বলবে ঠিকমত শিক্ষা দেয়নি মা। তাই ছেলেমেয়েরা এমন হয়েছে।

যতদিন বেঁচে ছিলেন তারা ততদিন ও ভাবেই চলেছে। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও শান্তি পাননি মা। দাদু ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর শান্তি জুটল না মায়ের কপালে। অবন্তীর যখন বার বছর বয়স, ওর দিদির ষোল, ওর ছোড়দার আঠার, আর দাদার বাইশ, তখন মারা গেলেন ওদের বাবা। শোকে একরকম শয্যা নিলেন মা। সেই শোক কাটতে না কাটতে সম্পূর্ণ অভাবিত এক বিপদ এসে উঁকি মারল অবন্তীদের পরিবারে। অবন্তীর দিদি অরুন্ধতীর মাথায় গোলমাল দেখা দিল।

দু'তিন বছর ধরে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম চলছিল তার। প্রথমে কেউ সেটা খেয়াল করেনি। পরে যখন ব্যাপারটা জানা গেল তখন যোগমায়া দেবী মেয়েকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন সুদীপ্তের বাড়িতে কিছুতেই মেনে নেবে না। অত্যন্ত বিত্তশালী ওদের পরিবার। খুবই কেতাদুরস্ত ওদের চালচলন। অরুন্ধতীকে ওরা পছন্দ করবেন কেন? ধনী পরিবারের সুন্দরী কেতাদুরস্ত মেয়েকেই ছেলের বউ করে ঘরে আনবেন। সুদীপ্তের ওটা এক ধরনের বিলাসিতা মাত্র। অরুন্ধতীর সঙ্গে যতই ঘুরুক বিয়ে সে করবে সমান ঘরের কোন মেয়েকেই।

অরুন্ধতীর দাদা অরিন্দমও অনেকবার সাবধান করেছিল বোনকে। কিন্তু ভালবাসার নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছিল যেন অরুন্ধতী। বাড়ির লোকের হিতকথা ভাল লাগেনি ওর। মোটর দুর্ঘটনায় বাবার আকস্মিক মৃত্যুও ওর সেই নেশা কাটাতে পারল না। বরং মাথার ওপরে উপযুক্ত পুরুষ অভিভাবক না থাকার জন্য সুযোগ বেড়ে গেল। আগের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে লাগল সুদীপ্তের সঙ্গে।

কিন্তু দেখা গেল বিয়ে করল সুদীপ্ত বাবা মায়ের পছন্দ করা মেয়েকেই। দুঃখে হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ল অরুন্ধতী। প্রথম দিকে অবন্তীরা জানতে পারেনি তার কারণ। সুদীপ্তদের বাড়িটা ঠিক তাদের পাড়ায় নয়। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে খবরটা পায়নি তারা। জানতে পারল পরে। দিদি কলেজে যাচ্ছে না। বাড়িতে কারুর সঙ্গে কথাটথা বলছে না। মুখ ভার করে চুপচাপ বসে থাকছে। কিছু একটা যে ঘটেছে তা অনুমান করেছিল বাড়ির লোকে। কিন্তু সুদীপ্তের যে বিয়ে হয়ে গেছে তা অনুমান করতে পারেনি তারা। অরুন্ধতীকে অনেক জিজ্ঞসাবাদ করে তবে জানা গেল সেকথা।

হয়ত সতর্ক হলে ওরকম ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ঘটত না। কিন্তু অদৃষ্টে কি আছে তা বুঝবে কি করে লোকে? মেয়ের কষ্ট দেখে তার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য নতুন করে বকাঝকা করলেন একচোট যোগমায়া দেবী। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত দু'একজন প্রতিবেশীও বাড়ি বয়ে শুনিয়ে গেল সে সংবাদ। অরুন্ধতীর জন্য সমবেদন প্রকাশ করে যেতে অবশ্য ভুলল না তারা।

এ পাড়ার ছেলে না হলেও তাকে চেনে অনেকেই। তাদের বিশাল প্রাসাদতুল্য বাড়িটাই তার কারণ। ঐ বাড়ির ছেলের সঙ্গে নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ির একটি মেয়ের ঘনিষ্ঠতা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বাবার মৃত্যুর পর অরুন্ধতীর তরফে গোপনতার দায় অনেকটাই কমে গিয়েছিল। মাঝে মাঝেই সুদীপ্তদের গাড়িতে করে ঘুরে বেড়িয়েছে সে। অনেকের কাছেই চক্ষুশূল হয়েছে সেটা। হয়ত তাদের মনে আশঙ্কা ছিল শেষ পর্যন্ত না বিয়েটা হয়ে যায়। তা যখন হোলো না তখন বাড়ি বয়ে সে খবরটা শুনিয়ে সমবেদনা প্রকাশের সুযোগ ছাড়বে কেন তারা?

যোগমায়া দেবীর কাছে খুব প্রীতিপ্রদ হয়নি সেটা। এই সব প্রতিবেশীরা সমবেদনা কিংবা সহানুভূতির নামে আসলে যে তাকে বেশ একটা মোক্ষম চড় দিয়ে গেল তা ভালভাবেই বুঝতে পারলেন তিনি। বাইরের লোকের কাছে মুখ বুজে নিঃশব্দে হজম

করে গেলেন সব কিছু। কিন্তু পরে ফেটে পড়লেন মেয়ের কাছে!

মায়ের সেই রুদ্রমূর্তি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল অবন্তী। বাবার মৃত্যুর পর চিরদিনের শান্তপ্রকৃতির মা যেন আরও ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি যে অতখানি তেতে উঠবেন তা কল্পনারও অতীত ছিল। অরুন্ধতী কিন্তু একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। ওর নিশ্চুপতা দেখে আরও তেতে উঠতেন যোগমায়া দেবী। কিন্তু তার ফল যে এরকম দাঁড়াবে তা যদি জানতেন তাহলে হয়ত সাবধান হতেন তিনি।

দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যুতে এমনিতেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তার ওপরে মেয়ের সম্পর্কে ওপরপড়া হয়ে প্রতিবেশিনীদের টকঝালমিষ্টি মন্তব্য তার সহ্যশক্তি ভেঙ্গে দিয়েছিল যেন। কন্যাসন্তান বলে কথা! একবার কোনো অপবাদ রটলে বড় মুশকিল। ভবিষ্যতে এই মেয়ের বিয়ে দিতে গেলেও হাঙ্গামা পোয়াতে হবে।

এসব চিন্তা করে মেজাজের পারা ঠিক রাখতে পারেননি। উঠতে বসতে মেয়েকে গালাগালি দিয়েছেন, বকাঝকা করেছেন, অথচ সে জিনিস রীতিমত স্বভাববিরুদ্ধ ছিল তার। কিন্তু অরুন্ধতীর ওপরে তার এরকম প্রতিক্রিয়া হবে বোঝেননি। বুঝতে পারলেন অনেক পরে।

কলেজে যাওয়া বন্ধ করেছিল অরুন্ধতী আগেই। অস্বাভাবিকতার সেটিই ছিল প্রথম লক্ষণ। পরে আরও অনেক অস্বাভাবিক উপসর্গ ধরা পড়ল তার আচরণে। বাড়িতে কারুর সঙ্গে কথা বলত না। কেউ কথা বললে তার জবাবও দিত না। থম ধরে বসে থাকত। বলে বলে তবে স্নান খাওয়া করতে হোত।

পরবর্তী পর্যায়ে মাঝে মাঝে চিৎকার করে কাঁদত। বুকের অবরুদ্ধ যন্ত্রণা খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ত অন্যদের কানে। মাঝে মাঝে অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যেত অবন্তীদের। দেখত দিদি উঠে বসে কাঁদছে চিৎকার করে। বুকফাটা সেই কান্না শুনে ওদের বুকের ভিতরেও অসহ্য একটা কষ্ট পাকিয়ে পাকিয়ে উঠত। কাঠ হয়ে শুনত ওরা সেই মর্মন্তুদ বিলাপের কান্না। যোগমায়া দেবী অনেক সাধ্যসাধনা করে মেয়েকে শোওয়াতে পারলে তবে ওরা শুতে পারত।

কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। পাড়ার লোকেরা আপত্তি জানাল। বলল এসব মাথা খারাপের লক্ষণ। আর দেরি করা ঠিক না। এখনও হয়ত উপায় আছে। ঠিকমত চিকিৎসা হলে হয়ত ভালো হয়ে যাবে। পাড়ার মাতব্বর স্থানীয় দু'একজন ভদ্রলোক চেষ্টাচরিত্র করে সরকার পুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন অরুন্ধতীকে।

অরিন্দম সবে তখন কাপড়ের ব্যবসায় লেগেছে। বি.এ. পাশ করে অন্যদের মত চাকরি বাকরির চেষ্টা করল না। গোলামীতে আপত্তি ছিল ওর। এক বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায়ে নেমে পড়ল। বাড়ি বাড়ি ঘুরে শাড়ি বিক্রি করতে শুরু করল। স্বল্প পুঁজিতে সবে শুরু করেছিল ব্যবসা। পয়সা কড়ি তেমন আসতনা।

বাবা প্রাইভেট কোম্পানীতে ভাল চাকরিই করতেন। বিদ্যাচর্চায় যতটা উৎসাহ ছিল অর্থোপার্জনে যদি ততটা উৎসাহ থাকত তাহলে বাড়ি গাড়ি অনেক কিছুই করতে পারতেন। দাদু তার জন্য বরাবর আক্ষেপ করে গেছেন। তদুপরি দান ধ্যানের জন্যও এদিক ওদিকে বেরিয়ে যেত অনেক টাকা।

দুঃস্থ আত্মীয় পরিজনদের বিপদে আপদে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করতেন বাবা। সঞ্চয়ের দিকে তেমন মন ছিল না। খাওয়া দাওয়া কিংবা পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারেও কোন রকম কার্পণ্য করতেন না। যত্র আয় তত ব্যয় ছিল তার।

তবু আকস্মিক দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যু না হলে পরিবারের অবস্থা এতটা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াত না। সামান্য পুঁজিপাটা যা ছিল তা কুড়িয়ে টুড়িয়ে আর ছেলের ব্যবসায়ের সামান্য টাকা দিয়ে খুব কষ্টেই সংসার চালাতে হয়েছে যোগমায়া দেবীকে। সরকার পুলের বিরাট খরচ সামলাতে জেরবার অবস্থা তখন। প্রতি মাসেই ধার দেনা করতে হোত। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কাটছাট করতে হোত।

দু'এক বছর পর অরুন্ধতী যখন একটু ভালোর দিকে তখন ওকে কাছে নিয়ে এলেন আবার যোগমায়া দেবী। অরুন্ধতীও থাকতে চাইছিল না ওখানে। প্রথম প্রথম মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল অরুন্ধতীর আচরণ। কথাটথা বিশেষ বলত না অবশ্য। বেশির ভাগ সময়েই চুপ করে থাকত। যা বলা হোত বাধ্য মেয়ের মত তা শুনত।

কিন্তু কয়েক মাস পরে আবার শুরু হোল তার অস্বাভাবিক আচরণ। আগের মত চিৎকার চেঁচামেচি করত না। কিন্তু স্নান খাওয়া করতে চাইত না। কোন কথা শুনতে চাইত না। একবার কোনো খানে বসলে নড়তে চাইত না সেখান থেকে। ঘন্টার পর ঘন্টা ঠায় বসে থাকত। বলে বলেও ওঠানো যেত না। ভাবলেশহীন শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকত আনমনা হয়ে। চড় চাপড় দিয়ে জোর জবরদস্তি করে তবে ওকে ওঠানো যেত।

নাওয়া খাওয়ার ব্যাপারেও অনিয়ম শুরু হয়ে গেল। বললেও কথা শুনত না। রেগে গিয়ে যা নয় তাই বলত। আশ্চর্যের কথা ওর যত রাগ তা ছিল মায়ের

ওপরে। শান্ত স্বভাবের অরুন্ধতীর অগ্নিমূর্তি দেখে তখন সকলে তাজ্জব হয়ে যেত। মাকেই সবকিছু করতে হোত। মেয়ের সঙ্গে সর্বক্ষণ আঠার মত লেগে থাকতেন।

প্রয়োজনে চড় চাপড় লাগাতেন তিনি অবুঝ মেয়েকে। কিন্তু ছেলেরা যদি কখনও গায়ে হাত দিত রেগে যেতেন।

—মারতে হয় আমি মারব। তোরা কেন হাত তুলিস ওর গায়ে? ওর কি এখন বুদ্ধি আছে? ও তো এক রকম শিশুই।

অরুন্ধতীর প্রতিক্রিয়া দেখে অবাক হয়ে যেত অবন্তী। দাদা বা ছোড়দা বকাবুকি করলে কিংবা দু একটা চড় চাপড় দিলে যে মেয়ে চুপ করে থাকত সেই মেয়েই মায়ের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠত অনেক সময়ে অকারণেই। খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলেও রেগে উঠত। যা নয় তাই বলে গালাগালি করত মাকে।

—এই শয়তান বুড়িটা মরেও না। আমাকে জ্বালায় খালি। দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

শুনে কাঁদতেন যোগমায়া দেবী। দুঃখ করতেন আপন মনে।

—শয়তান বুড়ি যতদিন আছে ততদিন কিছু বুঝছিস না। এরপর যে কি হবে ভাবতেও পারিনা। কে তোকে দেখবে তখন?

উপর্যুপরি দুটি শোক কাবু করে দিয়েছে যোগমায়া দেবীকে। চিন্তায় ভাবনায় দুঃখে দারিদ্রে চেহারার জৌলুশ কবেই চলে গেছে। মুখ চোখ নাকের কাঠামো থেকে বয়সকালে কত সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়। তবু আগের অসাধারণ রূপলাবণ্যের সঠিক হদিশ যেন মেলে না।

অল্প বয়সে যোগমায়া দেবীর একটি তৈলচিত্র করিয়ে রেখেছিলেন তার স্বামী। শিল্পী ফটো দেখে তেলরঙে তার যে প্রতিকৃতিটি তৈরি করেছিল তা আশ্চর্য সজীব। সেটি দেখলে বোঝা যায় কতটা সুন্দরী ছিলেন তিনি। খুব একটা বেশি ছবি তোলা হয়নি তার। যে দু'একখানা আছে সেগুলি দেখেও বোঝা যায় কতটা দেবদুর্লভ সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিলেন তিনি বয়সকালে।

মায়ের সেই সৌন্দর্যের অনেকখানিই পেয়েছে অবন্তী আর তার ছোড়দা অরণী। মায়ের মত উজ্জ্বল হলুদ নয় অবন্তীর গাত্রবর্ণ। তবে অন্য দিক দিয়ে তার সেই ঘাটতি পূরণ হয়েছে। মায়ের চেয়েও লম্বা সে। যোগমায়া দেবীর উচ্চতা ভালই। কিন্তু মেয়ে মাথায় তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

অরণী অবন্তীর মত অতটা সুন্দর না হলেও রীতিমত সুশ্রী চেহারা তারও। অন্য দুই ভাই বোন বাপের ধারা পেয়েছে। অবিনাশ বাবুর গায়ের রঙও ফর্সা

ছিল। মুখশ্রী বা উচ্চতা যদিও উল্লেখযোগ্য ছিল না। তবে সাধারণের বিচারে মোটামুটি সুশ্রী তারাও। রূপের বিচারে অরিন্দমই বরং কিছুটা নীরস তার ভাই বোনেদের চেয়ে।

আত্মীয়স্বজন বেড়াতে এলে বা অন্যত্র তাদের সঙ্গে দেখা হলে অবন্তীর রূপের স্তুতি করত তারা। বলত মায়ের অসাধারণ সৌন্দর্য পেয়েছে একমাত্র তার এই ছোট মেয়েটিই। মায়ের সৌন্দর্য পেলে কি হবে? স্বভাবে মায়ের সঙ্গে কোন মিল নেই অবন্তীর।

অরণীর মত অবন্তীও চঞ্চল ছটফটে স্বভাবের। বাপের রাগ আর মেজাজটাও পেয়েছিল তারা উত্তরাধিকার সূত্রে। দাদা অরিন্দম আর দিদি অরুন্ধতী চেহারায় বাপের মত হয়েও স্বভাব পেয়েছিল মায়ের; ধীর, স্থির,শান্ত।

অপ্রকৃতিস্থ অরুন্ধতী এখন অবশ্য মাঝে মাঝেই অশান্ত হয়ে ওঠে। চিৎকার করে মাকে গালাগালি দেয়। তবে সেটা সময় বিশেষে। বেশির ভাগ সময়েই চুপচাপ নিজের মত নিজে থাকে। খুব একটা কাউকে জ্বালায়না।

যোগমায়া দেবীর বড় ছেলে অরিন্দম কিন্তু নিপাট ভালমানুষ। কাউকে উঁচু গলায় কিছু বলতে পর্যন্ত পারে না। অরুন্ধতীকেও প্রথম প্রথম কিছু বলতনা সে। এখন অবশ্য মাঝে মাঝে মাকে সাহায্য করতেই এগিয়ে আসতে হয়। অবুঝ একরোখা অরুন্ধতীকে দু'একটা চড় চাপড় দিয়ে বাধ্য করাতে হয়ে স্নান করতে, খেতে, শুতে। তবে সেটা করে সে নিতান্ত দায় পড়ে।

ঘরে বাইরে কারুর সঙ্গে কোন বিরোধ নেই তার। মেজাজটিও আশ্চর্য রকমের ঠাণ্ডা। হয়ত সে কারণেই তার ব্যবসা এখন মোটামুটি ভালভাবেই দাঁড়িয়ে গেছে। ছোট ভাই অরণীকেও ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিয়েছে এখন সে।

অরণীকে আর অবন্তীকে বি.এ. পাশ করিয়েছে এক রকম জোর করেই। বাবার মৃত্যুর পর নড়বড়ে সংসারের ভিত মজবুত করতে কম চেষ্টা করেনি সে এতদিন। অক্লান্ত পরিশ্রমের সু[illegible]ত পেয়েছে অবশেষে। বাড়ি বাড়ি কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর অধ্যায় কবেই শেষ হয়েছে।

গড়িয়াহাটায় দোকানঘর খুলে বসেছে অরিন্দম। জনা কয়েক কর্মচারী কাজ করছে আজ সেখানে। শাড়ীর দোকানের সঙ্গে লাগোয়া একটি ছোট দোকানে দর্জি বসিয়ে তৈরি করাচ্ছে ব্লাউজ, পেটিকোট, ফ্রক। বিক্রিবাটা এখন খারাপ নয়।

অবন্তীর জন্য বিয়ের সম্বন্ধ দেখতে চেয়েছিল সে। অবন্তী রাজী হয়নি। এতদিন ধরে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তাদের সংসারটাকে দাঁড় করিয়েছে দাদা।

তাকে পড়িয়েছে, তার ছোড়দাকে পড়িয়েছে। তাদের সকলের ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব হাসিমুখে বহন করেছে। এখন স্বার্থপরের মত মা আর দিদির দায়িত্ব দাদার ঘাড়ে চাপিয়ে দাদার পুঁজি নিঃশেষ করে বিয়ে করতে চাইলনা অবন্তী।

মায়ের নিরন্তর আক্ষেপোক্তি শুনে তার মনে একটি স্থায়ী প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল এ ব্যাপারে। ভালমানুষ শান্ত সুশীল স্বভাবের বড় ছেলেটি মুখ বুজে সকলের জন্য খেটে যাচ্ছে সেই কবে থেকে। এক ফোটা অভিযোগ নেই, নালিশ নেই কারুর ওপরে। তবু মায়ের প্রাণে বড় বাজত। মাঝে মাঝেই আক্ষেপ করতেন তিনি।

—ওর বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে কি এই অবস্থা হোত? সেই কবে থেকে সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে রয়েছে। আমার কি ভালো লাগে? কোথায় ওর বিয়ে দেব, বউ আসবে! তা না সব স্ফূর্তি আহ্লাদ ভুলে গিয়ে প্রাণপাত খেটে যেতে হচ্ছে? আমরা এতগুলি প্রাণী সব ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। রণর কথা ভাবিনা। কিন্তু আমি রয়েছি, আমার পাগল মেয়ে রয়েছে। তাদের দেখতে হবে ওকে সারা জীবন। তার ওপর বিন্তীর বিয়ে—সেও তো দিতে হবে ওকেই? মেয়ে যত সুন্দরীই হোক্ বিনা পয়সায় তো বিয়ে হবেনা? ওর পুঁজিপাটা যা আছে সব শেষ হয়ে যাবে বিন্তীর বিয়েতে। কি অদৃষ্ট করে এসেছিলাম! যেদিকে তাকাই সেদিকেই অন্ধকার দেখি।

মাঝে মাঝেই এমন সব কথা বলতেন যোগমায়া দেবী। শুনে খারাপ লাগত অবন্তীর। ভাবত মা তো ঠিকই বলছেন। এতগুলি লোকের দায়িত্ব দাদার ঘাড়ে। কত বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের সংসারটাকে টিকিয়ে রাখতে। তাদেরও তো ভাবতে হবে দাদার কথাটা।

শুধু মায়ের কথাতেই যে তার মনে এরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা নয়। দাদার জন্য এমনিতেও তার মনে বরাবরই এক ধরনের দুর্বলতা আছে। চিরকাল তার সব আবদার মিটিয়ে এসেছে দাদা। কোনদিন কড়া মুখে কিছু বলেনি।

দিদিও অবশ্য কোনদিন তাকে রূঢ় কথা বলেনি। এখন যে অপ্রকৃতিস্থ তাও অবন্তীকে কিছু বলে না। বরং লক্ষ্মী মেয়ের মত তার অনেক কথাই শোনে। কালেভদ্রে খুব রাগের মুহূর্তে হয়ত একটু অন্যরকম আচরণ করে। তবে তার কারণ হোলো রাগের ঘোরটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ নিজেকে সামলাতে পারেনা সে।

অবন্তীর যত বিরোধ তার ছোড়দা অরণীর সঙ্গে। ছোটবেলা থেকেই বনিবনা নেই দুজনের মধ্যে। অবন্তী যা কিছু করবে তার মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়াবে

অরণী। দুজনের চেহারায় যত মিল সম্পর্কের মধ্যে আবার ঠিক ততটাই অমিল।

দাদার ব্যবসাতে ছোড়দা যোগ দেওয়ার পর আরও যেন সচেতন হোল অবন্তী নিজের সম্পর্কে। পরগাছার মত অপরকে আঁকড়ে থাকবে কেন সে? সে বি.এ. পাশ করেছে। পড়াশোনায় ভাল। কেন চাকরি করে আত্মনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করবে না? দাদা চাইছে বলে এখনই বিয়ে করতে হবে কেন? বিয়ের সময় তো আর পেরিয়ে যাচ্ছে না? চাকরি করলে বরং বিয়ের বাজারে বাড়তি মূল্য জোটে আজকাল। 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনে প্রায়ই দেখা যায় চাকুরীরতা মেয়ে খুঁজছে পাত্রপক্ষ।

সবচেয়ে বড় কথা ছোড়দার কথা কিছু বলা যায় না। হয়ত খোঁটা দিয়ে কথা বলবে। দাদার সম্পর্কে তার যতখানি আস্থা ছোড়দার সম্পর্কে ঠিক ততখানিই অনাস্থা। আর সংসারে বাড়তি আয়ের উপায় থাকলে তা সকলের পক্ষেই মঙ্গল।

এই সব চিন্তাভাবনা করে বি.এ. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি খুঁজতে শুরু করেছিল অবন্তী। কিন্তু কোথায়ও কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছিল না। তিন চার বছর লেগে থেকে তবে সে একটি তেল কোম্পানি থেকে ইন্টারভ্যুর ডাক পেয়েছিল। খুব একটা ভাল হয়নি তার ইন্টারভ্যু। তেল কোম্পানির সম্বন্ধে দু'একটা প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি সে। তার মনে হয়েছিল ওখানে আশা নেই। আজ সব সংশয়ের অবসান হোলো চিঠিটা পেয়ে।

উত্তেজনা দেখে মা যে অন্য অর্থ করতে পারেন তা তার আদৌ মনে হয়নি। মায়ের দুশ্চিন্তা দেখে নিজেকে অপরাধী মনে হোল। আঘাত পেতে পেতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তার মা যে ভাল কোন সম্ভাবনার কথা ভাবতেই পারেননা যেন।

মায়ের পাশে বসে পড়ে অবন্তী। খামটা সামনে মেলে ধরে দেখায়।

—এই চিঠিটা দিয়ে গেল এক্ষুনি পিয়ন। চাকরিটা হয়ে গেছে আমার।

পরক্ষণেই নিজেকে সংশোধন করে নিল।

—অবশ্য চাকরিটা হয়ে গেছে বলা ঠিক না। 'অ্যাপ্রেনটিস' হিসাবে নিচ্ছে ওরা এখন আমাকে। এক বছরের জন্য। পরে চাকরি হতেও পারে, নাও হতে পারে।

অবাক হলেন যোগমায়া দেবী।

—সে আবার কি? একবার নিয়ে আবার ছাড়িয়ে দেবে পরে? নিয়মকানুন ভাল করে জানা নেই অবন্তীরও। সাধারণ বুদ্ধিতে মায়ের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে চেষ্টা করে সে।

—ওরা বলেই নিচ্ছে সেটা। তবে এই এক বছর যদি ভালভাবে কাজকর্ম

করে ওদের আস্থা অর্জন করতে পারি তাহলে টিকে যেতে পারে চাকারটা। এই একটা বছর বুঝলে মা খুব সাবধানে চলতে হবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন যোগমায়া দেবী।

—সবই আমার কপাল। এক মেয়ে তো মানুষের বাইরে। সারা জীবন জ্বলতে হবে তাকে নিয়ে। আরেক মেয়ে চাকরি করতে চলেছে! কোথায় বিয়ে থা হবে! সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করবে। তা না বাইরে রোদে জ্বলে চেহারা নষ্ট করে চাকরি করবে। এর পরে বিয়ে দিতে মুশকিল হবে।

মাকে সান্ত্বনা দেয় অবন্তী।

—চেহারা নষ্ট হবে কেন মা? কত মেয়েই তো চাকরি করছে। তাদের সকলের চেহারা কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? আর তোমার মেয়ের চেহারা অনেকের থেকেই ভাল। অত সহজে তা নষ্ট হবে কেন?

এবার সম্পূর্ণ অন্য সুরে কথা বললেন যোগমায়া দেবী।

—ঐ গর্ব নিয়েই থাক তুমি! চেহারা সুন্দর হলেই হয় না রে! বাপের টাকা না থাকলে ভাল বিয়ে হয় না। আজকালকার দিনে মেয়ের ভাল বিয়ে দিতে গেলে আগের থেকেও বেশী টাকা লাগে। তোর দাদা তা পাবে কি করে? আর ওরও তো ভবিষ্যৎ আছে?

অবন্তী হাসে।

—কি মুশকিল বাবা! এদিকে এগোলেও দোষ, ওদিকে এগোলেও দোষ। আমি কি বিনা পয়সার চাকরি করব নাকি? দাদার বোঝাটা হালকা করতেই তো চাকরি নিচ্ছি। তুমি দাদার জন্য সম্বন্ধ দেখ মা। আমি তো বলেইছি এখন বিয়ে করব না। চাকরি করব। টাকা জমাব। পরে বিয়ের কথা ভাবব। দাদার বিয়েটা আগে দাও।

—সে কি আমার অসাধ রে? তোর সঙ্গে তোর দাদার বিয়েটাও যদি দিতে পারতাম তাহলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু ইন্দ কি তোর আগে বিয়ে করতে রাজী হবে?

—তুমি বোঝাও। বল যে বিন্তী কিছুটা গুছিয়ে নিক। সংসারের জন্য যদি কিছু নাও করতে পারি তাহলেও নিজের বিয়ের টাকাটা অন্ততঃ গুছিয়ে নিই কিছুটা।

—তুই বলে যাচ্ছিস। আমি শুনছি। কিন্তু তোর বিয়ের বয়সটা কি থেমে থাকবে বিন্তী? কত বয়স হোল খেয়াল আছে? এরপর চেহারা খারাপ হয়ে যাবে। চাইলেও কি ভাল পাত্র পাব আর?

—সে যদি না পাও করব না বিয়ে। যেমন তেমন একটা বিয়ে করতেই হবে এটা কোন কথা নয়।

—এসব কি বলছিস তুই বিন্তী? বিয়ে না করার হয়েছে কি? ভয়াহত শোনায় যোগমায়া দেবীর গলা। তার ভাবভঙ্গী দেখে হাসবেনা ভেবেও হাসি চাপতে পারে না অবন্তী। মাকে ত্বরিতে শান্ত করে সে অল্প হেসে।

—ভয় পেওনা মা। বিয়ে করবনা বলিনি। বিয়ে নিশ্চয়ই করব। তবে এখন না। আর যেমন তেমন কোন লোককে না।

দুই

সকাল থেকেই ধুকপুকুনি শুরু হোল অবন্তীর। তার যাতায়াতের পরিধি বরাবরই সীমিত। প্রথমে পাড়ার স্কুলে, পরে পাড়ায় না হলেও বাসপথে মিনিট দশ পনেরর দূরত্বে কলেজে তার স্নাতক পর্ব শেষ করেছিল সে।

বাবার মৃত্যুর পর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক কমে গেছে। তারাও আসেনা। অবন্তীরাও যায়না। একমাত্র উৎসব অনুষ্ঠানে যেখানে নিতান্ত না গেলেই নয় সেখানে যেতে হয়। নিমন্ত্রণ বা ভদ্রতা রক্ষার দায় অবশ্য পড়ে অবন্তী আর তার দাদা অরিন্দমের ওপর। অরুন্ধতীর তো প্রশ্নই ওঠে না। আর অরণী এমনিতে যথেষ্ট মিশুকে হলে কি হবে? আত্মীয়স্বজনদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতেই ভালবাসে। পাড়া প্রতিবেশী কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকম তার সম্পর্ক। হাসি গল্পে ঠাট্টা তামাসায় আসর সরগরম করে রাখার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে মনে হবে একই শরীরের খোলসে দুটি পরস্পরবিরোধী চরিত্র সহাবস্থান করছে।

যোগমায়া দেবী বরাবরই কিছুটা ঘরকুনো স্বভাবের। স্বামীর মৃত্যুর পর সেটা বেড়েছে অনেকখানিই। প্রথম প্রথম লজ্জায় বেরোতে চাইতেন না। বৈধব্যের জন্য সঙ্কোচে মরে থাকতেন যেন। পরে অবশ্য সময়ের সাথে সাথে নিজের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিলেন একটু একটু করে। বাড়ির কাছাকাছি শিবমন্দিরে কিংবা কালীমন্দিরে গিয়ে বসে থাকতেন মাঝে মাঝে। পাড়ায় কোন কথকতা বা কীর্তন গানের অনুষ্ঠান হলে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। নিজের দুঃখপীড়িত হৃদয়ের যন্ত্রণা ভুলে থাকার চেষ্টা করতেন।

পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে খুব গভীর ছিলনা তার সম্পর্ক। নির্বোরোধী শান্ত স্বভাবের জন্য কারুর সঙ্গেই কোন বিরোধ বা অবনিবনা ছিলনা। কিন্তু তাদের

সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক গড়ে তোলবার তেমন আগ্রহ ছিলনা। অরণী বাদে অন্য সব ছেলেমেয়েরাও হয়েছিল মায়ের মত। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব একটা মাখামাখি রাখতনা কেউই।

মাথার দোষ দেখা দেওয়ার পর থেকে অরুন্ধতীর মধ্যে দেখা দিল এক নতুন উপসর্গ। হঠাৎ হঠাৎ হুটহাট করে এসে উপস্থিত হতো কোন প্রতিবেশীর বাড়ি। স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থ মানুষের মতই কথাবার্তা বলত। তার আচরণে মাথার গোলমাল ধরা যেতনা সহজে। কিন্তু কখনও কখনও আবার জিদ করে উঠতেই চাইত না কোন বাড়ি থেকে। সেই জন্য প্রায় সময়েই চোখে চোখে রাখা হোত তাকে।

অরিন্দম বরাবরই গম্ভীর শান্ত প্রকৃতির। কোনদিনই তেমন বন্ধুবান্ধব নেই। স্কুল কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে তার আচরণ খুবই মৌখিক বাহ্যিক। অন্তরঙ্গ বন্ধু একটিও নেই। পাড়ার ছেলেরা গাম্ভীর্যের জন্য রীতিমত সমীহ করে চলে তাকে।

অবন্তীর ব্যাপারটা সকলের থেকে আলাদা। অনেকের সঙ্গে দহরম মহরমের পক্ষপাতী নয় সেও। কিন্তু দাদার মত বন্ধুবান্ধবহীন নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের কথা ভাবতে পারেনা তা বলে। দাদা বা ছোড়দার মত দুই বিপরীত মেরুতে বাস তার আদৌ অভিপ্রেত নয়। মধ্যপন্থা অনুসরণ করে চলে সে।

কি পাড়ায়, কি স্কুল কলেজে বাছাবাছা দুই একটি মেয়েকে সে নির্বাচন করে নিয়েছে বন্ধু হিসাবে। তার সেই সব বন্ধুরা কাছেই থাকে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার তাগিদে কলকাতা শহর চষে বেড়াতে হয়না অবন্তীকে। কলকাতার রাস্তাঘাটের সঙ্গে পরিচয় তার মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।

বরাবর কাছাকাছি পড়াশোনা করেছে বলে রাস্তাঘাট পার হতেও ভারী ভয় পায় সে। তার অফিসটি কলকাতার যে রাস্তায়, যানবাহনের চলাচল সেখানে একটু বেশিই। ইন্টারভ্যু দিতে-গিয়ে বুঝেছে এখানে রাস্তা পার হতে গেলে কতটা চৌকশ হওয়া দরকার। বিপদ যেন হাত বাড়িয়েই আছে। একটু অসতর্ক হলেই টেনে নেবে সে সাগ্রহে নিজের কাছে। প্রতিদিনক বিপদের সঙ্গে পাঞ্জা কষে লড়তে হবে এখানে।

অবশ্য অন্য রকম আশঙ্কা আছে। অফিসের পরিবেশ কেমন হবে, সেখানে অন্যান্য সহকর্মী কিংবা কর্তৃপক্ষের আচরণ কেমন হবে, সে ঠিকমত তার কাজ সম্পন্ন করতে পারবে কিনা ইত্যাদি নানা আশঙ্কায় কন্টকিত হচ্ছিল তার মন সকাল থেকেই।

গতকাল রাত থেকেই তার জন্য অবিরাম মানসিক প্রস্তুতি চলেছে। আগে একাধিকবার দাদার সঙ্গে এসেছে সে। আজ দাদার একটা কাজ পড়ে গেছে হঠাৎ বৌবাজারে। তবু অরিন্দম রাজী ছিল তাকে নিয়ে যেতে। বলেছিল একটু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লে অবন্তীকে ও অফিসের দরজায় পৌঁছিয়ে দিতে পারবে। যোগমায়া দেবীরও ইচ্ছা ছিল ইন্দ বিন্তীকে পৌঁছে দেয় প্রথম দিনটা।

মেয়েকে দেখে বুঝতে পারছিলেন খুব একটা স্বস্তিবোধ করছেনা সে। ওর মুখচোখে ভয়ের ছাপ প্রচ্ছন্ন ছিল। অবন্তীও হয়ত আপত্তি করতনা। কিন্তু ছোড়দা অরণীর মন্তব্য শুনে ওর কেমন যেন জেদ চেপে গেল। দাদা আর মায়ের আশঙ্কা দেখে ছোট্ট করে টিপ্পনী কাটে অরণী।

—বিন্তী কি চিরদিন খুকীটি হয়েই থাকবে মা? মুখে তো কম তড়পায় না? অফিসে কাজ করতে যাচ্ছে। সঙ্গে লোক নিয়ে যেতে হবে? কেন অন্য মেয়েরা যাচ্ছেনা অফিসে? তারা কি করছে?

অরিন্দম প্রতিবাদ করে।

—বিন্তী তো কিছু বলছেনা রণ? ও তো একাই যেতে চাইছে। আর রোজ রোজ কি আর ওর সঙ্গে কেউ যাবে? আজ প্রথম দিনে একটু নার্ভাস ফিল্ করতেই পারে!

অরণী তবু ছাড়ে না।

—প্রথম দিন বলছ কেন দাদা? আগে বেশ কয়েকবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে ও।

এবার চটে যায় অবন্তী। ভেবেছিল চুপ করে থাকবে। কথা বাড়াবেনা। কিন্তু ছোড়দাকে খোঁচা মেরে কথা বলতে দেখে আর সে ধৈর্য রাখতে পারলনা। ঝাঝিয়ে উঠল সতেজে।

—তুমি কেন বলতে আসছ ছোড়দা? তুমি কি একদিনও সঙ্গে করে নিয়ে গেছ? দাদা যদি যেতে চায় তুমি বাধা দেওয়ার কে?

যোগমায়া দেবী ধমক লাগান অরণীকে।

—তুই সব সময়ে বিন্তীর পেছনে লাগিস কেন রণ? সত্যিই তো। তুই তো একদিনও ওকে নিয়ে যাসনি সঙ্গে করে। তোরও তো দাদা হিসাবে কর্তব্য আছে না কি? তোদের দাদাই কি চিরকাল একা তোদের সকলের প্রতি সবরকম কর্তব্য পালন করে যাবে? আজ তো তুইই যেতে পারিস বিন্তীর সঙ্গে। ইন্দর একটা জরুরী কাজ আছে বলছিল।

একরকম ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল অরণী মায়ের কথা।

—কি যে বল মা? আমার অত সস্তা সময় নেই। তোমার মেয়েটি অত কিছু সুন্দরী নয় যে দেখবামাত্র হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়বে সব লোক ওর ওপরে।

অরিন্দম রাগ করে।

—তোর মুখের কোন লাগাম নেই রণ। মায়ের সামনে কি সব যা তা বলছিস?

যোগমায়া দেবী কিন্তু অরণীর কথার মর্মার্থ বুঝেছেন বলে মনে হোলনা। মেয়ের দিকে সস্নেহে এক পলক তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

—বিন্তীর মত সুন্দর আমি তো খুব কমই দেখি রণ। তাইতো কেবলি ভয় হয় পাছে কোন বাঁদরের গলায় মুক্তোর হারটি তুলে দিতে হয়!

এক রকম জেদ করেই একা গেল অবন্তী। ছোড়দার খোঁচা ওর ভাল লাগেনি। পারতপক্ষে এই ভয়ে বড় একটা কথা বলতে যায়না সে ওর সঙ্গে। তবু গায়ে পড়ে তাকে শোনাতে ছাড়েনা ছোড়দা। ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে। মাঝে মাঝে অবন্তীর মনে হয় ছোড়দা যেন তাকে আর দিদিকে শত্রুপক্ষ বলে মনে করছে। ভায়েদের কষ্টার্জিত অর্থ বোনেদের পেছনে যে ব্যয় হচ্ছে তা ছোড়দার বরদাস্ত হচ্ছেনা।

দিদিকেও যখন মারধর করে ছোড়দা তখন অবন্তীর মনে হয় তাদের দুই বোনের বিরুদ্ধে ঝাল ঝাড়ছে ও এই সুযোগে। মাকে পর্যন্ত মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে যে অবাক লাগে তার! ইদানীং দাদার ব্যবসাতে যোগ দিয়ে তার ভাবভঙ্গী আরও যেন পাল্‌টে গেছে।

তাদের দাদা এত বছর সংসারের জন্য প্রাণপাত করেও এত নিরুচ্চার অথচ ছোড়দা এত অল্পদিনের মধ্যেই এমন মুরুব্বীর ভঙ্গী কি করে আয়ত্ব করল ভেবে অনেক সময়েই আশ্চর্য বোধ করে সে। তার চাকরি করার ইচ্ছের পেছনে ছোড়দাব মনোভাব কম তাগিদ যোগায়নি।

অফিসে গিয়ে অনেকটাই হাল্‌কা হয়ে গেল তার মন। সাময়িকভাবে কে কোন বিভাগে থাকবে তা বলে দেওয়া হোল। অবন্তীকে দেওয়া হোল 'অপারেশান' সেকশনে। ভারপ্রাপ্ত তরুণ অফিসারের সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল তার। অত্যন্ত ভদ্র, শিক্ষিত আর সুসভ্য মনে হোল তার আচরণ।

লাঞ্চের সময় এদিক ওদিক থেকে দু'চার জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এলো আলাপ করতে। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল ক্যান্টিনে। একটি মেয়েকে খুব ভাল লাগল তার। নাম শ্যামলী ঘোষ। তার বাড়িও বেহালায়। রায় বাহাদুর

রোডে। গায়ের রঙ নামের সঙ্গে মিল রেখে শ্যামলা। মুখচোখের ডৌল বেশ মিষ্টি। বয়স তার মতই হবে।

অবন্তী মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বেহালায় বাড়ি যখন তখন একসঙ্গে যাওয়া আসা করতে পারবে তারা দুজনে।

লাঞ্চের পর ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করল সে।

---তুমি তো আমার বাড়ির কাছেই থাক। আমরা দুজনে একসঙ্গে যাওয়া আসা করতে পারি। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে?

সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানাল শ্যামলী।

---আপত্তি থাকবে কেন? ভালই তো। মুশকিল হোলো আমাদের তো এক সেকশান না! তবে ছুটি হলে নীচে অপেক্ষা করতে পার অবশ্য। একসঙ্গে বাড়ি ফেরা যাবে।

লিফ্‌টের কাছে এসে দাঁড়াতেই 'লোড শেডিং' হয়ে গেল। লিফ্‌টম্যান দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আসল। অন্যরাও উপায়ান্তর না দেখে বেরিয়ে আসে। শ্যামলী চাইছিল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখতে। অবন্তীই প্রস্তাব করল একসঙ্গে হেঁটে ওপরে উঠলে কেমন হয়?

সুস্মিত হেসে কপট অভিযোগ করে শ্যামলী।

---তোমার তো বেশ উৎসাহ দেখছি? আমার বাবা দম বেরিয়ে যাবে পাঁচতলায় উঠতে হবে আমায়।

---কোন সেকশান্ তোমার?

---অ্যাকাউন্টস্।

---তুমি কতদিন আছ?

---তা এক বছর সাত মাস মতো হলো। অবশ্য চাকরি হিসাব ধরলে মাস ছয় সাত হয়েছে। এক বছর তো অ্যাপ্রেনটিস ছিলাম।

অবন্তী হাসে।

---তা ঠিক। তবে অভিজ্ঞতা যা হয়েছে তা তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায়না? আচ্ছা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। অ্যাপ্রেনটিসশিপের পর সকলেরই কি চাকরি হয়?

---তা বলতে পারিনা। তবে আমাদের সঙ্গে যারা ছিল তাদের সকলেরই চাকরি হয়েছে। এক মাস মতো বসে ছিলাম আমরা। অবন্তী তার সংশয় ব্যক্ত করে।

—তোমাদের বেলায় যা হয়েছে আমাদের বেলায় তা নাও হতে পারে। কিন্তু চাকরি না পেলে চলবেনা আমার।

সিঁড়ির মুখে এসে দেখা হয়ে গেল বিশাল দশাসই চেহারার এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তড়তড় করে নীচে নামছিলেন উনি। শ্যামলীকে দেখে তাড়া লাগালেন।

—গল্পে মশগুল হয়ে আছ দেখছি। লিফ্‌ট কিন্তু চালু হয়ে গেছে আবার কষ্ট করে অতটা ওপরে উঠবে কেন?

—তাই নাকি মন্দিরাদি? ঠিক আছে চলুন। আমি আসছি। অবন্তীকে বলে নীচে নেমে গেল শ্যামলী ভদ্রমহিলার পেছনে পেছনে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল অবন্তী ভদ্রমহিলাকে। শ্যামলীকে কিংবা আরও দু' একজনকে দেখে প্রথম দর্শনেই তার যতটা ভাল লেগেছিল ঠিক ততটাই খারাপ লাগল তার এই মহিলাকে দেখে।

চেহারা দেখে মানুষের স্বভাব সব সময়ে বোঝা যায়না। চেহারা বড় প্রতারণা করে। দেবদুর্লভ স্বভাবের মানুষের চেহারাও অসুন্দর হতে পারে। অপরপক্ষে দানবিক স্বভাবের কোন মানুষের চেহারা দেখেও তাক্ লেগে যেতে পারে। চেহারা অনেকটা খোলসের মতন। তার নীচে আসল মানুষটার অনেক বৈশিষ্ট্যই আড়ালে থাকে।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় অজানা নয় তার এসব কথা। নিজের বাড়িতেও কি দেখেনি সে এ জিনিষ? তার দাদার চেহারা ছোড়দার চেহারার তুলনায় অনেক নীরস। তুলনামূলক বিচারে তাদের ভাই বোনেদের মধ্যে সবচেয়ে খাট তার দাদা রূপের বিচারে। অথচ মানুষ হিসাবে দাদার সঙ্গে তাদের কারুরই তুলনা চলেনা।

এসব সত্ত্বেও ভদ্রমহিলার প্রতি তার মনের বিরূপতা দূর করতে পারছিলনা সে। দশাসই চেহারার জন্য নয়। মুখে চোখে কেমন একটা স্থূলতা ফুটে উঠেছিল বলে খারাপ লাগছিল তার ওকে। মনে হচ্ছিল ভদ্রমহিলার অতীত বা বর্তমানের ইতিহাস হয়ত খুব পরিচ্ছন্ন নয়। পলকের দৃষ্টিপাতে আর একটি জিনিষ চোখে পড়েছিল। বক্ষদেশের পৃথুল স্থূলতা নিয়ে এতটুকু কুণ্ঠিত নন উনি। বরং ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকট করে দেখাতে চাইছেন বক্ষদেশের নারীত্ব।

নিজের চেয়ারে বসে চারপাশে তাকিয়ে দেখে তার মনে হচ্ছিল ভাল জায়গাতেই চাকরি পেয়েছে সে। বেহালার ছোট গণ্ডীর থেকে বেরিয়ে এসে কলকাতার এই অভিজাত পল্লীতে বিশাল এই ভবনটির শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে মিনি ভারতবর্ষকে যেন দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে।

বাঙ্গালি, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, গুজরাটি, মহারাষ্ট্রীয় আর সিন্ধি সহকর্মীদের বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে তাদের এই অফিসে। বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা উপলব্ধির এমন প্রশস্ত পরিবেশ আর মিলবে কোথায়? জাতীয় সংহতির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় অফিসের একটি ঘরে বসেই।

তার ডানে বাঁয়ে কেউই বাঙ্গালি নয়। ডানের ভদ্রলোকটি মাদ্রাজী। এম. সি রামণ তার নাম। বাঁয়ে রয়েছে এস. বি. পাত্র নামে এক ওড়িয়া ভদ্রলোক। এব বছর পরে আবার সে এখানে ফিরে আসবে কিনা জানেনা। কিন্তু এখানে যদি সে কাজ করে, তাহলে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ভরে উঠবে অবশ্যই।

সে বুঝতে পারছিল তার জীবনযাত্রার ছক অতঃপর পালটে যাবে অনেকখানি। তার সঙ্গে পালটে যাবে হয়ত তার অভ্যাস, আচরণ আর মানসিকতা। অনাগত সেই সম্ভাবনার তরঙ্গ কেবলি ঢেউ তুলছিল তার মনে।

অবন্তীর মনে হচ্ছিল ভাগ্যিস সে চাকরি করতে এসেছিল! দাদার কথা শুনে যদি সে নিশ্চেষ্ট হয়ে বিয়ের জন্য অপেক্ষা করত তাহলে অনেক কিছুই দেখা হোতনা। জানা হোতনা অনেক কিছু। আগে তার এরকম কথা মনে হয়নি।

সে ভাবছিল নানা অবস্থার মধ্যে নিজেকে তৈরি করে মানুষ। অলস নিশ্চেষ্ট হয়ে যে মানুষ নিরঙ্কুশ মসৃণ জীবন যাপন করে সে বঞ্চিত হয় অনেক সম্ভবনা থেকে। কর্মময় জীবনে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েই হয়ত মানুষ একটু একটু করে খুঁজে পায় তার নিজের সম্ভাবনাকে। সেও নিশ্চয় খুঁজে পাবে তার জীবনের অজানা সম্ভাবনাকে। ভাগ্যকে বারবার ধন্যবাদ জানায় অবন্তী।

তিন

অফিস সম্পর্কে একদিন অনেক ভয় বাসা বেধেছিল অবন্তীর মনে। এর মধ্যে কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। এখন তার মনে হয় কত অমূলক ছিল সেই ভয়। অফিস যে বাঘের মত হালুম করে খেয়ে ফেলেনা কাউকে, বরং তাকে তার নিজস্ব নিয়মে এক ধরণের মানসিক আশ্রয় দেয় তা নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরে গেল সে।

এখন তার কাছে ছুটির দিনগুলোই বরং রীতিমত দুর্বহ ঠেকে। বাড়ির নিরানন্দ পরিবেশে একঘেয়ে দিনযাপনের কষ্ট এখন বেশি করে টের পায় যেন।

দাদা বাড়িতে কম সময় থাকে। যতটুকু সময় থাকে প্রায় চুপচাপ নিঃশব্দেই কাটায়। সামান্য কথাবার্তা যা বলে তা মায়ের সঙ্গে। ছোড়দা কোনদিনই ঘরমুখী

নয়। বরাবরই সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ চৈ করে চলতে অভ্যস্ত। দাদার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দরুন এখন অবশ্য আগের মত সময় দিতে পারেনা বন্ধুবান্ধবদের জন্য। তবু তারই মধ্যে সময় করে আড্ডা দিতে যায় নিয়মিতভাবে। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তার খাওয়া আর শোওয়ার।

দিদি তো মানুষের বাইরে। এমনিতে খুব ঝামেলা কিছু নেই। সচরাচর চিৎকার চেঁচামেচি করেনা। উন্মত্ত হয়ে মারধর করতেও আসেনা। কিন্তু কোন ব্যাপারে হঠাৎ তার গোঁ চেপে গেলেই হোল। তখন তাকে নিবৃত্ত করতে গেলে দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। সামনে যা পায় ছুঁড়ে মারে। দিদির সান্নিধ্য কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

মা বরাবর শান্ত প্রকৃতির। বাবা ছিলেন মজলিসি জমাটি মানুষ। মায়ের স্বভাব একেবারে বিপরীত। কথা কম বলেন। আবেগ অনুভূতির প্রকাশ কোনদিনই খুব সোচ্চার বা উচ্চকিত নয়। বাবা মারা যাওয়ার পর আরও বেশি নিরুচ্চার হয়ে গেছেন। আর দিদির মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার পর একেবারেই যেন ঠাণ্ডা মেরে গেলেন। ছেলেমেয়েকে পর্যন্ত উঁচু গলা করে কিছু বলতে পারেননা। দরকারে শাসন যেটুকু করতে হয় তা করেন নিতান্তই নিরাসক্ত ভাবে।

আগে তবু কিছুটা মানসিক আদান প্রদান চলত মায়ের সঙ্গে। আজকাল তিনি তার সময় ভাগ করে নিয়েছেন কাজ, পুজোআর্চা আর দিদির তদারকির মধ্যে।

বাড়ির এই পরিবেশে দম আটকে আসে অবন্তীর। ছোড়দার মত বাড়ির বাইরে বেশি সময় কাটাবার স্বাধীনতা তার নেই। দাদার মত নিজেকে নিয়ে থাকতেও সে অক্ষম। তার অবস্থাটা এ সংসারে বন্দী বিহঙ্গের মত। শত ভীরুতা সত্ত্বেও যার উড়তে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে ডানা মেলে বিশাল বিশ্বকে দেখতে! বদ্ধ গণ্ডীর থেকে বেরিয়ে জীবনকে মেলে ধরতে সাধ যায়।

চাকরি খুঁজেছিল সে দাদার ভার লাঘবের জন্য। সংসারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্য। মানসিক আশ্রয়ের কথা ভাবেনি তখন। কিন্তু গত কয়েক মাসে অফিসে কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে সে মানসিক আশ্রয়।

এর মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। অনেকের কথা শুনেছে সে। তাদের অফিসে অসংখ্য সেকশানে কাজ করছে অসংখ্য মানুষ। সেই সব মানুষগুলির চেহারা যেমন এক না, স্বভাব চরিত্রও তেমন এক না। টুকরো টাকরা কত কি ঘটে। জানা যায় কতজনের কথা। কত কিছু তার কাছে অভাবিত মনে হয়। রহস্যময় মনে হয়।

নিজের চেনা গণ্ডীর মধ্যে যাদের দেখেছিল তাদের সঙ্গে কত অমিল খুঁজে

পায় কতজনের মধ্যে। তার মনে হয় কত অনভিজ্ঞ ছিল সে মানবচরিত্র সম্পর্কে। এখানে এসে কয়েক মাসের মধ্যেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো যেন। সে দেখল এতদিন যাদের চিনত তাদের যাওয়া আসা চলত রাজপথে। মনের গলিপথের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিলনা তাদের। অফিসে এসে মানুষের মনের অনেক জটিল বিচিত্র গলিঘুঁজির হদিশ পেল অবন্তী।

অবাক বিস্ময়ে এই সব মানুষকে লক্ষ্য করতে করতে অবন্তী ভাবত একটি জায়গায় এত বহুবিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটে? এতদিন যাদের চিনত তাদের সঙ্গে এদের তুলনা করে গরমিল খুঁজে পেত। বিস্ময় যেন বাগ মানতে চাইতনা।

তবু সে মুক্তি খুঁজে পেত অফিসে। বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে এই বহুতল ভবনের শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে আরও অনেকের সঙ্গে কাজ করতে করতে নিজের জীবনের অর্থ খুঁজে পেত। বাড়িতে এতদিন নিজেকে মনে হোত 'দায়' বলে। অফিসে কাজ করার পর তার মনে হোল অন্য কথা। সে কেন দায় হবে? বরং সংসারের দায়দায়িত্ব বহন করবে সে কিছুটা দাদাদের সঙ্গে।

এই কয় মাসে অনেক সেকশানে ঘুরে এসেছে সে। কোথায় দুই মাস, কোথায় এক মাস আবার কোথায় বা তিন মাস। পরিচয় হয়েছে অনেকের সঙ্গে। কাউকে তার ভাল লেগেছে। কাউকে লাগেনি। কেউ হয়ত খুব নরম শান্ত স্বভাবের। আবার কেউ বা সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির।

তবু অফিসে আসতে খারাপ লাগতনা তার। অফিস ভীতি কেটে গিয়েছিল পুরোপুরি। এখন তার অফিসপ্রীতি নিয়ে বরং ঠাট্টাতামাসা করে কেউ কেউ। তার দশ মাসের অ্যাপ্রেনটিস পিরিয়াডে সে কামাই করেছে মাত্র এক দিন। তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে অফিস কাটেনি একদিনও। আর দেরি করেও অফিসে আসেনি কোনদিন।

সকলের আগে অফিসে আসে সে আর শ্যামলী। এ ব্যাপারে শ্যামলীর আগ্রহ তার থেকে কম না। পার্সোনালের মিসস চন্দ মাঝে মাঝেই ঠাট্টা করেন তা নিয়ে। কপট আফশোস করেন।

—কি শুরু করে দিয়েছে এই মেয়ে দুটো! এভাবে রেকর্ড তৈরি করে চললে আমরা যাই কোথায়? আজ খুব আশা ছিল তোদের আগে এসে পৌঁছাব। কিন্তু হায় কপাল! আমার আগেই দুই মূর্তিমতী এসে হাজির। তোরা যেভাবে নাম কিনছিস তাতে আমাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে?

অবন্তী কিন্তু গলেনা সেই স্তুতি শুনে।

—কি যে বলেন চন্দদি? আপনাদের আবার কি অবস্থা দাঁড়াবে? কত বছর ধরে চাকরি করছেন। আপনাদের চাকরি কি কেউ নিতে পারবে? কিন্তু আমার কথা ভাবুন। আর মাত্র দু'মাস আছি। তারপর কি হবে জানিনা। অনিশ্চিত অবস্থা।

মুখিয়ে ওঠেন মিসস চন্দ।

—যত বাজে কথা! অনিশ্চিত অবস্থা আবার কি? চাকরি তোর ঠিকই হবে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে রসিকতা করেন আবার।

—তার ওপর যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছিস তুই তোকে চাকরি না দিয়ে উপায় আছে না কি ডি. এম-এর?

শ্যামলীও যোগ দিল।

—সত্যি চন্দদি। ওর খালি ভয় শেষ পর্যন্ত পাবে তো চাকরিটা? আমাদের সকলেরই তো চাকরি হয়েছে। তাহলে ওর কেন হবে না? বলে বলেও বোঝানো যায়না ওকে।

আর কিছু বলেনা অবন্তী। ওর ভয়ের কথা ও কাকে বোঝাবে? চাকরি ওর প্রয়োজন শুধু টাকার জন্য না। নিজের মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্যও প্রয়োজন ওর চাকরির। চাকরি না থাকলে তার জীবনযাত্রার এই ছকটা হঠাৎ পালটে যেতে পারে ভাবলেই গা শিরশির করে যেন। আরেকটি একান্ত ব্যক্তিগত কারণ আছে। শ্যামলীর সঙ্গে এই কয়েক মাসে তার খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। কিছুদিন পর থেকেই তারা 'তুমি' ছেড়ে তুই তোকারি শুরু করেছে।

কিন্তু তাকেও বলতে পারেনি সেই ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা। মাস দুয়েক আগে আলাপ হয়েছে তার পার্সোনালের তরুণ অফিসার পট্টনায়কের সঙ্গে। উৎকলী এই অফিসারের সঙ্গে তার প্রাথমিক পরিচয় কাজের সূত্রে। কিন্তু কিছুদিন পরেই ভদ্রলোকের উৎসাহে আলাপের মোড় ঘুরল অন্য দিকে।

অবন্তীর মনে আছে সেদিন শ্যামলী আসেনি অফিসে। ছুটির ঠিক আগে আগে শুরু হোল দারুণ বৃষ্টি। অনেকেই চলে গিয়েছিল। অবন্তীর সঙ্গে ছাতা ছিলনা। চুপচাপ নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। চেনাশোনা কাউকে ধারে কাছে দেখতে পাচ্ছিলনা। তার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। ফিরতে দেরী দেখে ঘরবার করতে শুরু করে দেবেন মা। মায়ের শরীরের কথা ভেবেই যেন মনে মনে বেশি উৎকণ্ঠিত বোধ করছিল সে।

ঠিক সেই সময়েই নীচে নেমে এসেছিল পট্টনায়েক, অবন্তীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রস্তাব করেছিল ট্যাক্সিতে তাকে পৌঁছে দেবে। অবন্তী সম্মত হয়নি। বলেছিল

রাত তো বেশি হয়নি। বৃষ্টিটা একটু ধরলেই বাসে করে চলে যাবে।

পট্টনায়েক তখন জেদ করেছিল। বলেছিল সে তো ট্যাক্সি করবেই। অন্ততঃ তারাতলা পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিতে পারে অনায়াসে। বৃষ্টি খুব শিগগির ধরবে বলে মনে হচ্ছেনা। পরে অবন্তীর মুশকিল হবে। সে আরও বলেছিল অবন্তীর যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে।

শুনে ভয় পেয়েছিল অবন্তী। দিদির ব্যাপারে রীতিমত কানাঘুষো হয়েছিল তাদের পাড়ায়। সে যদি এখন কোন পুরুষের সঙ্গে ট্যাক্সিতে করে বাড়ি ফেরে তাহলে তা নিয়ে কম হৈ চৈ হবে না। তার ভালমানুষ মাকে বাড়ি বয়ে হয়ত সে খবর শুনিয়ে যাবে কেউ। বলা যায়না হিতোপদেশের ছলে মায়ের মনে ভয় ঢুকিয়ে না দিয়ে যায়!

চিন্তাভাবনা করে অবন্তী নিমরাজী হোল তারাতলা পর্যন্ত ট্যাক্সিতে যেতে। পট্টনায়েক থাকে নিউ আলিপুরে। তাকে তারাতলায় নামিয়ে ট্যাক্সি চলে যাবে নিউ আলিপুরে। তার জন্য বাড়তি সময় বা অর্থ কোনটাই ব্যয় হবেনা। অথচ অবন্তী বেশির ভাগ রাস্তাটাই চলে আসতে পারবে নির্ঝঞ্ঝাটে।

ট্যাক্সিতে দূরত্ব রেখেই বসেছিল অবন্তী। তার খুব লজ্জা করছিল। আর ভয়। পরিচিত কেউ দেখলে কি অর্থ করবে? আগে অনাত্মীয় কোন পুরুষের পাশে এক ট্যাক্সিতে বসেনি সে একা। সারাক্ষণ সসঙ্কোচে সিঁটিয়ে ছিল যেন। তাদের অফিস পাড়া পেরিয়ে ট্যাক্সিতে কিছুটা এগিয়ে যেতেই পট্টনায়েকের সম্বোধনে ঘুরে তাকাল সে। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রায় ফিসফিস করে কথা বলেছিল পট্টনায়ক।

---আপনার মত এত সুন্দরী মেয়ে আর দ্বিতীয় কেউ আসেনি আমাদের এই তেল কোম্পানির অফিসে। প্রথম দিন দেখেই কেমন ধাক্কা লেগেছিল। মনে হয়েছিল এত সুন্দর মেয়ে অফিসে কাজ করবে কি করে? ভ্রমরের মত ঘুরঘুর করবে না ছেলেরা? হাতের কাজ ফেলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে হয়ত।

অনভ্যস্ত কানে অস্বস্তিকর ঠেকেছিল কথাগুলো। সে যে সুন্দরী তা সে জানে। এ পর্যন্ত তার সৌন্দর্যের প্রশংসা কম শোনেনি। কিন্তু অনাত্মীয় একজন যুবকের মুখে এই প্রথম এরকম স্তুতি শুনল। তার মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। আনন্দও অস্বস্তি, মুগ্ধতা ও বিতৃষ্ণা একই সঙ্গে ঘিরে ধরেছিল তাকে।

মাঝে মাঝে ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছিল পট্টনায়েকের সঙ্গে। একবার পট্টনায়ক তার ওপাশে ঝুঁকে বাইরে কি যেন দেখতে গেল। উরুতে পট্টনায়কের হাতের

আলতো স্পর্শ পেল সে তখন। কাঠ হয়ে বসে রইল অবন্তী। তার মনে হচ্ছিল কতক্ষণে তারাতলায় এসে পৌঁছবে ট্যাক্সি আর সে নেমে যাবে।

অপর পক্ষ কিন্তু দিব্যি স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতেই এটা সেটা কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগল। সহজভাবে পারিবারিক অনেক খবরাখবর জানছিল সে প্রশ্ন করে। কিন্তু অবন্তী কিছুতেই স্বস্তি বোধ করছিলনা। পট্টনায়কের শরীরের স্পর্শ তার স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করছিল কেবলি। তার আড়ষ্টতা লক্ষ্য করে রসিকতা করেছিল পট্টনায়েক।

—কি ব্যাপার মিস মিত্র? আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?

ত্বরিতে জবাব দিয়েছিল অবন্তী।

—না না বিরক্ত হব কেন?

—আপনাকে দেখে কিন্তু সেরকমই মনে হচ্ছে।

পট্টনায়কের চোখদুটি বাঙ্‌ময় হয়ে সারাক্ষণ স্তুতি করছিল অবন্তীর সৌন্দর্যের। শরীরের নিষিদ্ধ সীমানায় এই যুবক অফিসারের মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিল সে। আগে এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি তার। নীতিবোধে লাগছিল সে। কিন্তু এর মাদকতাটুকু অস্বীকার করতে পারছিলনা তার শরীর মন।

সেদিন থেকে শুরু হয়েছে তার জীবনের গোপন অধ্যায়। সেই ঘটনার জের যে আরও কতদূর চলবে তা সে বুঝতে পারেনি তখন। পরে আবার কথা হয়েছে তার পট্টনায়কের সঙ্গে। তাকে ছুটির পর ট্যাক্সিতে বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছে সে। কিন্তু অবন্তী রাজী হয়নি।

তবু সুযোগ পেলেই, একান্তে পেলেই বাঙ্‌ময় চোখে তাকায় তার দিকে পট্টনায়ক। স্তুতি করে তার সৌন্দর্যের।

মিস মিত্র আপনি এত সেজে আমার সামনে আসবেননা। আমি তো সামান্য মানুষ। মুনি ঋষিদের পর্যন্ত তপোভঙ্গ হতে পারে আপনাকে দেখলে।

এ পর্যন্ত সৌন্দর্যের প্রশংসা সে কম শোনেনি। স্কুল কলেজে তো বটেই অফিসেও সহকর্মী মেয়েদের মুখে অনেক প্রশংসা শুনেছে। একটু বিশেষভাবে সেজে আসলেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখত তাকে।

—তোমাকে যে আজ আগুনের মত দেখতে লাগছে। চোখ যে ঝলসে যাচ্ছে অবন্তী।

বহুজনের চোখের সতৃষ্ণ মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে ব্যক্ত হয়েছে এই রূপমুগ্ধ বিস্ময়। কিন্তু

পট্টনায়কের স্তুতিতে, দৃষ্টিপাতে বাড়তি এক মাদকতার স্বাদ পেয়েছিল যেন সে। শ্যামলীর সঙ্গে তার এত ঘনিষ্ঠতা। তাকে পর্যন্ত জানায়নি এই ঘটনার কথা।

ট্যাক্সিতে সে একদিনই গিয়েছিল পট্টনায়কের সঙ্গে। কিন্তু অফিসে নানা উপলক্ষে তার সঙ্গে পরিচয় একটু একটু করে গাঢ় হয়ে উঠেছে। নিজের মধ্যে ভয়ঙ্কর এক দুর্বলতা টের পাচ্ছে সে।

পট্টনায়ক বাংলভাষিদের মত বাংলা বলতে পারলেও বাঙালি নয়। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠলে মা বা দাদারা সেটা কখনই মেনে নেবেনা। প্রথম প্রথম এসব চিন্তা করে নিজেকে প্রশ্রয় দেয়নি সে।

কিন্তু পট্টনায়ক নাছোড়বান্দা। কারণে অকারণে ছলছুতোয় অবন্তীর সঙ্গে কথা বলে। বেশির ভাগ সময়েই সেটা থাকে তার রূপের স্তুতি। এরমধ্যে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে এই রূপস্তুতি শুনে যে কোনদিন একটু ভাল করে সেজে আসলেই মনে হয় পট্টনায়কের কথা। তার চোখদুটি খুঁজে বেড়ায় তাকে। মনে মনে কল্পনা করে তাকে ঠিক কি বলবে পট্টনায়ক।

কাজের ব্যস্ততার জন্য যদি অবন্তীর সঙ্গে তার দেখা না হয় তাহলে গভীর হতাশায় ভরে যায় তার মন। সব সাজ মনে হয় মিথ্যে। সুদর্শন পট্টনায়কের দীঘল রূপমুগ্ধ চোখের সামনে না দাঁড়ালে নিজের সাজসজ্জা অর্থহীন ঠেকে যেন।

তার ব্যাপারটা না বুঝলে পট্টনায়কের ব্যাপারটা যে অনেকে অনুমান করছে তা সে বুঝতে পারে। দু'একবার এ নিয়ে রসিকতাও করেছে কেউ কেউ। তাদের সেকশানে পট্টনায়ক এলেই বিভাদি, উজ্জ্বল কিংবা সুধীররা চোখ চাওযাচাওয়ি করে নিজেদের মধ্যে। অবন্তীর চোখে পড়েছে সেটা।

পট্টনায়ক তার চেয়ারের কাছে আসলেই ধড়াস ধড়াস করত তার বুক। মিশ্র আবেগে। অপরে তার কি অর্থ করবে ভেবে যেমন অস্বস্তি আর সঙ্কোচ হোত, সঙ্গে সঙ্গে পট্টনাকয়ক কি বলবে ভেবে তীব্র আনন্দের উত্তেজনা বোধ করত। মাদক দ্রব্যের মত প্রশস্তি পাওয়ার এই নেশা সঞ্চারিত হয়ে চলেছে তার রক্তে।

প্রথম দিকে পট্টনায়কের অবাধ খোলামেলা কথা শুনে অবাক লাগত। নির্লজ্জ অসভ্য বলে মনে হোত তাকে। পট্টনায়ক হয়ত বুঝত। তবু দমতনা। অবিচলিত ভঙ্গীতে নিঃসঙ্কোচে উজাড় করত তার সৌন্দর্য দুর্বলতা।

—আপনার মত এত সুন্দর মেয়ে কমই দেখা যায় মিস মিত্র। আপনার সব কিছু বড় সুন্দর। আপনার গায়ের রঙ, মুখশ্রী, নাক চোখ সব যেন নিখুঁত একেবারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নারীকে বিধাতা অনেক যত্ন নিয়ে নিপুনতা দিয়ে

সৃষ্টি করেছিলেন। আপনাকে দেখলে সেটা কতখানি সত্য বুঝতে পারি। আপনার মত এমন সুন্দর ভরাট বুক কম মেয়েরই দেখেছি। আপনার কোমর কিংবা পশ্চাৎদেশের গড়ন দেখলে যে কোন পুরুষের বুকেই ধাক্কা লাগবে। আপনি হয়ত খারাপ ভাবছেন আমাকে। কিন্তু আমি কোন খারাপ অভিপ্রায়ে এসব বলছিনা। অন্য কোন পুরুষ যে কথা মনে মনে বলত আমি তা মুখে বলছি।

কয়েকদিন পর একদিন তার কোন এক বন্ধুর গাড়িতে করে অনেকদূর নিয়ে গিয়েছিল তাকে পট্টনায়ক। ডায়মণ্ডহারবারের ওদিকে। পট্টনায়ক সেদিন তাকে চুমু খেয়েছিল। তার স্তনবৃন্তে হাত রেখেছিল অনেকক্ষণ। তার নাভিতে, তলপেটে হাত রেখে স্পর্শসুখ অনুভব করেছিল। অবন্তীর আপত্তি গ্রাহ্য করেনি।

অবন্তীকে আরও একটি বিচিত্র অনুরোধ করেছিল সে। বলেছিল তার শরীরের বিশেষ এক অঙ্গে হাত রাখতে। অবন্তী রাজী হয়নি। জোর করে অবন্তীর হাত টেনে নিয়ে সেটি ন্যস্ত করেছিল নিজের অঙ্গে। ভয়ে লজ্জায় কাঠের পুতুলের মত নিষ্প্রাণ হয়ে বসেছিল অবন্তী। স্বর্গোদ্যানে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে যে হিম্মত দরকার তা অবন্তীর ছিলনা। ভয় আর লজ্জা ছাড়া তৃতীয় কোন অনুভূতি আসতে পারেনি তার মনে।

অবন্তীর বিরক্তি দেখে বাধ্য হয়েছিল পট্টনায়ক সেদিনের সেই অধ্যায়ে যতি টানতে। অবন্তী বাধা না দিলে কিংবা বিরক্তি প্রকাশ না করলে হয়ত আরও বেপরোয়া হয়ে উঠতে সে। সেদিনের সেই ঘটনায় দুজনেই দু'জনের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

পরে পট্টনায়ক দূরত্ব রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তখন অবন্তীরই খারাপ লাগছিল। পুরুষের মোহাবিষ্ট চোখের সামনে নিজের শরীরকে ফুলের মত মেলে ধরার যে ইচ্ছা তার রক্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল তা এর মধ্যে মাদক নেশার মত দুর্নিবার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

পট্টনায়ক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে না আসলে সে নিজেই ছলছুতো করে চলে যেত তার কাছে। অপর পক্ষের গাম্ভীর্য দেখে, দূরত্ব রাখার প্রয়াস দেখে ভেতরে ভেতরে খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ত।

পট্টনায়ক যেন অনমনীয় হয়ে উঠেছিল ইচ্ছা করেই। তার মনে আছে তাকে সামনে দেখে নিস্পৃহ গলায় প্রশ্ন করেছিল সে।

---কিছু বলবেন?

ইচ্ছা করে লাল শাড়ী পরেছিল সেদিন অবন্তী। লাল রঙ খুব প্রিয় পট্টনায়েকের। অবন্তীকে একটি দারুণ কথা বলেছিল সে একদিন।

—মিস মিত্র লাল রঙের শাড়ী পড়লে মুর্তিমতী বাসনা বলে মনে হয় আমার আপনাকে। আমার বুকের তৃষ্ণা যেন বেড়ে ওঠে আরও।

সেদিন কিন্তু টলেনি সে এতটুকুও। অবন্তীই প্রকাশ করেছিল তার দুর্বলতা। সামনে কেউ ছিলনা দেখে মনের যন্ত্রণা ব্যক্ত করেছিল।

—আপনি রাগ করেছেন?

একটুক্ষণ চুপ করে স্থির চোখে দেখেছিল তাকে পট্টনায়ক। পরে প্রায় ফিসফিস করে জবাব দিয়েছিল।

—প্লীজ। মিস মিত্র। এভাবে আমার সামনে এরকম শাড়ি পরে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেননা। আপনারা মেয়েরা বড় সাংঘাতিক। পুরুষকে লোভ দেখাবেন। আবার সেই লোভের জন্য পুরুষকে অপরাধী খাড়া করতেও বাধবেনা আপনাদের এতটুকু।

বাধবাধ গলায় প্রশ্ন করেছিল অবন্তী।

—আমি কি আপনাকে লোভ দেখাচ্ছি?

চারপাশে তাকিয়ে দেখে আস্তে দৃঢ় গলায় জবাব দিয়েছিল পট্টনায়ক।

—দেখাচ্ছেননা? আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন? দেখেছেন কি ভয়ঙ্কর সুন্দর দেখাচ্ছে আপনার শরীর? পুরুষের সেক্সকে যদি তা তাতিয়ে তোলে তাহলে দোষ কার হবে?

সব সময়ে শরীরের প্রতি এই আসক্তি ভালো লাগেনা অবন্তীর। মানুষটার সম্পর্কে অনাস্থা হয় মাঝে মাঝে। তবু পট্টনায়কের সান্নিধ্যে, তার প্রশস্তিতে, তার রূপমুগ্ধ দু'চোখের দৃষ্টিতে উৎসবের আমেজ তৈরি হয় যেন। তার নিরানন্দ জীবনে তার স্বাদ সে অগ্রাহ্য করতে পারেনা।

তারপরও কাছেপিঠে ঘুরে এসেছে সে পট্টনায়কের সঙ্গে। কিন্তু পট্টনায়ক একটু সংযত হয়ে গেছে সেই ঘটনাব পব। তাকে দেখে অবন্তীব মনে তখন অন্য রকমের দুশ্চিন্তা হতে থাকে। এই কয়েক মাসে মানসিক দিক দিয়ে সে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে পট্টনায়কের সঙ্গে যে তার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবেনা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায় তার।

পট্টনায়কের মধ্যে আকর্ষণের কমতি দেখলেও যেন তা সহ্য হতে চায়না। ইদানীং আর একটি আশঙ্কা যুক্ত হয়েছে সেই সঙ্গে। তার অ্যাপ্রেনটিসশিপের সময়সীমা এখন শেষ হওয়ার মুখে। এর পর চাকরিটি তার জুটবে কিনা জানেনা সে।

শ্যামলী অবশ্য তার আশঙ্কাকে পাত্তা দেয়না। ও বলে অবন্তী কেন চাকরি পাবেনা? ওর রেকর্ড তো ভালই। তাছাড়া এ পর্যন্ত অ্যাপ্রেনটিসরা চাকরি

পেয়েই এসেছে। অবন্তীদের বেলায় অকারণে কেন তার অন্যথা হবে?

তবু অবন্তীর মনের ভয় দূর হয়না। চাকরি না হওয়া মানে যে কত কিছু তা ও কাকে বোঝাবে? বিশেষ করে পট্টনায়কের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে ভাবলেই ভারী হয়ে ওঠে তার মন। কখনও কখনও তার মনে হয় শ্যামলীকে বলে তার মনের এই সংগোপন চিন্তার কথা। কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করে।

শ্যামলী খুব কড়া এসব ব্যাপারে। অবন্তীর আগে এসেছে সে এ অফিসে। অনেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় আছে তার। তবু ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার একটা মাত্রা রেখে চলে। উপযাচক হয়ে বিনা প্রয়োজনে কারুর সঙ্গেই বড় একটা কথা বলেনা।

ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে অনেকেই খুব পছন্দ করে তাকে। তার কারণ তার নির্বোরোধী স্বভাব। কারুর সঙ্গে যেমন তার খুব মাখামাখি নেই তেমন অসদ্ভাবও নেই।

ছেলেরা অযাচিতভাবে উপযাচক হয়ে কথা বলে তার সঙ্গে। শ্যামলী কিন্তু তার গাম্ভীর্য নিয়ে দূরত্ব বজায় রেখে মেশে তাদের সঙ্গে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলে দেখেছে স্বভাবে কিছুটা রক্ষণশীল শ্যামলী। এসব কারণেই পট্টনায়কের কথা বলতে সাহস করেনি সে তার কাছে।

সে বোঝে পট্টনায়কের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে একটা বাড়াবাড়ি আছে। নিজের মধ্যে তা নিয়ে যথেষ্টই কিন্তু কিন্তু আছে। কিন্তু কি করবে সে? দুর্বার নিয়তির মত তার প্রতি আকর্ষণকে যে দূরে ঠেলতে পারেনা কিছুতেই।

চার

এক বছরের অ্যাপ্রেনটিসশিপ শেষ করে অবন্তী এখন বসে আছে বাড়িতে। টাইপ টেস্ট, ইন্টারভ্যুর পালা শেষ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। মাস তিনেক ধরে শবরীর প্রতীক্ষায় আছে সে। শ্যামলীদের কাছে শুনেছিল এক মাসের মধ্যেই চাকরির খবর এসে যাবে। তার মনে সঞ্চারিত হয়েছিল সেরকম একটি আশা।

কিন্তু পর পর তিন মাস কেটে যাওয়ার পরও যখন তেল কোম্পানির অফিস থেকে কোন খবর আসলনা তখন ধীরে ধীরে সেই আশার স্থলাভিষিক্ত হলো তীব্র দুঃসহ এই হতাশা।

ওর মনে হোল শ্যামলীরা যাই বলুক না কেন চাকরিটা হবেনা ওর। এক বছরের অফিস অভিজ্ঞতা অনেক পরিবর্তন এনেছিল তার মনে। বাড়ির চারদেয়াল যেন গিলে খেতে আসত। জেলখানোর বন্দী বলে মনে হোত নিজেকে।

ও ভাবছিল কাজের ব্যাপারে কোনদিন কোন ফাঁকি দেয়নি ও। হাজিরার ব্যাপারেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। তা সত্ত্বেও যে ওকে চাকরিটা দেওয়া হোলনা তার কারণ কি পট্টনায়কের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতার কথা জেনে ফেলেছে অফিসে? ওর সম্পর্কে কি খারাপ ধারণা হয়েছে সেজন্য?

সঙ্গে সঙ্গে ভাবল চাকরি না পেলেই বা কি? ও তো আর অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য চাকরি করতে যায়নি? ওর দাদা তো আপত্তিই করেছিল। অবশ্য ও যদি দাদার কথা শুনে চলত তাহলে জীবনের ওর পরম রমণীয় অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হোত। একটি সুদর্শন যুবকের প্রেমে জীবন কত রঙিন বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে তা তো জানতে পারতনা ও?

শ্যামলী কিন্তু স্থিরনিশ্চয় চাকরি অবন্তীর হবেই। মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে সে অবন্তীর বাড়ি। একদিন তার সন্দেহের কথা ব্যক্ত করে ফেলল অবন্তী।

---দেখ শ্যামলী আমার মনে হয় ইউনিয়নকে যদি একটু পাত্তা দিতাম তাহলে হয়ত চাকরিটা হয়ে যেত। তুই বারণ করলি তখন। এখন দেখছিস তো তার ফলটা খুব ভাল হলোনা। ইউনিয়ন আমার জন্য চেষ্টা করবেনা।

শ্যামলী হাসল।

---তুই ভাবছিস ওরা চেষ্টা করলে তবেই চাকরি হবে? তোর ধারণা ঠিক না। নিজেদের গুরুত্ব দেখাতে ওরকম সব বলে ওরা। আমাকেও এক কথাই বলেছিল। আমি পাত্তা দিইনি। কিন্তু আমার কি চাকরি হয়নি?

এসব শুনলে অবন্তীর মনে হয় তাহলে হয়ত পট্টনায়কের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা জানাজানি হয়ে গেছে বলেই চাকরিটা হচ্ছেনা তার। শ্যামলীকে বলতে ইচ্ছা করে ওর মনের সন্দেহের কথা। কিন্তু সঙ্কোচে পারেনা। ব্যাপারটা যে ভাল চোখে দেখবেনা শ্যামলী তা ও জানে। দারুণ রক্ষণশীল ও। অবন্তীর সম্পর্কে ধারণা খারাপ হয়ে যাবে। অবন্তী সায় দেয়।

---তা ঠিক। তবে দেখছিস তো কতদিন হয়ে গেল? বাড়িতে বড় একঘেয়ে লাগছে। এই এক বছরে অন্য রকম অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। প্রথমে কত ভয় ছিল অফিস নিয়ে। পরে তোদের সঙ্গে জানাশোনা হবার পর কি চমৎকার কেটেছে দিনগুলো। অফিস করছি বলে মনেই হোতনা!

---আমাদের জন্য কি আর চমৎকার কেটেছে দিনগুলো? আসলে পট্টনায়কের জন্যই অফিসকে অফিস বলে মনে হয়নি তোর। ঠিক বলছিনা?

স্তম্ভিত বিস্ময়ে বাক্‌শক্তি লোপ পায় অবন্তীর। শ্যামলী যে পট্টনায়কের কথা

জানে সেরকম কোন আভাস ঘূণাক্ষরে পায়নি আগে। এক মুহূর্ত চুপ করে শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে থেকে পরে আস্তে আস্তে থেমে প্রশ্ন করে সে।

---তোকে পট্টনায়কের কথা কে বলল?

---কে বলেছে সেটা জেনে লাভ কি তোর? আমি নিজেও দেখেছি তোকে অফিসের বাইরে পট্টনায়কের সঙ্গে। আমি জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম। কিন্তু তুই গোপন করতে চাইছিস দেখে নিজের থেকে আর কথাটা তুলিনি।

---তাহলে আজ কেন তুললি?

---আজ না তুলে পারলামনা বলতে পারিস। শোন্ অবন্তী ভালই হয়েছে কথাটা তুলে। চাকরি তোর হবেই। না হওয়ার কোন কারণ ঘটেনি। একটু দেরি হচ্ছে এই যা। কিন্তু পট্টনায়কের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দে তুই। লোকটা সুবিধার নয়।

অবন্তী রুষ্ট হলো।

---তুই কি করে জানলি সুবিধার নয়?

---অনেকেই জানে। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তার কাছে ঘুরঘুর করা ওর স্বভাব। তুই আসার আগে সন্ধ্যা সাহানীর সঙ্গে খুব দহরম মহরম চলছিল। গত বছর সন্ধ্যা বিয়ে করার পর তবে ওর উৎসাহে ভাটা পড়ে।

অবন্তীর জানা ছিলনা এ খবর। সন্ধ্যা সাহানী 'সেলস'-এ কাজ করে। বেশ চটকদার চেহারা। শরীরের আঁকাবাঁকা দেখবার মত। আঁটো চুড়িদারে বক্ষসৌন্দর্য আর নিতম্বসৌন্দর্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যেন। সামনে এসে দাঁড়ালে ওর শরীরের দিকে চোখ না পড়ার উপায় নেই। কয়েকবার তাদের সেকশানে এসেছে ও। অবন্তী দেখেছে ছেলেরা অনেকেই আড়ে আড়ে দেখছে ওকে। তাদের লুব্ধ কামনা ঝড়ের মত ফুঁসে উঠছে যেন ওর শরীরকে ঘিরে।

পট্টনায়কের সৌন্দর্যপ্রীতির তার অজানা নেই। কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে তার দোস্তির খবর জানতানা সে। খবরটা পেয়ে মন ভাবী হয়ে উঠল অবন্তীর। ঠিক যেন বিশ্বাস হতে চাইছিলনা। পট্টনায়কের সতৃষ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টি, তার নরম আবেগসিক্ত কথাবার্তা মনে পড়ছিল তার। সেসবের কেন্দ্রবিন্দু সে না হয়ে অন্য যে কোন একটি সুন্দরী মেয়েই হতে পারে একথাটা ভাবতেও খারাপ লাগছিল।

শ্যামলীর কথা শুনে তার নিজের চিন্তাধারা কোথায় যেন হোঁচট খেল। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে মনে মনে যে গর্ব ছিল তা যেন টোল খেল কিছুটা। এই প্রথম নিজেকে নিজের সৌন্দর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অন্যভাবে চিন্তা

করছিল। আহত অভিমানে কষ্ট পাচ্ছিল। নিজেকে অসম্মানিত বোধ করছি

তবু পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিলনা তার শ্যামলীর কথা। মনে হচ্ছিল তার ... সুদর্শন অফিসার পট্টনায়কের এই আসক্তি দেখে ঈর্ষা বোধ করেনি তো শ্যামলী

অবন্তীকে চুপ করে থাকতে দেখে শ্যামলী হয়ত অনুমান করে তা মনোভাব। ওর প্রশ্নে পাওয়া গেল তার আভাস।

---তোর খুব রাগ হচ্ছে তো আমার ওপর? ভাবছিস আমি পট্টনায়কে পছন্দ করিনা বলে এসব কথা বলছি?

---তা নয়। তবে ভাবছি আমি যতটুকু চিনেছি ওকে তাতে ওরকম নিকৃ বলে মনে হয়না।

শ্যামলী হাসে। অবুঝ শিশুর কথা শুনে বয়স্করা যেমন হাসে তেমন ভা শ্যামলীকে হাসতে দেখে গায়ে জ্বালা ধরে অবন্তীর।

---হাসছিস যে?

---হাসি পেল তাই হাসছি। পট্টনায়ক খুব চালাক লোক। তোর মত সর সাদাসিধে মেয়ে ওর স্বভাবের তল পাবে কি করে? তবে এখনই না বুঝিস প বুঝবি। সত্য তো আর চাপা থাকেনা চিরদিন?

অসহিষ্ণু বোধ করে অবন্তী। শ্যামলীর সান্নিধ্য অসহ্য লাগে। নিজেকে কেম ছোট মনে হতে থাকে। তবু ঝুলি থেকে যে বেড়ালটা বেরিয়েছে তার একট ব্যবস্থা করা দরকার। শ্যামলীকে চমকে দিয়ে ব্যক্ত করে সে তার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত প্রশ্নটা।

---আমাদের অফিসে নিশ্চয় কথা হয়েছে এ নিয়ে। কিন্তু তুই সেটা বল প্রয়োজন মনে করিসনি। আমি হলে কিন্তু বলতাম।

---বলে লাভ হতো কি? তুই নিজেও তো মুখ ফুটে কিছু বলিসনি! ত একটা কথা জেনে রাখ। অফিস খুব নিরাপদ জায়গা নয়। সকলকেই সম চলতে হয় এখানে। বিশেষ করে মেয়েদের। একটু অসাবধান হলেই নানা কথ বলতে শুরু করে লোকেরা। তুই নিজেই তো দেখেছিস মন্দিরাদি, মিস কেদি কিংবা রেবা ধরকে নিয়ে কি ধরণের আলোচনা করে লোকেরো? ছেলেদে মধ্যে কতজনে কত কি করে বেড়াচ্ছে। তা নিয়ে কি এরকম সরস আলোচ চলে দেখেছিস? পারতপক্ষে কারুর সঙ্গেই বেশি কথা বলিনা আমি এজন্য ছেলেদের সঙ্গে তো রীতিমত হিসেব করে চলি। পট্টনায়ক আমার সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করেছিল। আমি পাত্তা দিইনি। আমার ওপর খুব রাগ ও

সেজন্য। একদম পছন্দ করেনা আমাকে। শুনেছি ও নাকি বলে মিস গুহর এত দেমাক কেন বুঝিনা। তাও যদি চেহারাটা সুন্দর হতো! শুনলে অবাক হবি প্রথম যখন সেকশানে এসেছিলাম তখন আমারও কম স্তুতি করেনি। 'মিস গুহ আপনার মত এরকম চোখ নিয়ে পৃথিবী জয় করাও সম্ভব'। এরকম সব কথা বলত সমানে। আমার একটুও ভাল লাগেনি ওর হাবভাব। মনে হয়েছিল ভদ্রলোক ক্যাসানোভা টাইপের।

অবন্তীর ভালো লাগছিলনা এসব কথা। ওর মনে হচ্ছিল নিজেকে উচ্চ মার্গের লোক প্রতিপন্ন করতে চাইছে শ্যামলী। অবন্তীর লোভ বাসনার চেহারাটা সামনে তুলে ধরে তাকে লজ্জা দিতে চাইছে। নাতিসুন্দর চেহারা সত্ত্বেও স্বভাবগৌরবে অবন্তীর তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাইছে। পট্টনায়কের সম্পর্কে রূঢ় মন্তব্যগুলিও প্রীতিপ্রদ ঠেকছিলনা। আর বিশ্বাসযোগ্য তো নয়ই।

শ্যামলীকে থামিয়ে দিল সে।

---থাক শ্যামলী। আমি তো ছেলেমানুষ নই। আমাকে লোক চেনাতে হবেনা। এখন বল আমার কি করণীয়? আমি কি গিয়ে খোঁজ নেব?

---আর কয়েকটা দিন দেখনা। আর আমি তো আছি। আমিও খোঁজ নিতে পারব। তোর না যাওয়াই ভাল। তবে চাকরি হবেই। ছিয়াত্তর সাল থেকে অ্যাপ্রেনটিসশিপ শুরু হয়েছে। একমাত্র সাতাত্তর সালেই শুনেছি কারুর চাকরি হয়নি। তার কারণও ছিল। শুনেছি কেউই নাকি টাইপ প্র্যাকটিস করেনি। অথচ ছাত্র বা ছাত্রী হিসাবে প্রত্যেকেই নাকি দারুণ ছিল। তারপর আর কোন বছরেই ওরকম ঘটনা ঘটেনি।

এরপর অফিস নিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলল দুজনের মধ্যে। অবন্তীই উদ্যোগী হয়ে জিজ্ঞাসা করছিল অনেকের কথা। শ্যামলী চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে সেই আলোচনার রেশ চলল অবন্তীর মনে।

সীমাহীন বিস্ময় এসে ঘিরে ধরেছিল তাকে। সে ভেবেছিল পট্টনায়কের সঙ্গে তার মেলামেশার খবর কেউ জানেনা। সহস্রচক্ষু ইন্দ্রের মত সজাগ অতন্দ্র চোখে অফিস যে তাদের লক্ষ্য করছিল তা সে বুঝতে পারেনি ঘূণাক্ষরেও। সবচেয়ে অবাক লাগছিল শ্যামলী তাকে কিছু জানায়নি। পট্টনায়কের সম্পর্কে সব শুনে টুনেও বিস্বাদ লাগছিল তার মন। তার সৌন্দর্যপ্রীতির নমুনা সে নিজেও অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু সে বুঝতে পারছিলনা শ্যামলীকে

পট্টনায়ক যা বলেছে তা কতটুকু সত্যি?

শ্যামলী মিথ্যে কথা বলার মেয়ে নয়। কিন্তু তার চেহারা দেখে মোহিত হওয়ার কথা নয় পট্টনায়কের। অতি সাধারণ চেহারা শ্যামলীর। মুখশ্রী ভালই। আলগা একটা লাবণ্যও আছে। কিন্তু পট্টনায়কও কম উন্নাসিক নয়। শ্যামলীকে দেখে সে কেন মুগ্ধ হবে? শুধুমাত্র চোখের সৌন্দর্য দেখে আকৃষ্ট হবে?

অবন্তীর কিছুই ভাল লাগছিলনা। একদিকে চাকরির অনিশ্চয়তা অন্য দিকে পট্টনায়কের চারিত্রিক দুর্বলতা সমানে পীড়িত করছিল তাকে। বাড়ির পরিবেশও ততোধিক দুঃসহ হয়ে উঠেছে আজকাল। ছোড়দার সঙ্গে সম্পর্ক তার উত্তরোত্তর খারাপ হয়েই চলেছে। সে ছোড়দার সংশ্রব এড়িয়ে থাকতে চাইলে কি হবে? ছোড়দা গায়ে পড়ে খোঁচা মারবে তাকে।

কিছুদিন আগে তার জন্য একটা সম্বন্ধ এসেছিল। পাত্র কোন একটি কোম্পানীতে বড় অফিসার। পিতৃমাতৃহীন। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। ভাইবোন কেউ নেই। মামার কাছেই মানুষ। জামাইবাবু মারা যাওয়ার পর দিদিকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন মামা। বিয়ে থা' করেননি। ভাগনেঅন্ত প্রাণ। উপযাচক হয়ে অবন্তীকে চেয়েছিলেন তিনি ভাগনের জন্য।

যোগমায়া দেবী পাত্রের ফটো চেয়েছিলেন। ফটো দেখে পছন্দ হয়নি অবন্তীর। পাত্রের হোৎকা ভোঁতা ভোঁতা চেহারা দেখে নাকচ করে দিয়েছে তাকে। তার দাদা কিংবা মায়েরও পছন্দ হয়নি পাত্রের চেহারা। তবু তার অবন্তীর মতামত চেয়েছিল। দেখামাত্র নিজের বিতৃষ্ণা ব্যক্ত করেছিল সে। শুনে চটে উঠেছিল তার ছোড়দা।

—নিজেকে কি মনে করিস? পৃথিবীতে কি একমাত্র সুন্দরী তুই? তোর চেয়েও অনেক সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হচ্ছে খারাপ দেখতে ছেলের সঙ্গে। তারা তা মেনে নিচ্ছে। আর এমন কিই বা খারাপ দেখতে? একটু মোটা এই যা। এরকম বায়নাক্কা তুললে বিয়ে হবে তোর ভেবেছিস? বাবা যদি অনেক টাকা রেখে যেতেন তাহলেও নয় কথা ছিল। দাদা আর আমি মিলে কোন রকমে চেষ্টা করছি সংসারটাকে একটু তুলে ধরতে। কিন্তু তোদের যদি এত রকমের সব আবদার থাকে তাহলে আমরা কি করব বলতে পারিস?

অবন্তীও ছাড়েনি। সেও চটে গিয়েছিল।

—দাদার সঙ্গে তোমার তুলনা? তুমি আর দাদা কি এক? বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই সংসারের হাল ধরে আছে দাদা। আমাদের কারুর গায়ে আঁচড়টি

পর্যন্ত লাগতে দেয়নি। অথচ কোনদিন নিজের মুখে নিজের কৃতিত্ব জাহির করেনি। তুমি আর কদিন হোল ব্যবসা দেখছ? এত সব কথা বলা তোমার সাজেনা ছোড়দা। আর আমি কি তোমার ওপর নির্ভর করে আছি? কালো কুচ্ছিত হতভাগা চেহারার যে কোন লোকের কাছে গছিয়ে দিলেই হোল? আমি তা মেনে নেব সুবোধ বালিকার মত? তোমার ইচ্ছা হয় কালো কুচ্ছিত চেহারার মেয়ে বিয়ে করে তাকে উদ্ধার করনা? মহত্ব দেখাবার সুযোগ পাবে তাতে। আমার ব্যাপারে অত নাক গলিওনা।

চিৎকার করে গালাগালি দিয়েছিল অরণী।

—তোর খুব বাড় বেড়েছে দেখছি! ধরাকে সরা দেখছিস। তোর সঙ্গে আমার তুলনা? আমি বিয়ে করতে চাইলে কতজনে সেধে এসে মেয়ে 'দেবে তা জানিস?

শান্তভাবে জবাব দিয়েছিল তখন অবন্তী।

জানি। আমাদের অপদার্থ সমাজব্যবস্থার জন্য ঝোলের ভাগ তোমাদের পাতেই পড়ে। আমাদের শুধু আঙ্গুল চুযে খেতে হয়। কিন্তু আমি কেন সেটা মেনে নেব? আমি কিসে কম? আমি কেন যাকে তাকে বিয়ে করব? নিজের পছন্দমত কাউকে বিয়ে করতে পারবনা কেন?

মেয়েকে থামিয়ে দিয়েছিলেন তখন যোগমায়া দেবী।

—কে তোকে জোর করে বিয়ে দিচ্ছে বিন্তী? নিজের পছন্দমত কাউকেই বিয়ে করিস তুই। শুধু জাতটা দেখে করিস এইটুকুই তোর কাছে আমার অনুরোধ। কিন্তু রাতদিন সাপে নেউলে হয়ে দুজনে এরকম ফাটাফাটি করিসনা তো! পাড়ার লোকেই বা কি বলবে? এখন তো তোরা কেউ ছোট নেই? এখন তো একটু সমঝে চলবি?

বলাবাহুল্য দাদাও মার মতে সায় দিয়েছিল। দাদারও পছন্দ হয়নি পাত্রের চেহারা। ছেলের মামা রীতিমত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন নিঃসম্বল বিধবা মায়ের মেয়ে যত সুন্দরীই হোক এরকম পাত্র লুফে নেবে তারা। অবন্তীরা নাকচ করে দেওয়াতে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি।

যাবার সময় রেগে গিয়ে দু'চার কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

—ভাল সম্বন্ধই পেয়েছিলেন। কিন্তু সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেললেন আপনারা। কোন দাবি দাওয়া ছিলনা। শুধু হাতে মেয়ে নিয়ে যেতে রাজী ছিলাম আমরা। এরকম সম্বন্ধ আর পাবেন ভেবেছেন?

মা বা দাদাকে তার জন্য মনঃক্ষুণ্ণ হতে দেখেনি অবন্তী। কিন্তু উঠতে বসতে খোঁটা দিতে শুরু করল ছোড়দা। এদিকে তার চাকরির কোন খবর আসছেনা। অবন্তীর মত অরণীর মনেও হয়ত সন্দেহ জেগেছিল শেষ পর্যন্ত পাবে তো বিন্তী চাকরিটা? হয়ত সে কারণেই সে ভেবেছিল বিনা পয়সায় যদি বোনের বিয়েটা হয়ে যায় ক্ষতি কি?

মানসিক টানপোড়েনের সেই টালমাটাল অবস্থায় শ্যামলীর মুখে শোনা পট্টনায়ক সমাচার তার ধৈর্যকে শেষ সীমায় পৌঁছে দিল। কেবলি মনে হতে লাগল যা হোক একটা চাকরি পেলেও বেঁচে যেত সে। বাড়ির অবাঞ্ছিত পরিবেশে দুর্বহ সময় কাটাতে হোতনা তাহলে। আর অর্থের নিশ্চয়তা থাকলে অনেক রকম কটাক্ষ আর ভ্রূকুটিই অগ্রাহ্য করা যেত।

মরীয়া হয়ে খবরের কাগজে আবার বিজ্ঞাপন দেখতে শুরু করল অবন্তী। দু'একটা জায়গায় আবেদনপত্রও পাঠিয়ে দিল। সেগুলির জবাব আসার আগেই তার নিয়োগপত্র এসে পৌঁছল অফিস থেকে।

কোনদিনই খুব ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলনা অবন্তী। বাবা ও ছোড়দার মানসিকতাই পেয়েছে সে এ ব্যাপারে। তার মায়ের ঈশ্বরবিশ্বাস আর ধার্মিকতার উত্তরাধিকার পেয়েছে তার দাদা। অরুন্ধতীও অবশ্য ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিল। তবে সে অনেক দিনই মানুষের বাইরে।

নিয়মরক্ষা মত প্রতিমা দেখলে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করত অবন্তী। কিন্তু সেটার মূলে ঈশ্বরবিশ্বাস ছিলনা, ছিল আচার নিয়মের চিরাচরিত অভ্যাস। কিছুদিন হোল একাগ্র নিষ্ঠায় ঈশ্বরকে ডাকতে শুরু করেছিল সে। যে ঈশ্বর তার কষ্ট দেখে তাকে চাকরিটি পাইয়ে দিয়েছেন সেই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস জন্মাল। তার আরেকটি গোপন ইচ্ছা পেশ করল তার কাছে 'ঠাকুর পট্টনায়ক যেন খারাপ লোক না হয়। যা শুনেছি তা যেন সত্যি না হয়। পট্টনায়ককে ছেড়ে থাকতে পারবনা আমি।'

পাঁচ

অফিসে তাকে দেওয়া হোল অ্যাকাউন্ট্যাস সেকশানে। শ্যামলীর সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে পারবে ভেবে ভাল লাগল অবন্তীর। সেকশানের আরও কয়েক জনের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল তার। পরিচিত পরিবেশে কাজ করার কতগুলি সুবিধা আছে।

কিন্তু তার আশেপাশে যে অবস্থান করছে কয়েকটি অস্বাভাবিক চরিত্র তা জানা ছিল না। শ্যামলী অবশ্য একাধিকবার কয়েকটি 'বিচিত্র চরিত্রের' উল্লেখ করেছিল বিভিন্ন প্রসঙ্গে। কিন্তু তাদের বৈচিত্র্য যে মানসিক অস্বাভাবিকতার মধ্যে তা সে বলেনি খোলসা করে।

অবন্তী ভেবেছিল অফিসে হযবরল চরিত্রের পাঁচমিশেলী সংমিশ্রণের কথাই বলেছে শ্যামলী। কয়েকদিন যেতে না যেতেই তার নজরে পড়ল আশেপাশে যারা রয়েছে তাদের অনেকের আচরণই ঠিক স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থ লোকের মত নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল যাদের আচরণ এমনিতে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মত তাদের মানসিকতা দেখে। অস্বাভাবিক অসুস্থ মানুষের প্রতি তাদের অমানবিক আচরণ দেখে। অথচ এরা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক। আর মোটামুটি শিক্ষিতও বটে।

তার ডানপাশের টেবিলে বসে এস. ভি. রামন। সারদিন কোন কাজ করতে দেখা যায়না তাকে। চুপ করে বসে থাকে নিজের টেবিলে। প্রায় রোজই তার টেবিলের কাছে এসে বিজিত চ্যাটার্জ্জী কিংবা সুজয় ঘোষ কোকিলের ডাক ডাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে উঠে যা সামনে পাবে তা ছুঁড়ে মারতে থাকবে রামন। ছেলেরা তাকে বুডধা, বুডধা বলে ক্ষ্যাপাবে ক্রমাগত। আর জবাবে রামন তাদের খিস্তি খেউর করবে। বাপ মা চোদ্দ পুরুষের মুণ্ডপাত করবে কখনও বাংলায় কখনও বা রাষ্ট্রভাষায়। 'বাস্টার্ড, শালা বাঞ্চত কিংবা তোর বাপ বুড্ডা, তেরী মা বুডধি' ইত্যাদির ঝড় বইতে থাকবে তখন।

প্রায় কারুর সঙ্গেই বনিবনা নেই তার। অফিসে একদল যেমন তাকে সন্তর্পণে এড়িয়ে চলে অন্যদল তেমনি তার আশেপাশে ঘুরঘুর করে তাকে জ্বালায় ক্রমাগত। তাকে উত্যক্ত করে, তাকে তাতিয়ে দিয়ে তার মুখ থেকে অনর্গল স্রোতের মত উদগলিত খিস্তি খেউর শুনতে ভাল লাগে এদের। আপাত স্বভাবিক এই সব লোকেদের চরিত্রে মর্ষকাম-ধর্ষকাম এই বিচিত্র সহাবস্থান প্রকৃতিস্থ বলবে কিনা।

অপরপক্ষে কিছুদিনের মধ্যে রামনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল তার। ছোটখাট গানের অনুষ্ঠানে কেউ কেউ ডেকে নিয়ে যায় তাকে। অপূর্ব কণ্ঠস্বর রামনের। ভজন, গজল এমনকি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পর্যন্ত অনায়াস দক্ষতায় পরিবেশন করে সে। শুনে মুগ্ধ হয়ে যায় অবন্তী। ভেবে পায়না এরকম লোকের গলায় কি করে সুরসরস্বতী বিরাজ করে পূর্ণ মহিমায়। এসব দেখেশুনে স্বভাবিক অস্বভাবিক কিংবা সুস্থ বা পাগল মানুষের সীমারেখা তার বুদ্ধির বাইরে চলে যায় কেবলি।

একদিন একটি জিনিষ চোখে পড়ল তার। যথারীতি নিজের কাজ সারছি সে। মাসের শেষ। বেশ অনেকগুলো ভাউচার পড়ে তার টেবিলে। অ্যাপ্রেনটি আর অফিসার ট্রেনিদের স্টাইপেণ্ড, অফিসারদের কার অ্যালউন্স ইত্যা অনেকগুলো কাজ নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল সে। গতকাল এসে কেউ কেউ তাড় দিয়ে গেছে সেগুলির জন্য। দ্রুত হাতে সেগুলি সমাধারই চেষ্টা করছিল। হঠা তার কানে আসে কু কু আওয়াজ।

অন্যদিনের মত সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিলনা সেই আওয়াজ। গলাটা ম হচ্ছিল রামনেরই বলে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে তার অনুমান মিথ্যা নয়। মিটমি করে হাসছে রামন আর অন্যদের টেবিলের সামনে এসে আস্তে করে কু ক আওয়াজ তুলছে।

একটু পরেই তাকে অনুসরণ করে শুরু হয়ে গেল অনেকের কণ্ঠে সম্মিলি কোকিল ডাক। পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হলো রামনের মেজাজ তার ভাবভঙ্গী। এতক্ষণ আপন মনে মিটমিট করে হাসছিল সে। এখন তার সে হাসি মিলিয়ে গেল। মুখচোখে ফুটে উঠল ভয়াবহ হিংস্রতা। দাঁত কিড়মিড় ক গালাগালি দিতে শুরু করল রামন। অশ্লীল গালিগালাজের স্রোত বইতে লাগ একভাবে।

অভিনব এই দৃশ্যে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পাচ্ছিলনা অবন্তী। সাধ করে কেউ এভাবে উত্যক্ত হতে চায় তা এ দৃশ্য না দেখলে ধারণা করতে পারতন সে। লাঞ্চের সময় শ্যামলীর সঙ্গে আলোচনা করছিল সে ঘটনাটা নিয়ে। অবন্তী বিস্ময় দেখে ছোট্ট করে হাসল সে।

---অভ্যাস। বুঝলি তো অভ্যাস হয়ে গেছে ওটা রামনের। ছেলেরা ন খ্যাপালে পেটের ভাত হজম হয়না ওর। যেদিন সকলে চুপচাপ থাকে সেদি ওর যেন অস্বস্তি বোধ হয়। ছেলেদের টেবিলের সামনে গিয়ে ঘুরঘুর করবে বিড়বিড় করবে কিংবা কু কু আওয়াজ তুলবে। ছেলেরা খ্যাপালেই যেন ও স্বস্তি। নাহলে লাগামছাড়া ভাষায় ওদের গালিগালাজ করবে কি করে? সে ওজুহাত খুঁজতেই তো ওভাবে ঘুরঘুর করে ও। প্রথম প্রথম আমিও অবা হতাম কম না। এখন সয়ে গেছে।

কয়েকদিন মধ্যে আরও কিছু তথ্য জানতে পারল সে রামনের সম্পর্কে একদিন তার কাছে এসে হাসি হাসি মুখ করে অনুযোগ করে রামন।

—দেখেছেন মিস মিত্র ছেলেদের কাণ্ডটা?

অবন্তী কিছু জানতনা। রামনের প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

আগের মতই সহাস্য ভঙ্গীতে রহস্যমোচন করে রামন নিজেই।

—বাথরুমের দরজার কাছে দেয়ালে আমার ফটোর সঙ্গে কিরণ আসমানির ছবিটা কেমন সেঁটে দিয়েছে ওরা দেখেননি? কোন মানে হয়?

মুখে অনুযোগ করলে কি হবে? অবন্তী বুঝতে পারছিল মনে মনে রীতিমত খুশি হয়েছে রামন। প্রখ্যাত অভিনেত্রীর সঙ্গে ওর নাম জুড়তে দেখে মানসিক তৃপ্তি পেয়েছে ও। কিন্তু সবচেয়ে অবাক লাগল ওব বিশ্বজিতের মুখে একটা কথা শুনে। বিশ্বজিত বলল রামন নাকি নিয়মিত ভাবে রাত্রিবেলা ভিক্টোরিয়া কিংবা কার্জন পার্কে গিয়ে উপস্থিত হয়। মেয়ে পুরুষের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ ভঙ্গী দেখবার জন্য। অবন্তীর বিশ্বাস হচ্ছিলনা। কিন্তু আরও কয়েক জনের মুখে একই কথা শুনে আর অবিশ্বাস করতে পারলনা ও। শ্যামলীও বলল অনুরূপ কথা। একদিন নাকি ও নিজের কানে শুনেছে রামন বলছিল 'আজকাল যা সব কাণ্ড চলে কল্পনাই করা যায়না। মাঝবয়সী মহিলার সঙ্গে অল্পবয়স্ক ছোকরাকেও বিশ্রী ভঙ্গীতে দেখা যায়। কালে কালে কি যে হোল!

অবন্তীকে কিন্তু অপছন্দ করেনা রামন। মাঝে মঝেই তার সামনে এসে এটা সেটা বলে। কিন্তু গায়ের দুর্গন্ধে টিকতে পারেনা অবন্তী। অসম্ভব নোংরা জামা কাপড় পরে থাকে রামন। মাসে কয়দিন স্নান করে বলা শক্ত।

অবন্তী সেকশানে আসার পর তার কাছে মাঝে মাঝেই মনের দুঃখ ব্যক্ত করত।

—বুঝলেন মিস মিত্র সব শালা অফিসার ওয়ার্থলেস। কোই কাম কা নেহি। আমার সঙ্গে মহাদেবটা অমন শয়তানী করল। আমি বলতে গেলাম। তা কানেই নিলনা। আসলে কনট্রোল করার ক্ষমতা নেই ওদের।

অবন্তী কিছু বলেনা। ঘটনাটা তার জানা। মহাদেব বলে একজন পিওন মাঝে মাঝেই জ্বালায় রামনকে। সেদিন রামন রেগে গিয়ে ওর গায়ে থুতু দিয়েছিল। পরে নালিশ করতে চলে গিয়েছিল জনৈক অফিসারের কাছে। রামনও কম অন্যায় করেনি। কাজেই অফিসার কোন ফয়সলা করতে পারেননি। কিন্তু তবু সে তার মতামত ব্যক্ত করেনি ভয়ে। রামনকে বিশ্বাস নেই। রেগে গিয়ে যা তা বলে বসতে পারে।

অবন্তী ভাবে এ কোথায় এসে পড়েছে সে কর্মসূত্রে? চারপাশে এতসব পাগলের সংস্পর্শে এসে সে নিজেও পাগল হয়ে যাবে না তো?

আজকাল মাঝে মাঝেই তার মনে পড়ে অনেকদিন আগে দেখা একটি সিনেমার ঘটনা। নায়ককে পাগল মনে করে পাগলখানায় পাঠিয়েছিল বাড়ির লোকেরা। কিন্তু আসলে পাগল ছিলনা সে। পরিবারের মধ্যে, সমাজের মধ্যে আশেপাশে পরিচিতদের মধ্যে দুর্নীতি দেখে, মিথ্যাচার দেখে, নোংরামি দেখে সহ্য হোতনা তার। উদগ্র হয়ে উঠত তার প্রতিবাদরে শাণিত তলোয়ার। তার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে সন্দেহ হতো সেই সব লোকেদের মনে। তারা সারা জীবন ধরে মিথ্যা কিংবা দুর্নীতির বেসাতি করে এসেছে। তাদের কাছে কি করে স্বভাবিক ঠেকবে নায়কের রাগ, বিরক্তি কিংবা ক্রোধের উগ্র প্রবল প্রকাশ? তারা ভাবল ওসব তার মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ। সংশোধনের জন্য তাকে পাঠানো হোল উন্মাদাশ্রমে।

স্বভাবিক, সুস্থ একটি মানুষকে পাগলদের সঙ্গে সহবাসের মূল্য দিতে হোল। সে নিজেও একদিন সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে গেল। সমাজ থেকে বহিস্কৃত হয়ে নারকীয় জীবনযাপনে বাধ্য হলো আদর্শবাদী সৎ বিবেকবান একটি মানুষ। অবন্তীর ভয় হতো সেও এই সব পাগলদের ভীড়ে থাকতে থাকতে পাগল হয়ে যাবে না তো?

তার বাঁ পাশে দুই তিনটি টেবিলের পরে বসত রজব আলী নামে এক মুসলমান ভদ্রলোক। মুরশিদাবাদের নবাব পরিবারে জন্ম তার। সেখানেই থাকে তার বিবি। ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে দার্জিলিং-এর কনভেন্টে।

রামনের মত রজব আলীও কাজকর্ম করেনা। সারদিন চুপচাপ বসে থাকে আপন মনে। মাঝে মাঝে তার দিকে তাকিয়ে হাসে। দু'একটা কথা বলে। কাজ না করলে কি হবে? কথাবার্তা কিন্তু আদৌ পাগলের মত নয়। অবন্তীকে একমনে কাজ করতে দেখে তাকে নিরুৎসাহ করত রজব আলী।

—কি হবে এত কাজ করে মিস মিত্র? রেখে দিন রেখে দিন। আমি যে এত বছর ধরে কাজ করলাম তা লাভটা কি হোল? যেখানে পড়ে ছিলাম সেখানেই পড়ে রইলাম। অথচ তড়তড় করে ওপরে উঠে গেল আমার জুনিয়াররা।

শুনে কষ্ট হোত অবন্তীর। ভাবত ওপর থেকে দেখে মানুষের কতটুকুই বা বোঝা যায়? রজব আলীর প্রতি যদি অবিচার না করা হোত তাহলে হয়ত এভাবে অস্বভাবিক হয়ে যেতনা ও।

অন্যসব দিকে দিব্যি স্বভাবিক মানুষের মত আচরণ রজব আলীর। অফিসের অনেকের সম্পর্কেই তার মনোভাব তিক্ততাময়। অবন্তীর কাছে মাঝেমাঝেই

ব্যক্ত করত সে নিজের অনুভূতি। 'ওভারটাইম' নিয়ে যে দুর্নীতি চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করত।

---বুঝলেন মিস মিত্র এখানে দুটো দল আছে। একদল যারা মুখ বুঁজে কলুর বলদের মত নিঃশব্দে ঘানি টেনে যাচ্ছে প্রতিদানের আশা না রেখেই। আরেকদল কাজের সময় কাজ করবেনা। কাজ ফেলে রাখবে ইচ্ছা করে। 'ওভারটাইম' আদায়ের জন্য।

ক্যাশের মন্দিরাদি কিংবা রঞ্জিত বোসের কাণ্ডকারখানা নিয়েও কথা বলত।

---দেখছেননা কয়েকটা লোক কিরকম খেয়ালখুশি মত কন্ট্রোল করছে 'ওভারটাইম' ব্যাপারটা। নিজেদের পছন্দসই দু'চারজনকে ওভারটাইমের সুযোগ দিচ্ছে তারা। বছরের পর বছর সেই কয়েক জনই এক নাগাড়ে ওভারটাইম পেয়ে যাচ্ছে। অন্যাদের বুড়ো আঙুল চুষতে হচ্ছে এদের জন্যই।

কখনও বা বিশেষ কোন কর্মীর নামোল্লেখ করে অদ্ভুত অদ্ভুত সব মন্তব্য করত।

---বুঝলেন তো ওর সল্টলেকে জমি কেনা আছে। এখন শুনছি বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেজন্য কর্তৃপক্ষের গোপন নির্দেশ আছে যতদূর সম্ভব ওকে ওভারটাইমের সবটুকু সুযোগ দেওয়া। তা না হলে এত ঘন্টা ওভারটাইম পেতে পারে কখনও অন্যদের বঞ্চিত করে? ওরা স্বামী স্ত্রী মিলে দুহাতে টাকা লুটছে আমাদের তেল কোম্পানি থেকে। একজন ক্যাশ থেকে আরেকজন পে সেল থেকে। ওভারটাইমের এরকম ফায়দা ওঠাতে আর কাউকে দেখিনি বাপের জন্মে।

অবন্তীকেও হিতোপদেশ দিতে ছাড়তনা।

---কি বোকার মত কাজ করে যাচ্ছেন? কোন লাভ নেই। পেয়ে বসবে পরে। ওভারটাইমের বেলায় দেখবেন ফক্কা। তখন বেছে বেছে পেয়ারের লোকেদেরই দেবে সেটা। আপনাদের বসে বসে বুড়ো আঙ্গুল চুষতে হবে খালি।

যে লোকটা কাজকর্ম করেনা, সারাদিন চুপচাপ থম ধরে বসে থাকে নিজের টেবিলে তার মুখে এরকম সব হিতোপদেশ আর জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা শুনে বিস্ময়ের সীমা থাকতানা অবন্তীর। যে লোকটা এতখানি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন তার মধ্যে কেন এই পাগলামি? শ্যামলীও তার সঙ্গে একমত হতো।

---ঠিক বলেছিস। আমারও সেকথাই মনে হয়। অবিচার আর অন্যায়ের যূপকাষ্ঠে কিভাবে বলি হয়ে যায় মানুষের সুস্থতা, তার স্বভাবিকতা আর বিচারবোধ তা এখানে না এলে বুঝতে পারতামনা। কাউকে কাউকে দেখে মনে

হয় তাদের যেন ষড়যন্ত্র করে পাগল করে দেওয়া হয়েছে। রজব আলীকেই দেখনা। কোনদিন ওকে কাজ দিতে দেখেছিস? কাজ না দিয়ে অলস করে দিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় কাজকর্ম করলে কিছুটা স্বভাবিক থাকত ও।

অবন্তী বিস্ময় প্রকাশ করে।

---কিন্তু আমি তো শুনেছি কাজ দিলেও নাকি কাজ করতনা। বলা যায়না হয়ত ফাইল টাইল ছিঁড়ে একাকার করবে।

শ্যামলী বলে--'কি জানি? কিছুই বুঝিনা এখানকার ব্যাপার স্যাপার। তবে বিজিতদার কাছে শুনেছি আগে নাকি ভালই কাজকর্ম করত। কিন্তু ক্রমাগত অন্যায় হতে থাকলে মানুষের মনের ওপর চাপ পড়েনা? তারই ফল ওর এই অস্বাভাবিকতা। তাছাড়া এখানে একটা হোস্টেলে পড়ে থাকে। স্ত্রীপুত্র কেউ কাছে নেই। এরকম নিঃসঙ্গ জীবনযাপনেরও তো কতগুলো অসুবিধা আছে। অফিসেও বন্ধুস্থানীয় কেউ নেই। একমাত্র তোর আর আমার সঙ্গেই যা দু'চারটে কথা বলে। বেশির ভাগ সময়েই তো মুখ বুজে পড়ে থাকে। সহজভাবে যদি কয়েক জনের সঙ্গে কথাটথা বলত তাহলেও সেটা ভাল হতো ওর পক্ষে।

অবন্তী বলে--'তা ঠিক। আমাদের সেকশানের লোকজনও একটু অদ্ভুত। রামন কিংবা রজব আলীর মত লোকেরা আর দশজনের মত স্বভাবিক না। ওদের সঙ্গে একটু বিশেষভাবেই মেশা উচিত। কিন্তু অল্পবয়সী ছেলেগুলোও দেখছিস কিরম নিষ্ঠুর? ওদের যেন একঘরে করে রেখেছে।

শ্যামলী রসিকতা করে।

---তোকে কিন্তু দুজনেই খুব পছন্দ করে। রজব আলীর কথা নয় বাদ দিলাম। ও তো কারুর সঙ্গেই ঝামেলা করেনা। কিন্তু রামনের মত ক্ষ্যাপা লোকও তো দেখি হেসে হেসে কথা বলে তোর সঙ্গে। ব্যাপারটা কি বলত? এইসব কারণেই মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র! সুন্দরী মেয়েদের জয়জয়কার এরকম অবধারিত।

অন্যমনস্ক হয়ে অবন্তী কথাটা শুনে। কয়েকদিন আগে লাঞ্চের সময় পট্টনায়ক আবার এসেছিল তার কাছে। সেকশানে লোকজন বিশেষ ছিলনা।

গাঢ় গলায় মিনতির সুরে অনুযোগ করেছিল পট্টনায়ক।

---আপনি আমার সঙ্গে এভাবে অসহযোগিতা করছেন কেন মিস মিত্র?

বুঝতে পেরেও পাল্টা প্রশ্ন করেছিল অবন্তী।

---একথা বলছেন কেন?

কয়েক মিনিট স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল পট্টনায়ক। পরে থেমে থেমে ব্যক্ত করেছিল নিজের মনোভাব।

---মনে হয় সারাক্ষণ আমার চোখের সামনে বসে থাকুন আপনি। আপনার সুন্দর মুখ, সুন্দর শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকি। প্রাণ ভরে পান করি আপনার রূপসুধা। কিন্তু আপনি হঠাৎ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন কেন? একবারও আমার কাছে আসছেননা। আমার সঙ্গে কথা বলতেও কার্পণ্য করছেন। ভয় পাচ্ছি আমার কোন ভাগীদার জুটল না তো?

খট করে বাজল কথাটা অবন্তীর কানে। সে কি কোন লোভনীয় পণ্যসামগ্রী যে তার ভাগ পাবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে পুরুষের মধ্যে? কিন্তু তার উষ্মা জল হয়ে গেল পট্টনায়কের স্তুতি শুনে।

---আপনি এত সুন্দর হলেন কেন? কেন আর দশজনের থেকে আলাদা হলেন? সেজন্যই তো কেবলি চোখে হারাই আপনাকে।

কোন সুদর্শন যুবকের মুখে এরকম স্তুতি এর আগে শোনেনি সে এভাবে। প্রার্থীর মত নম্র ভঙ্গীতে গলার স্বরে আর্তি মিশিয়ে মিনতি করেছিল তাকে পট্টনায়ক।

---আজ অফিস ছুটির পর চলে আসুন মেট্রোর নীচে। ভাল একটা ছবি আছে। একসঙ্গে দেখব।

শ্যামলীর মুখে পট্টনায়কের সম্পর্কে যেসব কথা শুনেছিল সে তার রেশ কিছুটা ফিকে হয়ে এলেও একেবারে মিলিয়ে যায়নি মন থেকে। চর্মচক্ষে এমন কিছু চোখে পড়েনি যাতে সেসব অপবাদ অভ্রান্ত বলে মনে হয়। বরং তৃষিত চাতকের মত তার উন্মুখ ব্যগ্র দৃষ্টি সতত তার দিকে নিবদ্ধ থাকতেই দেখেছে।

সন্ধ্যা সাহানীর সঙ্গে দু'একবার কথা বলতেও দেখেছে সে পট্টনায়ককে। বিশেষ কৌতূহলে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে দেখেছে তাদের। অত্যন্ত মামুলি আর সহজ ঠেকেছে তাদের সম্পর্ক। দোষণীয় কোন ভাবভঙ্গী বা নৈকট্য চোখে পড়েনি।

অবশ্য সন্ধ্যা এখন বিবাহিতা। বিবাহিতা নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ স্বভাবিক কারণেই ক্ষীণ হয়ে আসে। তবু তার কোন তলানি কি অবশিষ্ট থাকবেনা? শেষ পর্যন্ত সাত পাঁচ ভেবে ঐ প্রসঙ্গ সে নিজের মনের মধ্যেই চাপা দিয়েছিল। ঠিক করেছিল শ্যামলী না তুললে নিজের থেকে ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কথা বলবেনা।

পট্টনায়কের সঙ্গে ইচ্ছা করেই কথাটথা বলেনি সে এতদিন। কিন্তু উপযাচক

হয়ে পট্টনায়ক তার কাছে মিনতি জানানোর পর ভেতরে ভেতরে দুর্বল বোধ করছিল যেন।

এতদিন সুরক্ষিত ছিল তার জীবনযাত্রা। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব কম ছিলনা মনে। কিন্তু সেই সৌন্দর্যের নেশা জাগিয়ে অপরকে মাতাল করে তোলার তীব্র সুখ অজ্ঞাত ছিল তার। পট্টনায়ক শুধু নিজেই নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকতে চাইলনা। অবন্তীর মধ্যেও অন্য এক নেশা জাগিয়ে তুলতে চাইল।

সেই নেশার মাতলামি কিছুদিন বন্ধ ছিল। অফিসে এসে কাজে যোগ দেওয়ার পর পট্টনায়ককে দেখে তার কথা শুনে আবার যেন সে মাতাল হয়ে পড়েছিল সেই নেশায়। এই নেশা যে কত মারাত্মক তা সে নিজেও বুঝতে পারল যখন দেখল পট্টনায়ক এসে তার সঙ্গে কথা না বললে কিংবা তার সতৃষ্ণ মুগ্ধ দৃষ্টিপাত নিজের শরীরে অনুভব না করলে কেমন যেন ভোঁতা, বিস্বাদ লাগে সবকিছু মনে হয় তার সৌন্দর্য মিথ্যা, তার সৌন্দর্যের আকর্ষণ মিথ্যা।

সেদিনও সে মনে মনে প্রলুব্ধ হয়েছিল কম না। সিনেমা হলে পট্টনায়কের নিবিড় আতপ্ত সান্নিধ্যের রোমান্স কল্পনা করে মনে মনে দারুণ উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। মাঝখানে অনেকদিন বন্ধ ছিল অন্তরঙ্গ নিভৃত দেখাসাক্ষাৎ। অবন্তী বুঝতে পারছিল তার উপোসী মন এক রমণীয় সন্ধ্যার সম্ভাব্য সুখের জন্য কেমন লালায়িত হয়ে উঠেছে।

প্রায় রোজই শ্যামলীর সঙ্গে বাড়ি ফেরে সে। তবু যাহোক একটা অজুহাতের কথা ভেবেছিল। খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করার অভ্যাস নেই শ্যামলীর। যাহোক একটা কারণ দেখিয়ে আপাততঃ তাকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হবে।

কিন্তু তার সব রকম পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল আরেকটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। ছুটির ঠিক আগের মুহূর্তে ডেকে পাঠাল তাকে সুধাংশু বোস। প্রথমে কাজের কথা দিয়ে শুরু করেছিল সে। অবন্তী ভেবেছিল কতক্ষণ আর লাগবে? কিন্তু কিভাবে যেন অন্য প্রসঙ্গ চলে এল। কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল।

এমনিতে খুবই গম্ভীর স্বভাবের সুধাংশু বোস। অল্পবয়সী হলে কি হবে? সকলেই তাকে মান্য করে চলে তার এই স্বভাবের জন্য। কাজেকর্মে খুবই দক্ষ। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এই তরুণ অফিসার বয়সে অনেকের থেকেই তরুণ। তবে কর্মদক্ষতা আর গাম্ভীর্যের জন্য অনেকেই সমীহ করে চলে তাকে।

একমাত্র খুঁত হলো তার চেহারা। মাঝারি দৈর্ঘ্যের এই অফিসারটি ঈষৎ

স্থূলকায়। মুখচোখ কিংবা গায়ের রঙ কোনটাই চোখে পড়ার মত নয়। মেধা, বুদ্ধি বা প্রতিভার কোন প্রতিফলনই ধরা পড়েনা তার চেহারায়। মেয়েদের প্রতিও কোনদিনই তেমন মনোযোগী নয়। শ্যামলীর কাছে একাধিক প্রসঙ্গে প্রশংসা শুনেছিল বটে সে সুধাংশু বোসের। কিন্তু অসুন্দর চেহারার জন্য তাকে ভাল লাগতনা অবন্তীর। এক ধরণের বিরূপতাই বরং পোষণ করত সে।

সুধাংশু হয়ত বুঝত সেটা। পারতপক্ষে অবন্তীর কাছে ঘেঁষতনা সে। অবন্তীও অভ্যস্ত ছিল তাতে। সেদিন সন্ধ্যায় তার অন্যথা দেখে মনে মনে কম বিস্মিত হয়নি। বিশেষ করে তার অবাক লাগছিল সুধাংশুর শিথিল ঢিলেঢালা ভঙ্গীটি দেখে। অফিসের পোষাকটি যেন গা থেকে খসিয়ে দিয়েছিল সেদিন। নিজেকে প্রকট করেছিল ঘরোয়া অন্তরঙ্গ স্বরূপে। অবন্তীর বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করেছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। প্রথমে ইতঃস্ততঃ করেছিল অবন্তী। সবকিছু বলতে চায়নি বিশদ ভাবে। পাগল দিদির কথা বাইরের লোককে বলতে ইচ্ছা হয়নি। কিন্তু সুধাংশুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল সবকিছু। কোন রকম কৌশল অবলম্বন না করেই বাধ্য করল সে অবন্তীকে তার পারিবারিক পটভূমিকাটি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে।

অবন্তী সতর্ক হতে চেয়েছিল। কিন্তু সুধাংশু এমন দক্ষ কারিগরের মত তার সওয়াল সাজাচ্ছিল যে অবন্তীও কখন যেন নিজেও আরম্ভ করে দিয়েছে তথ্যের মধ্যে ফাঁকটুকু ভরিয়ে দিতে।

সুধাংশু কথা কম বলে। কিন্তু যখন বলে তখন এমন সুন্দর করে বলে যে সময়ের প্রবহমানতা চোখেই পড়েনা। যতক্ষণ অবন্তীর সঙ্গে কথা বলছিল ততক্ষণ একেবারেই খেয়াল ছিলনা তার সময়ের কথা। যখন খেয়াল হলো তখন খানিকটা সময় গড়িয়ে গেছে।

পট্টনায়ক তাকে একটু আগে বেরিয়ে যেতে বলেছিল অফিস থেকে। মেট্রোর নীচে দাঁড়িয়ে থাকার কথা তার। কিন্তু সে যে সময় দিয়েছিল তা পার হয়ে গেছে কখন। রাগে দুঃখে হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছিল তার।

অনেকদিন পর একটি সুন্দর সন্ধ্যা কাটানোর সুযোগ এসেছিল। কিন্তু হোৎকা চেহারার কুদর্শন এই লোকটার জন্য নষ্ট হয়ে গেল সে সুযোগ। রাগে সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছিল তার। মনে হচ্ছিল এই লোকটাই যেন ইচ্ছা করে বানচাল করে দিল তাদের সুন্দর স্বপ্নের মত পরিকল্পনা। এমন কিছু জরুরী দরকার পড়েনি যে বেছে বেছে এই ভরা বিকেলে অবন্তীকে ডাকতে হোল। ভেতরের উষ্মা ব্যক্ত হোল তার কথায়।

---ইস অনেক দেরি হয়ে গেল! আমার একটা জরুরী কাজ ছিল।

---খুব জরুরী? তাহলে তো অন্যায় হয়ে গেল।

কণ্ঠস্বরে কিন্তু অপরাধীর দীনতা ছিলনা। অবন্তীর কানে ঠেকল পরিহাসের সুরটুকু। সন্দেহ দৃঢ় হোলো তার। ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে দিয়েছে সুধাংশু বোস। হয়ত বা পট্টনায়কের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানে লোকটা। সে জন্যই কথায় কথায় দেরি করে যেতে দিলনা তাকে। পদমর্যাদায় তার অনেক ওপরে না হলে বেশ দু' কথা শুনিয়ে দিত অবন্তী। কিন্তু তার নতুন চাকরি। যখন তখন মাথা গরম করলে লাভ নেই কোন।

সেই ঘটনার পর অবন্তী আশা করেছিল পট্টনায়ক তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করবে কেন সে উপস্থিত হয়নি মেট্রোর নীচে? কৈফিয়ত চাইবে গরহাজির থাকার জন্য। কিন্তু পট্টনায়ক আর সেমুখোই হোলনা।

এর মধ্যে কয়েকবার তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে অবন্তীর। অবন্তী চেষ্টা করেছিল একান্তে কথা বলার। কিন্তু অপর পক্ষের সাড়া না পাওয়াতে সে চেষ্টা সফল হলোনা। পট্টনায়কের এই রাগের সঙ্গে সে পরিচিত। এর আগেও ঘটেছে এরকম ঘটনা।

সে ভেবেছিল কারণটা জানাবে। তার যে সত্যিই কোন দোষ ছিলনা সেটা বোঝাবে পট্টনায়ককে। কিন্তু সেই সুযোগ দিতে অনিচ্ছুক পট্টনায়ক। একদিকে সুধাংশু বোসের ওপর দুর্জয় রাগ আর অপর দিকে পট্টনায়কের আচরণের জন্য দুর্বার অভিমান নিয়ে দুর্বহ জীবন যাপন করছে সে কয়েকদিন ধরে।

এর মধ্যে সুধাংশু এসে দু' একটা প্রয়োজনীয় কথা বলেছে। দায়সারা ভাবে জবাব দিয়েছে অবন্তী। তার মনে হয়েছে তার দিকে এখন একটু বেশি মনোযোগ দিচ্ছে সুধাংশু। পট্টনায়কের চোখ এড়ায়নি সেটা। সেই কারণেই তার কাছে ঘেঁষছেনা এখন।

কিন্তু অবন্তী ভাবে লোকটার স্পর্দ্ধা তো কম নয়? কি চায় তার কাছে ও? পট্টনায়ক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল ভাগীদার জুটছে বলে। অবন্তী ভাবল তবে কি সুধাংশুর মনোভাব ও জানতে পেরেছিল কোন ভাবে?

কিন্তু নিজের কাছেই হাস্যকর মনে হোল এই চিন্তা। প্রথমতঃ সুধাংশু এমন কিছু করেনি বা বলেনি যাতে মনে করা যেতে পারে অবন্তীর প্রতি দুর্বলতা পোষণ করছে সে। দ্বিতীয়তঃ পট্টনায়ক কিই বা দেখেছে কিংবা শুনেছে যাতে তার এরকম ধারণা হবে?

শ্যামলীর মুখে 'সুন্দরী মেয়ের জয়জয়কার সর্বত্র' কথাটা শুনে তার মনে হোল কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। সৌন্দর্যই সব কিছু নয়। ভাগ্য প্রসন্ন না হলে সুন্দরী মেয়েও জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়।

শ্যামলী তার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করল। একটুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে অনুধাবন করার চেষ্টা করল অবন্তীর এই প্রতিক্রিয়া কেন? কিন্তু কিছুই অনুমান করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মনের উদ্বেগ ব্যক্ত করে ফেলল।

---কি হয়েছে অবন্তী? তোকে এমন আনমনা দেখাচ্ছে কেন? সামলে নিল অবন্তী। তার দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে ফেলে সহজ ভঙ্গীতে জবাব দিল সেই প্রশ্নের।

---কিছু হয়নি। শরীরটা ভাল লাগছেনা।

ছয়

সকাল বেলায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে অবন্তীই দরজা খুলে দিল। সামনে যে ভদ্রলোককে দেখতে পেল তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। সবিস্ময়ে তাকে চেয়ে থাকতে দেখে অল্প হাসে ভদ্রলোক।

---আমাকে চিনবেননা। আমি একটা সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি। বাড়িতে বড় কে আছেন? তার সঙ্গে কথা বলব।

ভদ্রলোককে ভেতরে আসতে বলে অবন্তী ভাবতে থাকে কার জন্য সম্বন্ধ নিয়ে এলেন উনি? বিবাহযোগ্য সকলেই। দিদির কথা অবশ্য ধর্তব্য নয়। তাহলে নিশ্চয়ই দাদার জন্য এসেছেন। সাধারণত পাত্রীপক্ষের কাছে উপযাচক হয়ে আসেনা পাত্রপক্ষের কেউ। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কন্যাপক্ষই উপযাচক হয়ে উপস্থিত হয় পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে। কালো কুৎসিত সাধারণ গুণপনার পাত্রের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। অরণীও একদিন সেরকম ইঙ্গিত দিয়েছিল।

এর অন্যথা যে হয়নি তা নয়। অবন্তীর জন্য এক ভদ্রলোক তার ভাগনের সঙ্গে সম্বন্ধের প্রস্তাব নিয়ে উপযাচক হয়ে এসেছিলেন। শ্যামলীর এক পিসতুতো দিদির জন্যও সে শুনেছে পাত্রপক্ষ উপযাচক হয়ে চেয়েছিল মেয়েকে। তবে এসব ঘটনা ব্যতিক্রমের মধ্যেই পড়ে।

বাইরের ঘরের তক্তপোষে ভদ্রলোককে বসিয়ে চলে গেল অবন্তী মাকে ডাকতে। রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন যোগমায়া দেবী। ভাতের ফেন গালতে আরম্ভ করেছিলেন সবে।

অবন্তী এসে সামনে দাঁড়াল।

---মা শিগগির এস। এক ভদ্রলোক সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন।

ফেন গালতে গালতেই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন যোগমায়া দেবী।

---এই সাতসকালে কে এল আবার? তোদের অফিস আছে। ইন্দও বাড়ি নেই। রণতো এখনও ঘুমোচ্ছে। কি মুশকিল বল্ তো? অবন্তী বিরক্ত হোল।

---তা আমি কি করব? আমি তো আর কথা বলতে পারিনা? আর ভদ্রলোক বললেন বাড়িতে বড় কে আছেন?

তাড়াতাড়ি ফেন গেলে কেটলী বসিয়ে দিলেন যোগমায়া দেবী।

---আমি কাপড়টা ছেড়ে নিই, জলটা ফুটুক। চা করে দিতে হবে। দেখি রণকে উঠিয়ে দোকানে পাঠাতে পারি কিনা? বাড়িতে একটা বিস্কুট পর্যন্ত নেই।

অরণীকে ডাকাডাকি করে উঠিয়ে মিষ্টি আনতে পাঠলেন যোগমায়া দেবী। নিজে একটা ভদ্রগোছেব শাড়ি পরে চলে আসলেন বাইরের ঘরে। দরজার সামনে আসামাত্র ভদ্রলোক উঠে নমস্কার জানান। প্রতিনমস্কার করেন যোগমায়া দেবী। দুজনে বসে পড়ার পর সরাসরি তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন ভদ্রলোক।

---অরিন্দম মিত্র তো আপনার ছেলে? আমার একটি বিবাহযোগ্যা ভাগনী আছে। তার জন্যই এসেছি আমি।

---হ্যাঁ আমার বড় ছেলে। তবে ওকে না জিজ্ঞাসা করে তো কিছু করতে পারবনা! ও এখন বাড়ি নেই।

---আপনি ছেলের বিয়ে দেবেন তো এখন? পছন্দ অপছন্দের কথা পরে।

---তাতে অসাধ থাকবে কেন? ওদের বাবা বর্তমান থাকলে আমাকে কিছুই ভাবতে হোতনা। এখন ওঁর অবর্তমানে আমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

---সে তো নিশ্চয়ই। তবে মেয়ে দেখতে শুনতে খারাপ না। বংশ ভাল। বি. এ. পাশ। গান জানে। গানের ডিপ্লোমা আছে। আমাদের কাছেই মানুষ। ওর ছোটবেলায় মা মারা গেছে। জামাইবাবু বাইরে থাকেন। কানপুরে। অবসর নিয়ে এখন ওখানে বাড়ি করে আছেন। ভাগনেটি থাকে তার বাবার কাছেই। বোনের থেকে সাত বছরের বড়। একটা ব্রিটিশ ফার্মে ভাল চাকরি করে।

নীরবে চুপ করে সবকিছু শোনেন যোগমায়া দেবী। মোটামুটি ভালই মনে হচ্ছে সবকিছু। তবে চেহারাটা কেমন দেখতে হবে। তার থেকেও বড় জিনিষ মেয়ের স্বভাবচরিত্র।

অরিন্দম তার প্রথম সন্তান। বুক জুড়োনো ছেলে। বাধ্য, বিনীত, কর্তব্যপরায়ণ। কোনদিন ওকে নিয়ে ভাবতে হয়নি যোগমায়া দেবীকে। ও যেন

পরিণত বুদ্ধি নিয়েই জন্মেছে। বাড়ির বড় ছেলে হবে বলেই বোধহয় বিধাতা ওকে এভাবে তৈরি করে পাঠিয়েছেন।

অল্প বয়স থেকে সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়েছে তার এই ছেলে। তবু কোনদিন মুখ ফুটে তার অসন্তোষ ব্যক্ত করেনি। ছোটবেলাতেও সাধ আহ্লাদ বলতে তেমন কিছু দেখা যায়নি ওর।

আজকাল মাঝেমাঝেই এই ছেলের জন্য কষ্ট হয় যোগমায়া দেবীর। অল্প বয়সেই কেমন বুড়িয়ে যাচ্ছে। সারাদিন কাজ আর কাজ। সাত সকালে বেরিয়ে যায়। এখানে সেখানে যেতে হয়। নানা রকম কাজের ধান্দায়। বাড়ি ফেরে রাত করে। মাথার চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে। মুখচোখেও নেই তেমন তারুণ্যের জৌলুশ।

যোগমায়া দেবী নিজেও ভেবেছেন আর দেরি নয়। শিগগিরই বিয়ে দেবেন ছেলের। ভাল সুন্দর শ্রীমন্ত বৌ আসবে তার সংসারে। তার ছেলে সুখী হবে। আজ যদি উপযাচক হয়ে কেউ তার ছেলের জন্য ভাল পাত্রী আনে তাহলে তার তো খারাপ লাগার কথা না।

লোকে মেয়ের বিয়ে আগে দিতে চায়। কিন্তু তিনি চান তার আগে তার বড় ছেলের বিয়ে হোক। বিন্তী অনেক ছোট। আর তার বায়নাক্কাও কম নেই। পছন্দ অপছন্দ বলে কথা আছে। ঝট করে তার বিয়ে দেওয়া যাবেনা।

ওর বিয়ে দিয়ে ইন্দর বিয়ে দিতে গেলে বুড়িয়ে যাবে হয়ত ইন্দ। চিরকালের বাধ্য ছেলে তার ইন্দ। তিনি যদি মেয়ে পছন্দ করেন না করবেনা সে। মেনে নেবে মায়ের পছন্দ। কিন্তু তিনি তাবলে যেমন তেমন মেয়েকে ছেলের ঘাড়ে চাপাতে পারেননা?

বউ এসে তার সেবা না করুক। তিনি কারুর সেবার প্রত্যাশী নন। দুঃখে কষ্টে কেটে গেছে তার জীবনের অনেকটা সময়। বাকী জীবনটা নিয়ে আর ভাবেননা তিনি। তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছেলেমেয়েরা সুখী হোক। অরুর বিয়ের প্রশ্ন ওঠেনা। পাগল মেয়ের বিয়ে দিতেও চাননা তিনি। অবশ্য অরু আজকাল কেমন যেন বিয়ে-পাগলা হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে বউ সাজে। সাজগোজ করে। কপালে টিপ পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে।

পাড়ায় কোন বাড়িতে বিয়ের প্যাণ্ডেল দেখে চনমন করে খালি। অমন যে পাগল মেয়ে সেও কৌতূহল প্রকাশ করে। ‘কার বিয়ে মা?’ কিংবা পরক্ষণেই মাথায় ঘোমটা দিয়ে বলবে ‘আমার তো আজ বিয়ে। আমাকে ভাল করে সাজিয়ে দাও না মা।’

রণ স্বাধীনচেতা ছেলে। তিনি জানেন সে তার নিজের পছন্দমত বিয়ে করবে। তার মেলামেশার পরিধিও ছোট না। নিজের জন্য পাত্রী সে নিজেই খুঁজে নেবে। চিন্তা তার ইন্দ আর বিন্তীর জন্য।

ইন্দ বড় চাপা শান্ত স্বভাবের ছেলে। তার জন্য সত্যিকারের ভাল মেয়ে চান তিনি। তিনি চান বউ এসে তার ছেলের মুখে হাসি ফোটাক। ছেলেটা যেন হাসতেও ভুলে গেছে। সারাদিন খালি কাজ আর কর্তব্যের ঘোরের মধ্যে আছে।

বিন্তী অবশ্য একেবারে উল্টো স্বভাবের। ওর জন্য বড় চিন্তা হয় তার। দেখেশুনে না দিলে ঐ মেয়ের কপালে দুঃখ আছে। বিন্তী কেন যে এত মুখরা হোল বুঝতে পারেননা। কাউকেই যেন মান্যগণ্য করতে চায়না। ছোটবেলায় মার পক্ষ নিয়ে ঠাকুমার সঙ্গে ঝগড়া করত। অনেক বকেঝকেও ওর সেই স্বভাব পাল্টায়নি। এখনও রণর সঙ্গে লেগেই আছে ওর ঝগড়া।

ঠাণ্ডা, শান্ত স্বভাবের স্বামী না হলে ওর সঙ্গে মানিয়ে চলা মুশকিল হবে। চেহারা খারাপ হলেও চলবেনা বিন্তীর। চেহারার ওপর বড় ঝোঁক ঐ মেয়ের। ইন্দর কোন বায়নাক্কা নেই ঠিকই। তবু তিনি ওর জন্য দেখেশুনে নেবেন মেয়ে।

যোগমায়া দেবীকে চুপ করে থাকতে দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক।

---ফটো আমি সঙ্গে করেই এনেছি। আপনি দেখতে পারেন। ছেলেকেও দেখাতে পারেন। আপনারা মনস্থির করে জানালে পরে মেয়ে দেখানো যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা ফটো যোগমায়া দেবীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক। ফটোটা হাতে নিয়েও দেখেননা যোগমায়া দেবী। উঠে দাঁড়ান তিনি।

---আপনি একটু বসুন। আমি মেয়েকে ডাকি।

ভেতরে গিয়ে দেখেন এরমধ্যে চা তৈরি করে প্লেটে মিষ্টি সাজিয়ে আসছে অবন্তী। মায়ের হাতে ফটো দেখে আগ্রহ প্রকাশ করে সে।

---মেয়ের ফটো নাকি মা?

---হাঁ তুই চা খাবারটা দিয়ে আয়। পরে দেখবি।

অবন্তী চলে যেতে এক ঝলক ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। ছবিতে যতটুকু দেখা যাচ্ছে চেহারা সুন্দর না হলেও অসুন্দর নয়। বেশ সপ্রতিভ আধুনিকতার ছাপ আছে।

তবু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। মনে হোল আর একটু সুন্দর হলে ক্ষতি কি ছিল? তার কেন যেন মনে হচ্ছে এখানেই বিয়ে হবে তার ছেলের। ভবিতব্যই নিয়ে এসেছে ভদ্রলোককে তার বাড়ির দরজায়। ইন্দর এখানে বিয়ে হবে বলে।

তবে ঈশ্বরের যা বিধান তা হবেই। ছেলেমেয়েরা আছে। তারা দেখুক। তারা যদি হাঁ বলে তাহলেই হোল। তিনি আর চেহারা নিয়ে মাথা ঘামাবেননা। আর সুন্দর না হোক খারাপ তো আর দেখতে বলবেনা লোকে।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল কপালটা যেন একটু চ্যাপ্টা। দাঁতটা যেন একটু উঁচু। আর মুখের ডৌলটিও যেন তেমন সুন্দর না।

ছবিটা ইন্দর টেবিলে একটা বইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন। পরে বাথরুম থেকে রণকে বেরিয়ে আসতে দেখে বললেন---'তুই যা না। গিয়ে কথাটথা বল'।

পাত্তা দিলনা অরণী। গ্যাট হয়ে বিছানায় বসে হাই তুলল মৌরসী পাট্টা করে।

---আমি যাব কেন? তুমি থাকতে? আমার দ্বারা ওসব হবেনা।

আর পীড়াপীড়ি না করে আবার বাইরের ঘরে চলে এলেন যোগমায়া দেবী।

বিন্তীর সঙ্গে বেশ হেসে কথা বলছেন ভদ্রলোক। দরজার সামনে যোগমায়া দেবীকে দেখে বিগলিত হাসি হাসেন তিনি।

---আপনার মেয়েটি কথা বলে চমৎকার। ভারী সপ্রতিভ। রুমনির এখানে বিয়ে হলে তার কপাল ভাল বলতে হবে। শ্বশুর ঘর ভাল পাওয়াটা কম ভাগ্যের কথা নয়।

যোগমায়া দেবীর ভাল লাগলনা। কানে লাগল কথাগুলো। ভদ্রলেকের বিগলিত হাসি, তার কথাবার্তা সব কিছুর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার চাতুর্য। তোষামোদ করে বিনয় দেখিয়ে যোগমায়া দেবীকে গলিয়ে ভাগনীরা হিল্লে করতে চাইছেন যেন ভদ্রলোক।

এই ধরণের লোক সংসারে আরও অনেক দেখেছেন তিনি। কেমন একটা ভীতি আছে তার এদের সম্পর্কে। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনেক কিছুই বলতে পারে, অনেক কিছুই করতে পারে এরা। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি ধারণ করতেও পিছপা হয়না আবার।

ভদ্রলোকের উৎসাহ থামিয়ে দিলেন তিনি ছোট্ট একটি জবাব দিয়ে।

---সবই তো বিধিনির্বন্ধ। যা ভাগ্যে আছে তাই ঘটবে।

---তাতো নিশ্চয়। তাতো নিশ্চয়। আচ্ছা আজ আসি। আপনারা মনস্থির করে জানালে পরে আমি যোগাযোগ করে সব কিছু ঠিক করব। আমার বাড়ির ঠিকানা আর অফিসের টেলিফোন নং রেখে গেলাম।

রাত্রে ছেলের কাছে কথাটা তুললেন যোগমায়া দেবী। ফটোটা অবন্তী আর অরণীকে আগেই দেখিয়েছিলেন। দেখেনি কেবল ইন্দ। যথারীতি অবন্তীর পছন্দ হয়নি মেয়ের চেহারা। তাতে আশ্চর্য হননি যোগমায়া দেবী। মেয়ের বরাবরই একটু নাক উঁচু। তিনি আশ্চর্য হলেন অরণী ছাড়পত্র দিল বলে।

ফটোটা ভাল করে দেখে নিয়ে অরণী তার মতামত প্রকাশ করেছিল।

---খারাপ না। আমার তো ভালই লাগছে। দাদাকে দেখাও। দাদার পছন্দ হলে তবেই তো!

শুনে প্রথমে যেন বিশ্বাস হতে চাইছিলনা যোগমায়া দেবীর। রণও কম খুঁতখুঁতে নয়। মনে হয়েছিল ঠাট্টা করছে না তো রণ? কিন্তু রণর দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলেন ওর সত্যিসত্যিই অপছন্দ হয়নি।

বাকি ছিল শুধু ইন্দ। কিন্তু সে বাড়ি ফিরেছিল অনেক দেরি করে। তারপরও কাগজপত্র নিয়ে খুব ব্যস্ত রইল। ইচ্ছা করেই সেই প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে রাখলেন যোগমায়া দেবী তখনকার মত। রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে অরিন্দম আবার বসে পড়ল তার পড়ার টেবিলে কাগজপত্র নিয়ে। বইটার মধ্যে থেকে ফটোটা বার করে দেখালেন ছেলেকে যোগমায়া দেবী।

---দেখ তো ইন্দ পছন্দ হয় কিনা? তোর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে মেয়েটির মামা আমার কাছে এসেছিলেন আজ।

ফটোটা দেখলনা ইন্দ। বিরস মুখে আস্তে আস্তে জবাব দিল।

---আমার বিয়ে নিয়ে ভাবছ কেন মা? আগে বিন্তীর বিয়ে দাও। আমার এত তাড়াতাড়ি কি?

---তাড়াতাড়ি কি বলছিস ইন্দ? তোর বয়সী ছেলেরা বিয়ে করছেনা? এই পাড়াতেই তো কয় জনের বিয়ে হোল। তোর থেকে বয়সে ছোটও আছে তাদের মধ্যে। আর বিন্তী কি আমাদের পছন্দমত বিয়ে করবে ভাবছিস? ওর জন্য বসে থাকলে তোর বিয়ে দেখে কি যেতে পারব আমি?

ছেলে চুপ করে নতমুখে বসে আছে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন জোরে।

---আমার আর ভালো লাগেনা রে। কবে থেকে সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে চলেছি। এখন আমার মুক্তি দে তোরা। বউ আসুক। সে বুঝে নিক সব কিছু। আমি আমার মত পুজো আচ্চা নিয়ে একটু থাকতে পারি তাহলে। তুই ফটোটা দেখ। অপছন্দ হলে করতে হবেনা তোকে এখানে বিয়ে। তোর পছন্দ হলে তবেই কথা বলব।

ফটোর দিকে চেয়েও দেখলনা অরিন্দম। মায়ের শীর্ণ ক্লান্ত দুঃখপীড়িত মুখের দিকে তাকিয়ে তার বুকের মধ্যে কেমন ভারী হয়ে আসল। উদগত দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করে আস্তে আস্তে জবাব দিল মায়ের কথার।

—তোমার পছন্দই আমার পছন্দ মা। তুমি যদি চাও তাহলে কথা বল ওদের সঙ্গে। আমার কোন মতামত নেই এ ব্যাপারে।

একটু যেন নিরুৎসাহ হলেন যোগমায়া দেবী। তার ওপরে ছেলে একটা দায়িত্ব না চাপালেই পারত। তার নিজের খুব পছন্দ হয়নি মেয়ে। ইন্দর জন্য আর একটু সুন্দরী মেয়ে আশা করেছিলেন তিনি। তবু নিজের পছন্দ অপছন্দই বড় করে দেখতে চাননা।

অরিন্দমের ওপর রাগ হতে লাগল। এই ছেলেটা তার জন্মবুড়ো। আর দশটা ছেলেমেয়ের মত নয়। বিয়েটাও যেন কর্তব্যপালনের মত নীরস এক দায়িত্ববোধের ব্যাপার। কানা খোঁড়া যার সঙ্গেই দেওয়া হোক না কেন মায়ের অবাধ্য হবেনা ছেলে। তার মনে হোল একবার যদি মুখ ফুটে ইন্দ তার অপছন্দের কথা বলত তাহলে আর তিনি ইতঃস্ততঃ করতেননা। ওর জন্য আরও ভাল পাত্রীর সন্ধান করতেন।

তবু শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাইলেন।

—ফটোটা একবার দেখনা বাবা। এতো দু'চার দিনের কোন ব্যাপার নয়? সারা জীবনের ব্যাপার এটা।

মায়ের কথা রাখতেই যেন দ্রুত চোখে দেখে নিল অরিন্দম ফটোটা।

—ভালই তো। আমার কোন আপত্তি নেই।

আর কোন সংশয় রইলনা যোগমায়া দেবীর মনে। এ সবই ভবিতব্যের ইঙ্গিত। ইন্দর বিয়ে যে এখানেই হবে তা অবশ্যই পূর্বনির্দিষ্ট। তিনি অকারণে দুশ্চিন্তা করছেন। আর চেহারাই তো সব নয়? পরমা সুন্দরী বৌ এলেই কি সংসারে শান্তি আসে? তাছাড়া ঘরে আছে তার পাগল মেয়ে। সেকথা জেনে কয়জনে এগিয়ে আসবে উপযাচক হয়ে?

শুধু তার মনটা খুতখুঁত করছে মেয়েটির উঁচু দাঁতের জন্য। উঁচু দাঁত তার পছন্দ নয়। দাঁতউঁচু মেয়েদের সম্পর্কে ভাল কিছু শোনেনি কখনও। তার কেমন যেন সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে এ ব্যাপারে। কিন্তু ভেবে দেখলেন এসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক হবেনা। মেয়ের মামা বিভূতি দত্তের সঙ্গে কথা বলে পাত্রী দেখার দিন ঠিক করবেন।

অবন্তী কিন্তু ভাল লাগছিলনা। দাদার প্রতি তার বরাবরই খুব দুর্বলতা। মায়ের মত সেও চায় তার ভালমানুষ দাদাটি সুখী হয়। ভাল একটি বৌ আসে তাদের সংসারে। কিন্তু চেহারাটা সে তুচ্ছ মনে করেনা। তার ইচ্ছা ছিল বৌদিটি খুব সুন্দরী হয়। তারা দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে গেলে লোকে বলে ননদ বৌদির জুড়িটি তো ভারী সুন্দর! ভাগাভাগি করে তারা একজন আরেকজনের শাড়ী পড়বে, গয়না পরবে।

কিন্তু দাদার জন্য যে পাত্রীটি এসেছে তার চেহারা কুশ্রী না হলেও নিতান্তই সাদামাটা। এ বাড়িতে বড়ই বেমানান যেন। দিদি অরুন্ধতী কিংবা ছোড়দা অরণীর মত সুন্দর না হলেও দাদা অরিন্দমের চেহারা সাধারণ আর দশটা ছেলের থেকে ভালই। শুধুমাত্র অকালে বুড়িয়ে যাওয়ার জন্য চেহারাটা খোলেনা তার।

তবু অবন্তীর বিশ্বাস বিয়ের পর সুখী হলে ফিরে যাবে দাদার চেহারা। পুরনো জৌলুশ ফিরে আসবে আবার। দাদাকে অনেক ভাল দেখাবে।

মায়ের কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছিল সে। কিন্তু যোগমায়া দেবী থামিয়ে দিলেন তাকে।

মেয়ের কাছে সম্পূর্ণ অন্যসুরে কথা বললেন।

---চেহারা সুন্দর হলেই কি সুখ আসবে রে? আমার মত কপাল যেন কারুর না হয়। শ্বশুর শাশুড়ী কোনদিন সুনজরে দেখলেননা। স্বামীর কাছে অবশ্য অনাদর পাইনি। কিন্তু তাকেও তো হারালাম কপালের দোষে। আমার অমন সুন্দর শান্ত মেয়েটা পাগল হয়ে গেল। ইন্দর মুখে কবে থেকে হাসি দেখিনা। সুন্দর নিয়ে আর মাথা ঘামাসনা বিন্তী।

হঠাৎ অবন্তীর কানে লাগল কথাটা ঠক করে। সৌন্দর্যের প্রতি তার দুর্বলতা শিশুকাল থেকেই। পট্টনায়কের আগে কোন ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি ঠিকই। কিন্তু রাস্তাঘাটে সুন্দর চেহারা চোখে পড়লে তা সে ছেলেরই হোক আর মেয়েরেই হোক---ভাল লাগত তার। বারবার চেয়ে চেয়ে দেখত। পট্টনায়কের চেহারা যদি সুন্দর না হতো তাহলে হয়ত তার মনে এরকম দুর্বলতা আসতনা।

আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। পট্টনায়ক তার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলছে কয়েক দিন ধরে। অবন্তী বুঝতে পারছে ইচ্ছা করেই তাকে কষ্ট দিতে চাইছে সে। তবু তার প্রতি আকর্ষণের এই ঘোর থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছেনা।

তার মনে হোল দাদার যে এরকম 'বাই' নেই তা একপক্ষে ভালই। তার মত পছন্দ অপছন্দের জ্বালা সইতে হয়না কখনও দাদাকে।

কয়েক দিন পর পাত্রী দেখতে পাঠালেন যোগমায়া দেবী। প্রতিবেশী একজন বর্ষীয়ান ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে মেয়ে দেখতে গেল অবন্তী আর অরিন্দম। অরণী গেলনা। ইচ্ছা করেই যোগমায়া দেবী গেলেননা সঙ্গে। কোন দিনই বাইরে ঘোরার অভ্যাস নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর বর্হিজগতের সঙ্গে যোগাযোগের অভ্যাস চলে গেছে অনেকটাই। ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে যাওয়ার জন্য কোন উৎসাহ বোধ করলেননা সে কারণেই।

প্রতিবেশী বর্ষীয়ান ভদ্রলোকটিকে অবন্তীরা জ্যাঠামশাই বলে ডাকে। অবন্তীর দুটি বাড়ির পরই ওঁর বাড়ি। একমাত্র ওদের বাড়ির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা রয়েছে অবন্তীদের। অবন্তীদের বাবাকে খুবই ভালবাসতেন বোস জ্যাঠামশাই মানে সুরেশ বোস। অবন্তীদের বিপদে আপদে অভিভাবকের মত পাশে থেকে তাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যান্য প্রতিবেশীদের এড়িয়ে চললেও এই ভদ্রলোককে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন যোগমায়া দেবী। ভদ্রলোক তাকে সম্বোধন করেন 'বৌমা' বলে। তিনিও ভদ্রলোকে 'দাদা' বলেই সম্বোধন করেন। আড়ালে অবশ্য উল্লেখ করেন 'বোস দা' বলেই।

ছেলেমেয়েরা ছোট। তাদের বুদ্ধিবিবেচনার ওপর কতটুকু আস্থা রাখা যায়? ওপর ওপর দেখে চলে আসবে তারা। সেজন্যই জামীর লেনে মেয়ে দেখতে পাঠিয়েছিলেন সুরেশ বোসকে। ফিরে এসে নিরুৎসাহ করলেন ভদ্রলোক।

---বৌমা ওখানে ইন্দর বিয়ে দিওনা তুমি। মেয়েটিকে দেখে ভাল লাগলনা আমার। দাঁতটা তো বেশ উঁচু মনে হোল। কপালটাও দেখলাম বড়ো। আমার মনে হচ্ছে ইন্দ সুখী হবেনা। তুমি অনেক কষ্ট করেছ। এখন দেখে শুনে ভালো লক্ষ্মীমন্ত বৌ আনো। এই মেয়ে বউ হয়ে আসলে সংসারে শান্তি আসবেনা তোমার। সামনে ঘোর অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পাচ্ছি আমি।

শিউরে উঠলেন যোগমায়া দেবী কথাটা শুনে। বোসদা জ্যোতিষ চর্চা করেন। তাছাড়া হঠাৎ হঠাৎ মানুষের মুখ দেখে কিংবা কপালের গড়ন দেখে তার স্বভাব, ভাগ্য ইত্যাদি সম্পর্ক বলতে পারেন। আগে একাধিকবার এরকম কথা শুনেছেন বোসদার মুখে। অক্ষরে অক্ষরে ফলতে দেখেছেন তা। তবু ব্যাপারটা আরও একটু ভাল করে বুঝে নিতে চাইলেন।

---আপনার কি মেয়েটির চেহারাছবি ভাল লাগেনি দাদা?

সম্পূর্ণ অন্য সুরে জবাব দিলেন বোসদা।

---চেহারা ছবি খুব খারাপ তা বলছিনা। সে চলে যায়। অবশ্য আমি ভেবেছিলাম সুন্দর মেয়ে চাইবে তুমি ইন্দর জন্য। কিন্তু সেজন্য বলছিনা। মেয়েটি যখন সামনে এসে দাঁড়াল দেখামাত্র মনে হোল অশান্তি নিয়ে আসবে ও তোমার সংসারে।

ছেলেমেয়েদের কাছে বোসদার কথা বললেননা যোগমায়া দেবী ইচ্ছা করেই। তারা চটে যাবে শুনলে। শুধু বললেন 'বোসদার মেয়েকে ভাল লাগেনি। আমার মনে হয় জামীর লেনের ওদের না করে দেওয়াই ভাল'।

অরণী চটে গেল।

---বিয়েটা কোথায় হচ্ছে? বোস জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে না আমাদের বাড়িতে? ওঁর পছন্দ অপছন্দে কি আসে যায়? আর তুমিই বা ওঁর কথায় এত উঠছ বসছ কেন মা?

অরিন্দমও আপত্তি জানাল।

---না মা সেটা ভাল দেখায়না। একবার যখন ও বাড়িতে মেয়ে দেখতে গিয়েছি তখন ওখানেই বিয়ে করব। ওদের অপরাধটা কোথায়? ওরা তো আগে ফটো পর্যন্ত দেখিয়েছে। অপছন্দ থাকলে আমাদের মেয়ে দেখতে যাওয়া উচিত ছিলনা।

যোগমায়া দেবী একবার মনে হোল সুরেশ বাবুর কথাগুলো শোনান ওদের। তাহলে ওরা বুঝতে পারবে কেন তিনি এসব কথা বলছেন। পরক্ষণেই ভাবলেন সুরেশ বাবুব সব কথা যে অভ্রান্ত হবে তার তো ঠিক নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন একেবারে অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে তার ভবিষ্যদ্‌বাণী কিংবা চরিত্র বিশ্লেষণ আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা মেলেনি এমনও হয়েছে। আরও মনে হোল একটু যেন বাড়াবাড়ি করছেন বোসদা। খুব একটা অলক্ষ্মী চেহারা কি মেয়ের? একটু বেশি রকম খারাপ নজরে দেখেছেন বোসদা অর্চনাকে।

অবন্তী পর্যন্ত প্রভাবিত হোল দাদাদের কথা শুনে।

মাকে নিরস্ত করল ও বুঝিয়ে।

---দাদার যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে না করছ কেন তুমি লাগিয়ে দাও ওখানেই।

অবশেষে ফাল্গুন মাসের এক সন্ধ্যায় বৌ হয়ে অবন্তীদের সংসারে প্রবেশ করল অর্চনা রায়। বাড়ির পরিবেশ অনেক রমণীয় মনে হতে লাগল অবন্তীদের।

অনেক দিন পর উৎসবের হাওয়া বইতে লাগল যেন বাড়িতে। নতুন বৌয়ের নতুন শাড়ি, গয়নার চটক তো আছেই। তাকে জড়িয়ে গড়ে উঠল একটা নতুন রমণীয়তার পরিবেশ। নতুন অতিথিকে কেন্দ্র করে সকলেরই মনে বইতে লাগল প্রত্যাশা আর প্রসন্নতার ঢেউ।

অরিন্দমের মধ্যে পর্যন্ত পরিবর্তনের আভাস চোখে পড়ল। সকলেই দেখল তার চোখেমুখে তৃপ্তি আর খুশির ঝলক। পোষাকেও যেন পারিপাট্য দেখা গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই অনেক কমে গেল তার বয়স। তারুণ্যের সঙ্গে মানসিক আনন্দের কতটা যোগ আছে তা বোঝা গেল তাকে দেখে।

অর্চনার গানের গলা ভাল। বিয়ের আগে রীতিমত চর্চা করত। বিয়ের পরও অব্যাহত রইল তার সঙ্গীতচর্চা। যোগমায়া দেবী বাধা দিলেননা। তার বড় মেয়ের গলাও ভাল ছিল আগে গান বাজনায় খুব উৎসাহ ছিল। মাথা খারাপ হওয়ার পর অনেক অন্য বকম হয়ে গিয়েছে এ বাড়ির পরিবেশ।

আজকাল মাঝে মাঝেই গানের আসর বসে বাড়িতে। অবন্তী, অরণী তো বটেই এমনকি যোগমায়া দেবী, অরিন্দম আর অরুন্ধতী পর্যন্ত উপস্থিত থাকতে লাগল সেই আসরে। অর্চনা তার পরিচিত গায়ক গায়িকাদের মাঝে মাঝেই আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতে লাগল বাড়িতে।

অরুন্ধতীর মাথার গোলমাল দেখা দেওয়ার পরও একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি তার গানের গলা। মাঝে মাঝেই সুরেলা গলায় ভজন, রবীন্দ্র সঙ্গীত, এমন কি গীত বা গজল পর্যন্ত গাইত। নির্ভুল উচ্চারণে তাল লয়ে সুরের বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রেখে সে যখন আপন মনে বিভোর হয়ে গান গাইত তখন সেটা শুনে মনে হোতনা কোন বিকৃতমস্তিস্ক ব্যক্তি গাইছে। কিন্তু সেটা ছিল নিতান্তই অনিয়মিত ঘটনা। তার মর্জি বা মেজাজের ওপর নির্ভর করত সেটা।

অর্চনা এ বাড়িতে আসার পর পুরনো দিনের সেই হারানো পরিবেশ ফিরে এল আবার। ঠাকুরঘরে গিয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানালেন যোগমায়া দেবী বারবার। তার মনে হোল দুঃস্বপ্নের যে বিভীষিকা এতদিন অভিশাপের ছায়ার মত ঘিরে ধরেছিল তার সংসারকে তার যেন অবসান হয়েছে।

বউয়ের নতুন শাড়ী গয়না পরা চেহারার দিকে তাকিয়ে তার মনে হোল---সুন্দর না হোক শ্রী আছে চেহারায়। ছেলের মধ্যে পরিবর্তন দেখে মনে হোল---'আহা বড় কষ্ট করেছে আমার ইন্দ এতদিন। সংসারের জন্য নিজেকে বঞ্চিত করেছে নানাভাবে। ও এখন সুখী হোক।'

কিন্তু মাস দুয়েক যেতে না যেতেই কালো মেঘের মত গ্রাস করে নিল আবার এক অশুভ পরিবর্তন। অরুন্ধতীর পাগলামি বাড়তে লাগল। আগে তার মধ্যে বন্যতা বা হিংস্রতা তেমন ছিলনা। এখন মাঝে মাঝেই উদ্দাম হয়ে উঠতে লাগল সে। তার যত রাগ তা যেন নতুন বউয়ের ওপর।

বিচিত্র ভাবে ব্যক্ত হতে লাগল তার সেই রাগ বা আক্রোশ। একটুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করত সে নতুন বৌকে। পরক্ষণেই হঠাৎ তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে বিপর্যস্ত করতে চাইত তাকে। সহজে ছাড়ানো যেতনা। যে ছাড়াতে যেত তাকে সহ্য করতে হোত ওর হাতের কিল চড় ঘুষি কিংবা আঁচড়ানি।

যোগমায়া দেবী, অরিন্দম কিংবা অবন্তী মার খেয়েও সহ্য করে যেত। পাল্টা প্রতিঘাত হানার চেষ্টা তারা করতনা। কিন্তু অরণী অত সহজে ছাড়তনা। সে ধরলে আর রেহাই ছিলনা অরুন্ধতীর। অরণীর সবল হাতে বৃষ্টির মত বর্ষিত হোত কিল চড় ঘুঁষি। মার খেয়ে কালসিটে পড়ে যেত অরুন্ধতীর শরীরে।

যোগমায়া দেবী সহ্য করতে পারতেননা। ছেলের নিষ্ঠুরতার বহর দেখে কষ্ট পেতেন। ঠাকুরঘরে ঠাকুরের আসনের সামনে মাথা নুইয়ে ঝরঝর করে কাঁদতেন। বলতেন 'আর সহ্য করতে পারিনা ঠাকুর। আমার মেয়েটাকে ভাল করে দাও তুমি।' কখনও বা মা হয়েও মৃত্যু কামনা করতেন মেয়ের। বলতেন 'ও আমার মেয়ে। ওর এত কষ্ট আর আমি দেখতে পারিনা। ওকে তুমি মুক্তি দাও। তোমার কাছে টেনে নাও ওকে। ওতো বেঁচেও মরে আছে। ওর সব কষ্ট দূব করে দাও ঠাকুর'।

পরে মেয়ে যখন শান্ত হয়ে যেত, ঠাণ্ডা নিরীহ দৃষ্টি ফিরে আসত তার চোখে তখন মনে হোত অন্য কথা। মনে মনে বলতেন 'ঠাকুর ওকে নিওনা। ও চলে গেলে সইব কি করে? পাগল হোক উন্মাদ হোক তবু তো আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন ভাল থাকছে তখন তো কি সুন্দর লক্ষ্মী মেয়েটি হয়ে সব কিছু ঠিকমত করে যাচ্ছে। তোমাকে আমি ভাল করে পূজো দেব। ওকে শুধু ভাল করে দাও।'

অরুন্ধতীকে কেন্দ্র করে তৈরি হতে লাগল অশান্তির ঘূর্ণাবর্ত। একটা জিনিষ খুব বিচিত্র লাগত অবন্তীর কাছে। অরণীর ওপরে দিদির যেন সীমাহীন আক্রোশ। নতুন বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে অরণীর ওপরেও তার যেন রাজ্যের আক্রোশ দেখা যেতে লাগল।

নতুন বৌয়ের ওপরে যদিও বা তার আক্রোশের কোন একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়, অরণীর ওপরে হঠাৎ কেন এতটা খাপ্পা হয়ে উঠল সে তা কেউ বুঝতে পারতনা। অরণী যে এই প্রথম তার গায়ে হাত দিয়েছে তা নয়। আগেও চড় চাপড় ঘুঁষি দিতে দ্বিধা করেনি সে। কিন্তু অরুন্ধতীর মধ্যে তখন এরকম তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। তার যত রাগ তা ছিল বরং মায়ের ওপর। মাকেই অনেক কিছু সামলাতে হোত। মেয়ের অনেক ইচ্ছায় বাধা দিতে হোত। সেজন্য স্বাভাবিক কারণেই মায়ের ওপর ক্ষেপে উঠত সে।

এখন তার রাগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল দুজন। অর্চনা আর অরণী। দাদার ওপর যদি রাগ দেখাত দিদি তাহলে বোধ করি এতটা আশ্চর্য হতোনা অবন্তী। ভাবত দাদার বিয়ে হয়েছে বলে তার আর বৌদির প্রতি রাগ পুঞ্জীভূত হয়েছে দিদির মনে।

বেশ কিছুদিন ধরেই একটা নতুন উপসর্গ দেখা যাচ্ছে অরুন্ধতীর মধ্যে। বিয়ের নামে চনমন করে ওঠে সে। দিব্যি সেজেগুজে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বৌ সাজবে। কখনও বা মায়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলবে---'ওমা আমার কবে বিয়ে হবে? আমার কেন বিয়ে দিচ্ছ না?' আরও এমন সব কাণ্ডকারখানা শুরু করে যে পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

কিছুদিন আগেই তাদের পাশের বাড়িতে জনৈক মাদ্রাজী যুবক একটি ঘর ভাড়া নিয়েছে। একদিন বাড়ির সকলের চোখ এড়িয়ে চলে গেল সেখানে অরুন্ধতী। তার সুসজ্জিত চেহারা দেখে হঠাৎ কারুর বোঝার উপায় নেই সে প্রকৃতিস্থ নয়। কৃষ্ণমূর্তিও বোঝেনি। সাধারণ ভদ্রতায় অরুন্ধতীকে বসতে দিয়েছে, তাকে কফি অফার করেছে।

কিন্তু অরুন্ধতী কিছুতেই আর ওঠেনা। তরা ভাবভঙ্গী দেখে খানিক্ষণ পরে কেমন যেন সন্দেহ হোল কৃষ্ণমূর্তির। অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা করে আগেই জেনেছিল পাশের বাড়ি থাকে সে। ছুতো করে বাইরে বেরিয়ে সোজা খবর পাঠাল বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দম সেখানে উপস্থিত হয়ে অনেক বুঝিয়ে টুঝিয়ে তবে নিয়ে আসল তাকে।

বাড়িতে এসে অরুন্ধতীর সে কি উল্লাস! যোগমায়া দেবী তাকে ধমক দিলেন---'কি আরম্ভ করেছিই তুই অরু? কোনদিন তোর কপালে যে কি বিপদ ঘনিয়ে আসছে কে জানে'! অরুন্ধতী কানেও নিলনা মায়ের কথা। শিশুর মত কলকণ্ঠে কেবলি বলতে লাগল এক কথা।

---জান মা ও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। ও আমাকে কত আদর করেছে। বলেছে সোনা মেয়ে তোমাকে বিয়ে করবনা তো কাকে করব? বলনা মা ওর সঙ্গে তুমি আমার বিয়ে দেবে? দেবে তো মা?

মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ ঘষতে থাকে সে অবোধ পশুর মতো। যোগমায়া দেবী তার পাগল অবোধ মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কাঁদেন। বলেন---'দেব মা নিশ্চয় দেব। তুমি ভাল হয়ে ওঠো। জাঁকজমক করে বিয়ে দেব তখন তোমার।'

বিয়ের জন্য এই পাগলামির সঙ্গে নতুন বৌয়ের ওপর আক্রোশের একটা সম্পর্ক হয়ত খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তবু বুঝি একটা ফাঁক থেকে যায়; প্রথম থেকেই নতুন বৌয়ের ওপর এই আক্রোশ দেখা যায়নি অরুন্ধতীর। বরং বাধ্য পোষা জন্তুর মতো নতুন বৌয়ের কাছে ঘুরঘুর করত তখন কেবলি।

আরেকটা জিনিষ বুঝে উঠতে পারতনা অবন্তী। বৌদির সঙ্গে দাদার ওপরও তো দিদির আক্রোশ হওয়ার কথা। কিন্তু কই দাদার ওপর তো কোন রাগ নেই? আজকাল তার যত আক্রোশ তা দেখা যায় এ বাড়ির দুটি প্রাণীর ওপরে। অনেক ভেবেও কোন কূলকিনারা পায়না অবন্তী।

তাদের বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে যে নিরানন্দ স্যাতস্যাতে আবহাওয়া বিরাজ করছিল হঠাৎ অপসৃত হয়েছিল। কিছুদিনের জন্য রোদ্দুরের ঝলক দেখা গিয়েছিল। কিন্তু মরীচিকায় পর্যবসিত হোল রোদ্দুরের সেই প্রতিশ্রুতি। দারুণ সর্বনাশের আভাস দিয়ে থমথম করতে লাগল আবহাওয়া।

তার দিদির উন্মত্ততা দেখে যতটা না সে পীড়িত বোধ করছিল তার চেয়ে অনেক বেশি করে তার বুকে বাজল দাদার মুখের ওপর উদাস বিষণ্ণতার ঘন প্রলেপ দেখে। কয়েকটা দিনের জন্যক নিজের খোলসটা ফেলে দিয়ে তারুণ্যের পোষাক পরে নিয়েছিল অরিন্দম। সেই পোষাক আবার তার কাছে অনাবশ্যক বলে মনে হোল কেন বুঝতে পারলনা অবন্তী।

আবার দেরি করে বাড়ি ফিরতে লাগল অরিন্দম। আবার তার চলনে বলনে, এল বৃদ্ধের স্থবিরতা। তার বৌদির সঙ্গে তো বটেই অবন্তীদের সঙ্গেও কথা বলতে যেন ক্লান্ত বোধ করত সে। শুধু অবন্তীর চোখেই ধরা পড়লনা সেই পরিবর্তন। যোগমায়া দেবীও লক্ষ করলেন ছেলের সেই রূপান্তরণ।

প্রথমে ভাবলেন হয়ত ব্যবসায় কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে। আর্থিক অনটনের সম্ভবনা দেখে হতাশ নিরুদ্যম বোধ করছে তার ইন্দ। কিন্তু তাহলে

ছোট ছেলের কাছে সেরকম আভাস পাওয়া যেত। দাদা যতটা নীরব সে আবার ততটাই সোচ্চার। কিন্তু অরণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও সেরকম কোন তথ্য পেলেননা।

তখন মনে হোল তবে কি বৌয়ের সঙ্গে মতান্তর হয়েছে ছেলের? কিন্তু তার এই সুশীল শান্ত ছেলেটির সঙ্গে কারুর যে মতান্তর ঘটতে পারে তাও যেন কল্পনাতীত তার কাছে। এই ছেলে শুধু তার প্রথম গর্ভজাত সন্তানই নয়। তার সমস্ত আশাভরসা কল্পনার কেন্দ্রস্থলও তো এই ছেলে। এই ছেলের সুখশান্তির ওপরেই নির্ভর করছে আর সকলের সুখশান্তির ইমারত।

মাতৃহৃদয়ের উদ্বেলিত দুশ্চিন্তা শেষ পর্যন্ত চেপে রাখতে পারলেননা তিনি। একদিন অর্চনার অনুপস্থিতির সুযোগে ছেলের কাছে ব্যক্ত করে ফেললেন সেই দুশ্চিন্তা। জামীর লেনে অর্চনাদের পাড়ায় গানের একটা জলসার আয়োজন হয়েছিল। অর্চনাকে গান গাইবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সেখানে। ছোটখাট অনুষ্ঠানে এরকম মাঝে মাঝে গান গাইতে যায় সে। বিয়ের পরও তা অব্যাহত আছে।

কি কারণে যেন অরিন্দম তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল দোকান থেকে। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়েছিল সে নিজের বিছানায়। অবন্তী তখনও ফেরেনি অফিস থেকে; কিছুদিন থেকে দেরি করে ফিরছে সে। অরণীও বাড়ি ফেরেনি। সুযোগটা হাতছাড়া করেলেননা তিনি। ছেলের কাছে বিছানায় বসে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

---শরীর খারাপ লাগছে ইন্দ?

অরিন্দম কোন জবাব দিলনা। নিঃশব্দে শুয়ে রইল আগের মত। এই ঘটনাও অভূতপূর্ব। মা প্রশ্ন করলে নীরব থাকবে তা যেন ভাবাই যায়না। যোগমায়া দেবীর মনে অভিমান হলো। একবার ভাবলেন ও হয়ত আমার সঙ্গে এখন কথা বলতে চাইছেনা। নিজেকে নিয়ে একা থাকতে চাইছে। পরক্ষণেই অভিমান থেকেও বড় হয়ে উঠল তার উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। ছেলের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে অনুযোগ করতে থাকেন---'দাড়িটাও কামাসনা ঠিকমত? কি হয়েছে ইন্দ?

অরিন্দম এবারও কিছু বললনা দেখে ছেলের গলার কণ্ঠায় হাত রেখে বলেন 'এত খারাপ চেহারা হয়ে গেছে তোর? তোর দিকে যে চাওয়া যাচ্ছে না ইন্দ। আর কাউকে না বলিস। আমি তো তোর মা? কত কষ্ট করে বড় করে তুলেছি তোদের। আমার কাছে লুকোবি তুই?

চোখ খুলল ইন্দ। রাঙা জবার মত লাল হয়ে উঠেছে তোর দুই চোখ। 'কিছু

হয়নি মা। শরীরটা ভাল যাচ্ছেনা। ও নিয়ে তুমি ভেবোনা। আবার ঠিক হয়ে যাবে।'

যোগমায়া দেবী বিশ্বাস করলেননা।

---নিশ্চয় কিছু হয়েছে। কিছুদিন থেকেই দেখছি আমি। তবু জিজ্ঞাসা করিনি। ভেবেছি সাময়িক কোন ঘটনার ওরকম হয়েছে। কিন্তু এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস।

এসব কথার জবাব এড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র একটি প্রশ্ন করলে ইন্দ তার মাকে।

---আচ্ছা মা বলতে পার সহ্য বড় কি ধৈর্য্য বড়?

---এর মানে কি ইন্দ? দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে সেটাই তো বুঝতে পারছিনা। তুই কি জানতে চাইছিস?

---না কিছু না। আমার মনে কয়েকদিন থেকে একটা প্রশ্ন জেগেছে। মনে মনে সেটা নিয়ে ভাবছিলাম। কিন্তু কিছুতেই প্রশ্নটার জবাব খুঁজে পাচ্ছিনা।

---ইন্দ বাবা আমার! কি হয়েছে মন খুলে বল। কিছুদিন থেকেই দেখছি তোর ভাবান্তর। কত কষ্ট করে তোদের বড় করে তুলেছি। সারাটা জীবন কষ্টে কষ্টে কেটে গেল। এখন তোর বিয়ে দিয়ে ভাবলাম একটু সুখের মুখ দেখি। তা একি বিপত্তি আসল? আর কাউকে না বলিস। আমি তো তোর মা? আমাকে বলতে তোর বাধা কি? আমার মনে হচ্ছে কোন কারণে খুব কষ্ট পাচ্ছিস তুই। হয়ত বা ভুল বুঝে। কিন্তু মনে মনে তা নিয়ে গুমরোলে লাভটা কি হবে? মন খারাপ হবে। শরীর খারাপ হবে। লক্ষ্মী বাবা আমার। আমাকে বল কি হয়েছে?

অরিন্দম উঠে বসল।

---তুমি ভেবোনা মা। কিছু হয়নি। তুমি ঠিকই বলেছ। সামান্য কারণেই হয়ত আমি কষ্ট পাচ্ছি। আমার জন্য মন খারাপ করোনা তুমি। ও ঠিক হয়ে যাবে।

ছেলের মাথায় নিঃশব্দে হাত বুলোতে থাকেন যোগমায়া দেবী। বিদুৎচমকের মত তার মনে খেলে গেল হঠাৎ কয়েকটি চিন্তা। বিয়ের পর কোথাও বেড়াতে যায়নি দুজনে। কয়েকদিন আত্মীয় স্বজনের বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেছে মাত্র। বাইরে কোথাও বেরিয়ে আসলে ভালই লাগবে ওদের।

আজকাল অরুর পাগলামি বেড়ে যাওয়ার পর এ বাড়ির পরিবেশও কেমন বিষয়ে উঠেছে। নতুন বৌয়ের এসব ভালো লাগার কথা নয়। ইন্দর মত অটুট সহ্যশক্তি তার থাকবে কি করে?

ভাই বোনেদের প্রতি বরাবরই খুব দুর্বলতা রয়েছে ইন্দর। তাদের সুখশান্তির

জন্য নিজের সুখশান্তি বিসর্জন দিতেও সে প্রস্তুত। কিন্তু বিয়ের পর নতুন বৌয়ের তো কতগুলি চাহিদা থাকবে? তার তো ইচ্ছে করবে স্বামীকে একান্তভাবে নিজের করে পেতে?

কিন্তু তার ইন্দ যে ধরনের ছেলে সে অন্যদের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলবেনা। মা আর ভাই বোনের প্রতি তার এতখানি মমতা আর কর্তব্যপরায়ণতা বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে অর্চনার কাছে।

সে এ বাড়িতে বেশিদিন আসেনি। এক রকম নবাগতই এখানে। এ বাড়ির নাড়ি টেপার ক্ষমতা তার থাকবে কি করে? হয়ত সেসব কারণেই খটাখটি হচ্ছে ইন্দর সঙ্গে। হাজার হোক রক্তের সম্পর্ক নেই তার এ বাড়ির লোকেদের সঙ্গে। ইন্দ এ বাড়ির জন্য যতটা টান বোধ করবে তা তার পক্ষে বোধ করা সম্ভব নয় কোনমতেই।

তিনি অবুঝ শাশুড়ী নন। তার মাতৃহৃদয় নারীহৃদয়ের আশা আকাঙ্খার স্পন্দন বুঝতে অক্ষম নয়। স্বার্থপরের মত কাউকে তার জন্য দোষী খাড়া করতে পারেননা। বিশেষ বিশেষ সময়ে মানুষের মনে তৈরি হয় কতগুলি চাহিদা। তখন তা পূরণ না হলে বড় দেরি হয়ে যায়। পরে অনেক দিয়েও তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়না।

সম্বন্ধ করা এই বিয়েতে স্বামী স্ত্রী দুজনেই দুজনের কাছে অপরিচিত। বিয়ের পরবর্তী কয়েকটা মাস খুব দামী সময় সেদিক থেকে। এই সময়ে ভুলত্রুটি ঘটলে তার মাশুল গুনতে হয় বহুদিন ধরে। এসব ব্যাপারে ছেলের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর কোন আস্থা নেই তার। সময়কে আর গড়িয়ে যেতে দেবেননা তিনি এভাবে। তার সংসারের হাল ধরতে হবে তাকেই।

যোগমায়া দেবী মনে মনে ভেবে নিলেন কিভাবে শুরু করবেন কথাটা। তার ছেলের স্বভাবে কোন কোন ব্যাপারে মেয়েদের মত লজ্জাশীলতা আছে। ঠিকমত বলতে না পারলে আরও গুটিয়ে নেবে সে নিজেকে। ছেলের শরীরের প্রসঙ্গ তুলে আরম্ভ করলেন তিনি।

—ইন্দ আমার মনে হয় তোর একটু বায়ু পরিবর্তন দরকার। কয়েকটা দিন কলকাতার বাইরে খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে এলে ভাল হতো তোর পক্ষে। শরীর ভাল না থাকলে মনও ভাল থাকেনা। আমি বলি কি তুই অর্চনাকে নিয়ে কয়েকদিন স্বাস্থ্যকর কোন জায়গায় ঘুরে আয়। আমিও যেতাম তোদের সঙ্গে। কিন্তু এখানে যে চলবেনা। অরু আছে, বিন্তীর অফিস আছে, রণর দোকান আছে। আমার হাত পা তো বাঁধা।

যোগমায়া দেবীর প্রস্তাব ঝটতি নাকচ করে দিল অরিন্দম।

---তুমি শুধু ভাবছ মা। দু'চারদিন এরকম শরীর খারাপ কার না হয়? ত জন্য বাইরে বায়ু পরিবর্তন করতে যেতে হবে কেন?

রাগ হয়ে গেল যোগমায়া দেবীর। অবুঝ ছেলেকে আর কি করে বোঝা পারেন তিনি মা হয়ে? তাকে তো আর স্পষ্ট করে বলতে পারেননা 'তো হনিমুন করে আয়?' অরিন্দমকে তার নির্বুদ্ধিতার জন্য কিছু বলতে যাচ্ছে এমন সময় অবন্তী আবির্ভূত হলো সেখানে।

--কি ব্যাপার মা? আলো টালো জ্বালাওনি? বাইরের দরজা হাট খোলা

অবন্তীকে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছে আজ। মাঝখানে মুখ গোমড়া করে থাক সারাক্ষণ বিন্তী। জিজ্ঞাসা করলে বলত 'অফিস করতে ভাল লাগছে একঘেয়ে লাগছে মা।' শুনে নিজেকে অপরাধী মনে হোত। কন্যা সন্তানে চাকরি করা কোনদিন পছন্দ নয় তার। তিনি বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু বি শুনলনা। জেদ করে চাকরিতে ঢুকল। মেয়ের নিরুৎসাহ কথাবার্তা শুনে ভা হয়ে উঠত তার মন। তার ওরকম পরমাসুন্দরী মেয়ে দশটা পাঁচটা অফিস ক শরীরের লাবণ্য হারাবে, শ্রী হারাবে তা কি ভালো লাগতে পারে?

বিন্তীর টাকাটা এখন সংসারের প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে এমনভা যে ঝট করে যদি ও চাকরি ছাড়ে তাহলে সত্যিই তাদের কম মুশকিল হবে তবু তার মনে আশা বিন্তীর চেহারা দেখে কোন ধনী পবিবার থেকে বিয়ে প্রস্তাব আসবে একদিন। উপযাচক হয়ে কোন পাত্র এগিয়ে আসবে বিন্তী বিয়ে করতে।

কিন্তু মেয়ের হাসি ঝলমল মুখ দেখে রাগ হয়ে গেল তার আজ। এত দে করে বাড়ি ফিরল কেন ও? কখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। মনে হোল কয়েক দি ধরেই দেরি করে বাড়ি ফিরছে বিন্তী। ওকে শাসন করা দরকার। এই মে স্বভাবে বড় চঞ্চল। কখন যে কি ঘটাবে বিশ্বাস নেই।

রণ আর বিন্তীকে নিয়ে তার মনে বরাবরই দুশ্চিন্তা। অরু শান্তশিষ্ট বা স্বভাবের ছিল। তবু কি দুর্মতি হোল! হাত বাড়াল অনেক ওপরের দিকে। ওজ বুঝে চলেনি তার নির্বোধ ভালোমানুষ মেয়ে। সরল বিশ্বাসে মেলামেশা কর অপদার্থ ছেলেটার সঙ্গে। অবশ্য তিনি জানেন এ ব্যাপারে দোষ তার মেয়ের ন ততটা। লোকমুখে শুনেছেন ছেলেটা একেবারেই সুবিধার নয়। এখনও বিয়ে পরও নাকি ওর স্বভাবচরিত্র খুব পাল্টায়নি।

বিন্তীর ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটলে ও এতটা অধীরা হতোনা। অরুর মতো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বসতনা। বোকা মেয়ে অপাত্রে তার সব বিশ্বাস আর ভালোবাসা অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিল।

বিন্তীর জন্যও অবশ্য মাঝে মাঝে ভয় তার। অরুর মত শান্ত মেয়েই যদি ওরকম ভুল করতে পারে তাহলে বিন্তীর মত ছটফটে চঞ্চল মেয়ে যে নির্ভুল পদক্ষেপে চলবে তা নিশ্চয় করে বলা যায়না।

কিন্তু তিনি কি করবেন? কত দিকে নজর রাখবেন? স্বামীর ওপর রাগ হয় তার প্রায়শই। সব কটি সন্তানের দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে চলে গেলেন তিনি ড্যাং ড্যাং করে। এখন তিনি একা দশভূজা হয়ে তার এই চারটি সন্তানের মঙ্গল-অমঙ্গল দেখেন কিভাবে?

বিন্তীর গোমড়া মুখ দেখে সেদিন তার খারাপ লেগেছিল। আজ তার ঝলমলে উজ্জ্বল লাবেণ্যে ফেটে পড়া সুখী মুখ দেখেও কম খারাপ লাগলনা। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়। তিনিও কেন যেন অনাগত দুর্যোগের আশঙ্কায় শিউরে উঠলেন।

—এত রাত করে বাড়ি ফিরিস কেন বিন্তী? অফিস থেকে ফিরতে এত দেরি হয় কেন?

এরকম প্রশ্ন আশা করেনি অবন্তী। পট্টনায়কের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের মুহূর্তটি চমৎকার কেটেছে আজ। পট্টনায়কের মনের অভিমান দূর করে দিতে পেরেছে সে। তাকে বুঝিয়ে বলেছে সেদিনের ঘটনাটি। পট্টনায়ক বুঝতে পেরেছে সেদিনের সেই অনুপস্থিতির ঘটনা ইচ্ছাকৃত ছিলনা তার। পট্টনায়ক প্রস্তাব করেছিল বেড়াতে যাওয়ার। সে রাজী হয়নি। আজ বৌদি বিকেলে বাড়ি থাকবেনা। মা তাকে আগে ফিরতে বলেছেন। সেজন্য অসুবিধা আছে বলে সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। তবে কথা দিয়েছে আগামী কাল অবশ্যই অফিস ছুটিব পর পট্টনায়কের সঙ্গে বেড়াতে যাবে।

মায়ের প্রশ্ন শুনে অবাক হলো সে। তার ভালমানুষ নির্বিরোধী মায়ের অভ্যাস নেই ছেলেমেয়েদের উপর খবরদারী করা। হঠাৎ কেন তার এই ভাবান্তর বুঝতে পারছিলনা অবন্তী।

আরেকটা কথা ভেবেও আশ্চর্য লাগছিল তার। পরপর কয়েকদিন অফিস ছুটির পর সে হয় শ্যামলীর বাড়ি কিংবা মিসেস ডি. সিলভার বাড়ি কিংবা নীতু মেহতার বাড়ি গিয়েছে। কারণ ছিল একটাই। তার ভারী মন্থর সন্ধ্যাটা ভালভাবে কাটানো।

দাদার বিয়ের পর কয়েকদিন অবশ্য বাড়িতে খুব উৎসবের হাওয় বইছিলো। নতুন বৌদির সান্নিধ্য লাভের আমেজে ভরপুর ছিল মন। নিজে: মানসিক কষ্ট চাপা দিয়ে উৎসবের সেই হাওয়ায় গা ভাসাতে অসুবিধা হয়নি কিন্তু এখন আবার সেই বিশ্রী পরিবেশ ফিরে এসেছে বাড়িতে। দিদির চিৎকার ছোড়দার মারধর, বৌদির গম্ভীর বিরক্ত মুখের ভ্রূকুটি আর সর্বোপরি দাদা: হতাশাক্লিষ্ট অবসন্ন মুখ দেখে দম বন্ধ হয়ে আসে তার।

দুঃখ, হতাশা আর বিষণ্ণতার পরিবেশের মধ্যে দমচাপা অস্বস্তি হয় যেন দুঃখকে যারা আঁকড়ে থাকতে ভালোবাসে তাদের দলে সে পড়েনা। দুঃখ, দুর্দশ আর হতাশাকে এড়িয়ে চলতেই চায় সে। সেজন্যই যতটা কম সময় বাড়িতে কাটানো যায় তার চেষ্টা করেছে। তবু তার মনে একটা কাঁটা ছিলই।

পট্টনায়ক অবশ্য কয়েকদিন ধরে একটু বেশিরকম ভাবেই ঘোরাফের করেছে তার সামনে দিয়ে। কেন যেন অবন্তীর মনে হয়েছে আপস করতে চাইছে সে, সমঝোতা করতে চাইছে। তার উপায় ছিলনা উদ্যোগী হয়ে সেটা সম্প: করা। অতএব চুপচাপ সব লক্ষ্য করে গিয়েছে শুধু।

আজ পট্টনায়কই নিজের থেকে কথা বলেছে তার সঙ্গে। অবশ্য সে শুর করেছিল অফিসের কোন একটা প্রসঙ্গ নিয়েই। তবে একটু পরেই অবধারিত ভবে চলে এসেছে সেদিনের প্রসঙ্গ। অনেকদিন ধরে মনে মনে মহড়া দিয়েছি অবন্তী। অনায়াসে ঠিকমত বলতে পেরেছিল তাই তার অসুবিধার কথা বোঝাতে পেরেছিল বিনাদোষে পট্টনায়ক কতটা অবিচার করেছে তার প্রতি।

অনেকদিন পর ফিরে পেয়েছিল সে মনের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছাস আর উল্লাস তার মায়ের চোখে যে সেটি ধরা পড়বে তা তার ধারণাতীত ছিল। দেরি কে ফিরছে সে কয়েকদিন ধরেই। কিন্তু মা তাকে কোন প্রশ্ন করেননি। আজ হয়ত তার চোখে মুখে এমন কিছু মূর্ত হতে দেখেছেন যার জন্য প্রশ্ন না কে পারেননি।

সোজাসুজি মায়ের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল সে ইচ্ছা করেই

---আজ তুমি আমার ওপর এত চটে আছ কেন মা? কাল পরশু তো এর থেকেও দেরি করে বাড়ি ফিরেছি। তুমি কিন্তু কোন প্রশ্ন করনি। আসল কথাটা বলে ফেলনা। কি হয়েছে?

যোগমায়া দেবী নরম হলেননা।

—কি হয়েছে দেখতে পাসনা তোরা? তোদের জন্য তোদের দাদা হাড়ভাঙ্গ

পরিশ্রম করে চলেছে। আর তোরা আছিস নিজেদের স্ফূর্তি আনন্দ নিয়ে। দাদার দিকে চেয়ে দেখেছিস? কি চেহারা হয়েছে ওর? তোদের কারুরই সেদিকে চোখ নেই।

অরিন্দম বিরক্ত হোল।

---বিন্তীকে বকছ কেন মা? ও কি করেছে? আমার যদিন শরীর খারাপ হয় তার জন্য কি ও দায়ী? বেচারা খেটেখুটে বাড়ি ফিরেছে সবে।

অবন্তীর দিকে ফিরে নরম গলায় অনুরোধ করে অরিন্দম।

---বিন্তী যা হাত মুখ ধুয়ে আয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের বকুনি খেতে হবেনা আর।

দাদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত হয়ে ওঠে অবন্তীর মন। ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছে তারা। তবু সুযোগ্য পুরুষ অভিভাবকের অভাব বোধ করেনি। অবশ্য সুযোগ্য কথাটা হয়ত যথার্থ নয়। দাদা বড় নরম স্বভাবের কাউকে কোন দিন কড়া কথা বলতে পারেনা।

পেছন থেকে মায়ের কথা কানে যেতে চমকে ওঠে সে।

---আজ অর্চনা এলে বলব ওকে। ওরও তো উচিত তোর দিকে দেখা। ওর চোখে পড়ছেনা কি হাল হয়েছে তোর চেহারার? ইন্দ একটু কড়া হ। তুই এ বাড়ির বড় ছেলে। তোকেই ধরতে হবে শক্ত হাতে সংসারের হাল। তোর পছন্দ অপছন্দ মেনে চলতে হবে সকলকে। তুই মনের মধ্যে কষ্ট চেপে না রেখে শুধু মুখ ফুটে বল।

অবন্তী থমকে দাঁড়াল। দাদার জবাব শোনার জন্য। কানে এল অরিন্দমের অভিমানাহত কণ্ঠস্বর।

---আমার কোন পছন্দ অপছন্দ নেই মা। আর আমি কারুর স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতেও চাইনা। দোহাই তোমার। অর্চনাকে একটি কথাও বলবে না তুমি। ওকে ওর মত চলতে দাও।

কাঠ হয়ে গেল অবন্তী। বুঝতে পারল কোন এক ছিদ্রপথে ঘোর সর্বনাশের সরীসৃপ এসে ঢুকেছে তাদের সংসারে। অনাগত সেই দুর্যোগের আশঙ্কায় তার শরীর শিউরে উঠতে লাগল বরাবর।

সাত

অবন্তীর বিরক্ত লাগছিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজন অফিসার। অক্টোপাসের বাহু মনে হচ্ছিল তাদের। সকলেরই এক আবেদন।

---মিস মিত্র একটু তাড়াতাড়ি করে দিন। নয়ত মারা পড়ব।

বড় বড় অফিসার এরা। প্রচুর মাইনে পায়। তাদের তেল কোম্পানির কাজকর্ম চলে সারা ভারতে। ভারতের বহু প্রদেশেই রয়েছে তাদের অফিস। উৎপাদনশীল কাজের প্রতিটি সুবিধা তারা ভোগ করে অফিসার কর্মী নির্বিশেষে। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা পর্যন্ত যে অঙ্কের মাইনে পায় তা অন্য অনেক অফিসের কর্মীদেরই ঈর্ষার কারণ হতে পারে।

টাকার ব্যাপারে কার্পণ্য নেই এখানে। মাইনেপত্র ছাড়াও হাজারটা সুবিধা পাওয়া যায়। এক্স্ গ্রাশিয়া বোনাস ইত্যাদি বহু লেজুড়ের ছড়াছড়ি এখানে।

প্রথম দিকে অবন্তীর মনে হোত এখানে টাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শুধু দেখে শুনে কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। কতভাবে যে বাড়তি রোজগার হয় এখানে! অবৈধ ভাবে পার্টির কাছে টাকা খাওয়ার কথা বাদ দিলেও এখানে আছে ওভারটাইম, টি. এ. য়্যুনিফর্মের টাকা, জুতো মোজার টাকা, ধোলাইয়ের টাকা, হিন্দী পরীক্ষায় পাশ করার টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা। ইচ্ছা থাকলে যে কেউ টাকা করে নিতে পারে।

ইউনিয়ন থেকে যখন দাবিদাওয়া নিয়ে আপত্তি কিংবা প্রতিবাদ উঠত অবন্তীর মনে হোত বাড়াবাড়ি করছে। ভাবত ম্যানেজমেন্ট এত পাইয়ে দিচ্ছে তবু কেন সন্তুষ্ট নয় ইউনিয়নের নেতারা, কিংবা তাদের চেলাচামুণ্ডারা? কিন্তু পরিবেশের একটা মহিমা আছে। এখন অবন্তীও বোঝে কেউ কাউকে পরিবেশেণ একটা মহিমা আছে। এখন অবন্তীও বোঝে কেউ কাউকে পাইয়ে দেয়না। ওপরের মহলে কিংবা নিচের মহলে লুটেপুটে কম নিচ্ছেনা। মাঝখানের স্তরে বরং বঞ্চিত হচ্ছে কর্মীরা।

ধরাবাঁধা রাস্তায় চলে যেটুকু উপার্জন সম্ভব সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের। উপরি টাকা রোজগারের ধান্দা অনেক বেশি দেখা যায় ওপর মহলে আর নীচের মহলে। কিন্তু ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শ্যাম্যতি হবিষা কৃষ্ণবত্মেব এবাভিভূয়বর্ধ্বতে প্রমাণিত হয় বরাবর। টাকার তৃষ্ণা বেড়েই চলে। কেউ যেন তৃপ্ত নয়।

অবন্তী নিজেও আজকাল আর মনে করেনা অনেক পাচ্ছে। বরং তার মনে হয় অনেক অফিসের তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় তাদের। কেন তারা অনেক বেশি পাবেনা? অনেকের চেয়ে।

অফিসারদের মধ্যে সামান্য অ্যালাউন্সের টাকা নিয়ে এই হ্যাংলামি দেখে তার নিজের লজ্জা হয়। মনে হয় সামান্য টাকার জন্য কি মরে যাচ্ছে এরা? খারাপ

াগেনা এদের তার মত সামান্য একজন কর্মচারীর কাছে প্রার্থী হয়ে মিনতি রতে? কিন্তু মুখে কিছুই না বলে কাজ সারতে থাকে সে। মনের কথা মনেই য়ে যায়।

লাঞ্চের আগের মুহূর্তে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন মহাদেব মুখার্জী। হাতে কাজ মাটামুটি সারা হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে। শিগগিরই অবসর নেবেন। ভদ্রলোক ার্থকনামা। সদাশিব প্রকৃতির মানুষ। তবে কিছুটা ব্যক্তিত্বহীন। ওর অধস্তন র্মচারীরাও ওকে তেমন মেনে চলেনা ওর এই অমায়িক প্রকৃতির জন্য।

অথচ ওঁর থেকে অনেক নীচু পদে কাজ করেন এমন অফিসারদেরও দেখা াবে দারুণ রাশভারী হতে। কর্মচারীদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের াধিপত্য আর প্রভুত্ব বজায় রাখছেন।

অবন্তীকে খুব স্নেহ করেন ভদ্রলোক। অবন্তীরও খুব ভালো লাগে ওঁকে। য়সের তুলনায় বেশি বুড়িয়ে গেছেন যেন। অবন্তীর খুব মায়া হয় ওকে খলে। মাঝেমাঝে এমন ভাবে কাঁপতে থাকেন যে রীতিমত ভয় হতে থাকে র ওর জন্য।

অবন্তীর কাছে এগিয়ে এসে শিশুসুলভ হাসি হাসেন তিনি।

---এই যে অবন্তী মা। আমার লোনের কাজটা একটু তাড়াতাড়ি করে দিতে ব যে। আমার একমাত্র মেয়ের বিয়ে।

অবন্তী হাসে।

---নিশ্চয় দেব। আপনি ভাববেননা।

ক্যান্টিনেই লাঞ্চ সারে অবন্তী আর শ্যামলী। ক্যান্টিনের ছেলে দুটি ওদের তি একটু বিশেষ মনোযোগ দেয়। উৎপল আর প্রতীপও ওদের সেকশানেই াজ করে। পাশাপাশি বসে লাঞ্চও সারে ওরা একসঙ্গে। মোটামুটি অবিচ্ছিন্ন ন হয় দুজনকে।

শ্যামলীর সঙ্গে আলাপ সূত্রেই অবন্তীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ওদের। মাঝে ঝেই হাস্যপরিহস করে ওরা ক্যান্টিনের সুরেশ আর মধুর ওদের ওপর ক্ষপাতিত্ব নিয়ে। আজ মাংস আর রুটি চেয়েছিল শ্যামলী আর অবন্তী। ওদের খাদেখি ইচ্ছা করেই যেন উৎপল আর প্রতীপও মাংস রুটির জন্য ফরমায়েস রল।

উৎপলদের আগেই খাবার এসে গেল শ্যামলীদের। শুরু হোল চিরাচরিত াট্টা ইয়ারকি। ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে উৎপল প্রতীপকে বলল---'দেখছিস তো তীপ? কিরকম পক্ষপাতিত্ব? মেয়ে হওয়ার কত সুবিধা? সুরেশ আর মধু

পর্যন্ত গলে গেছে। পরের জন্মে আর পুরুষ হয়ে জন্মাবনা। মেয়ে হয়ে জন্মাব

শ্যামলী বলল---'এত নীচ কেনরে তোরা? না হয় একটু আগেই দিয়েছে তাতে কি হয়েছে? খাবার তো সেই একই।

উৎপল দমলনা। নাটকীয় ভঙ্গীতে হতাশার সঙ্গে মাথা নাড়ল।

---নীচ কি মানুষ এমনি এমনি হয়? পরিস্থিতির জন্য নীচ হয় মানুষ।

একটু পরেই খাবার এসে গেল ওদের।

শ্যামলী বলল---'এই তো দিয়ে গেছে। এখন চুপ কর।'

উৎপল প্লেটের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে।

---নাঃ, আর সহ্য হয়না। দেখেছিস প্রতীপ আমাদের ভাগে কত ক পড়েছে?

প্রথম প্রথম অবাক হতো অবন্তী। ছেলেদের সঙ্গে আগে কোনদিন এভা মেশেনি। মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের এই সহজ সম্পর্কের কথা জানা ছিলনা তা সেজন্য রসিকতার নমুনা দেখে হতভম্ব হয়ে যেত প্রায়ই।

উৎপলের চেহারাটি সুন্দর। আর সে ব্যাপরে খুবই সচেতন সে। বছর দুয়ে হোল বিয়ে করেছে প্রেম করে। সে খবর দিয়েছে সে নিজেই সাড়ম্বরে।

করবীর চেহারটিও সুন্দর।

কিন্তু অবন্তী আসার পর মাঝে মাঝেই কপট হাহুতাশ করে সে।

---সত্যি অবন্তী তুই আগে আসলিনা কেন? তাহলে তোকেই বিয়ে করতা আমাদের জুড়িটা ভাল হতো।

অবন্তী জবাব দেওয়ার আগেই জবাব দেয় শ্যামলী।

---তোকে বিয়ে করতে যেত নাকি ও? তোর চেয়ে অনেক ভাল চেহার ছেলে ওকে বিয়ে করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে।

উৎপল অভিমানের সুরে বলে---'কেন আমার চেহারা কি খারাপ?'

---খারাপ না হতে পারে। কিন্তু দারুণ কিছু সুন্দর নয়। অবন্তী অনেক সুন্দ তোর তুলনায়।

তবু নাছোড়বান্দা উৎপল।

---মেয়েরা ছেলেদের থেকে তো বেশি সুন্দর হবেই। বরকে যে বউয়ের ম সুন্দর হতে হবে এমন কোন কথা আছে নাকি?

শ্যামলী হেসে ফেলে ওর ভঙ্গী দেখে।

---তাহলে চুপ করে থাক। উল্টোপাল্টা কথা একদম বলবিনা। তোর ব

যথেষ্ট সুন্দর। তোর থেকে এতটুকু কম সুন্দর নয়। ওতেই সন্তুষ্ট থাক। আর বেশি উঁচু ডালে হাত বাড়াসনা। মারা পড়বি।

প্রতীপও রসিকতা করে মাঝে মাঝে। তবে তার রসিকতাগুলো প্রায়ই অন্য মাপের, অন্য সুরের হয়। এতক্ষণ চুপ করে ছিল সে। কথা খুঁজে পাচ্ছিলনা। এখন সে সুযোগ পেল বন্ধুর পক্ষ সমর্থনের। শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বলে- —'জানিস না ডিজায়ার অফ দ্য ম্যথ ফর দ্য স্টার, অফ দ্য নাইট ফ্যর দা মরো আওয়ার ভিভোশ্যান ফ্যর সামথিং অ্যাফার ফ্রম দ্য স্ফীয়ার অফ আওয়ার সরো।'

প্রতীপের মধ্যে সুন্দর একটি পরিশীলিত মন আছে। রসিকতা করে। কিন্তু সেই রসিকতার মধ্যে স্থূলতা থাকেনা। স্থূল রসিকতাও বলার কায়দায় স্থূল বলে মনে হয়না। কিংবা হয়ত স্থূলতার খাদটুকু বাদ চলে যায়।

তবে স্বভাবে খুব রসিকতাপ্রবণ নয় ও। মোটামুটি গম্ভীর প্রকৃতির। দুই বন্ধুর মধ্যে শ্যামলী পছন্দ করে বেশি প্রতীপকে। অবন্তীকে মাঝে মাঝেই ও বলে--- 'দুজনে খুব বন্ধু হলে কি হবে? স্বভাবে প্রচণ্ড অমিল রয়েছে ওদের মধ্যে। প্রতীপ উৎপলের মত অতটা আলাপী নয় বলে লোকে বলে ওকে বুঝতে পারেনা। আমিও প্রথম প্রথম বুঝতামনা। এখন অনেকদিন ধরে দেখছি বলে বুঝতে পারি। চমৎকার ছেলে।'

একটু পরেই তিন চারটি ছেলে ক্যান্টিনে এসে প্রতীপ আর উৎপলের পাশে বসে পড়ল। সকলেই এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের। মোটামুটি নেতৃস্থানীয়। চাকরির থেকে অনেক বেশি উৎসাহ এদের ইউনিয়নের কাজকর্মে।

কলেজে পড়ার সময় ইউনিয়ন নিয়ে মাথা ঘামায়নি অবন্তী। রীতিমত বিরক্ত বোধ করত ও হৈ চৈ, হাঙ্গামা, ধর্মঘট আর স্লোগানে। সে ইউনিয়নকে বাদ দিতে চাইলে কি হবে? ইউনিয়ন তাকে বাদ দিয়ে চলতে চায়নি। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল ইউনিয়ন। বিনিময়ে দাবি করেছিল ইউনিয়নের সদস্য হবে সে।

অবন্তীদের সময় তাদের কলেজে আধিপত্য ছিল এস. এফ. আইয়ের। এস এফ. আই.-এর মেয়েদের মত ছাত্র পরিষদের মেয়েদের অত দাপট ছিলনা। কলেজের যাবতীয় ঘটনার ব্যাপারে বক্তব্য ছিল এস. এফ. আই.-এর। এস. এফ. আই.-এর তরফ থেকে কোন ধর্মঘটের আহ্বান জানালে তার সাফল্য সম্বন্ধে কারও কোন সন্দেহ থাকত না। অধ্যাপিকারা পর্যন্ত সমীহ করে চলতেন এস. এফ. আই.-এর কর্মকর্তাদের।

ছেলেদের মতই মেয়েরা মাঝে মাঝে করিডরে স্লোগান দিত। কিংবা সভা

সমিতি করে তাদের বক্তব্য রাখত। অবন্তীর ভাল লাগতনা এসব। আন্দোলন ধর্মঘট স্লোগান কিংবা সভা সমিতির প্রতি কোনরকমক আকর্ষণ তো ছিলই না বরং তীব্র এক বিতৃষ্ণা কাজ করত তার মনে। রাজনীতি কিংবা সমাজনীতির ধ্বজাধারীদের ব্যক্তিগত আচার আচরণের মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য, অনেক বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ত তার সেই বয়সেই।

কলেজেও নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য দেখে তার মনে এসবের সম্বন্ধে একটা বিরূপতা তৈরি হয়েছিল। তবে সমীহ না করে উঁপায় ছিলনা। মনে মনে যতই অপছন্দ করুক মুখে এদের বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস ছিলনা তার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মানসম্মান বজায় রাখার তাগিদে এস. এফের সদস্য হয়েছিল সে। নিজের চামড়া বাঁচানোটাই একমাত্র কারণ ছিল তার। মনের দিক দিয়ে রীতিমত দূরত্ব বোধ করত অত্যুৎসাহীদের সঙ্গে।

ইউনিয়নবাজি, দলবাজি, কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি তার সেদিনও ভাল লাগতনা আজও ভাল লাগেনা। কিন্তু সেদিন যেমন কোন দলে না গিয়ে নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি আজও তেমন কোন ইউনিয়নের সদস্য না হয়ে নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি। চাকরিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছিনে জোঁকের মত পিছনে লেগেছিল ইউনিয়নের লোকেরা। শ্যামলীর কাছে শুনেছে তারও নাকি অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অতএব ইউনিয়নের সদস্য না হয়ে উপায় ছিলনা তারও।

অবন্তীরা আস্তে আস্তে খাচ্ছিলো। খুব নিবিষ্ট ভঙ্গীতে আলোচনা করছিলো ছেলেরা। মুহূর্তের মধ্যেই ওদের আলোচনার বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে ছিল দুজনের কাছে। নতুন একটি ছেলে এসেছে অ্যাকাউন্টস সেকশানে। ওকে দলে টানার জন্য চেষ্টা চালানোর কথা আলোচনা করছে ছেলেরা। কি ভাবে আলাপ করে ফন্দীফিকির করে ওর ঝোঁকটা বুঝে নেওয়া যেতে পারে সেকথা বুঝে নিতে বলছে বিপ্লব সামন্ত। অবন্তীর কানে আসল বিপ্লব উৎপলকে সোৎসাহে পরামর্শ দিচ্ছে।

শ্রমিক ইউনিয়নের আগেই তোমরা কব্জা করার চেষ্টা করো ওকে। অবশ্য শুভেন্দু বলছিল ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে খুবই ঘোড়েল চালু ছেলে। হয়ত বা কোনই লাভ হবেনা। তবু মনে রাখবে একটি সদস্য বাড়লেও ইউনিয়নের লাভ। অপর পক্ষে একটি সদস্যক হারালেও ঠিক ততটাই লোকসান।

উৎপল বলল---বিপ্লবদা আমি আর প্রতীপ আজ যাব ওর কাছে। তবে ওর সঙ্গে যে দু চারটে কথা হয়েছে তাতে মনে হয়েছে শুভেন্দুদার কথাই ঠিক। খুব চালু ছেলে। শ্রমিক ইউনিয়নে ওর খুঁটি বাঁধা আছে বলে মনে হয়। সকালে ওকে দেখেছিলাম বিভূতি ঘোষের সঙ্গে কথা বলতে।

লাঞ্চের সময় পার হয়ে গিয়েছিল। শ্যামলী তাড়া দিল অবন্তীকে।

—ওঠ অবন্তী। আমার হাতে কয়েকটা কাজ আছে। গিয়ে করতে হবে। অবন্তী উঠে পড়ল শ্যামলীর সঙ্গে। ওরা তাকিয়ে দেখল উৎপলরা আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। ওদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। ইউনিয়ন নিয়ে ওদের এত মাতামাতি দেখলে এখন খুব অবাক লাগে অবন্তীর।

ওদের অফিসে এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নটিই হোল স্বীকৃত ইউনিয়ন। শ্রমিক ইউনিয়নের আধিপত্য একেবারে নেই বললেই চলে। তবে দুটি ইউনিয়নের মধ্যে ঝগড়াঝাটি কম নেই তাবলে। উৎপলদের কাছেই অবন্তী শুনেছে যে সন্তোষদার বডিগার্ড আছে। রাখাল গুপ্ত ছায়ার মত সর্বত্র থাকে ওর পিছনে পিছনে।

ইউনিয়ন থেকে নাকি আগ্নেয়াস্ত্র কেনা হয় নানারকম হাঙ্গামা সামলাতে। দুটি ইউনিয়নেরই আগ্নেয়াস্ত্র সম্ভারের প্রয়োজন হয় বিরোধী ইউনিয়নের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য। তা সে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই হোক কিংবা আক্রমণ হানার প্রয়োজনেই হোকনা কেন।

এই অফিসে না এলে অনেক কিছু জানা বাকি থাকত তার। অফিসে ইউনিয়নের যে অফিস ঘরটি আছে সেখানে দু'একজন কর্মীকে দেখে অবাক হয়েছিল সে। শুনেছিল অফিসে কাজ করেনা তারা। ইউনিয়ন থেকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে তাদের। ইউনিয়নের স্বার্থরক্ষার তাগিদে।

পাড়ার মাস্তান দু'তিনটি ছেলেকে এনেছেন ইউনিয়নের চাঁইরা। ওরা এমনিতে চাকরি বাকরি পাচ্ছেনা। তার ওপরে মাস্তানির সুযোগ পাওয়া যাবে। অতএব লুফে নিয়েছিল সেই প্রস্তাব। রাখাল গুপ্তর মত গুণ্ডাকে রাখা হয়েছে বিরোধী ইউনিয়নকে ভয় দেখাবার জন্য। আর সন্তোষদাকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার জন্যও বটে।

এসব খবর একদিনে পায়নি অবন্তী। দীর্ঘদিন ধরে নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নানা জনের কাছে শুনে কিছুটা ধারণা হয়েছে তার এসবের সম্পর্কে। শ্যামলী আগে এসেছে। তার কাছেও শুনেছে অনেক কিছু। উৎপল, প্রতীপ, দেবব্রত, শুভাশিসদের কাছে থেকেও টুকরো টাকরা অনেক কিছু কানে এসেছে।

কর্মীদের স্বার্থরক্ষার কথা বলে ইউনিয়ন। স্বার্থরক্ষা অবশ্যই করে। সময়ে সময়ে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ইউনিয়নের যে সমস্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় সেগুলির দরুন অনেক রকম সুযোগসুবিধা ভোগ করে কর্মীরা। তা সত্ত্বেও অবিচার হয়, অন্যায় হয়। শুধু অনেকটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে বলে মাত্রাছাড়া হয়ে উঠতে পারেনা।

দুটি ইউনিয়নের মধ্যে ঝগড়াঝাটির ফায়দা ওঠাতে যথেষ্টই চেষ্টা করে

ম্যানেজমেন্ট। এসব সত্ত্বেও দুটো কিছুটা চোখে চোখে পাহারা দেয় ম্যানেজমেন্টকে। কর্মীদের যথেষ্ট মাশুল গুনতেহয় তার জন্য। নিয়মিত চাঁদা ছাড়াও প্রডাকটিভিটি বোনাস ইত্যাদির জন্য ইউনিয়নের অবদান বাবত ইউনিয়ন চড়া হারে টাকা দাবি করে কর্মীদের কাছে।

তা নিয়ে মতান্তর, কখনও মনান্তর ঘটে কর্মীদের সঙ্গে ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের। অবন্তী দেখেছে মাসে মাসে ইউনিয়ন যে টাকা দাবি করে প্রতিটি কর্মীর কাছে তার পরিমাণ বড় বেশী। কোন মতেই তা যুক্তিযুক্ত নয়। অনেক সদস্যর মধ্যেই তা নিয়ে ক্ষোভ গজিয়ে ওঠে। অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। তবু ভয়ে, স্বার্থচিন্তায় সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে পারেনা তারা। বরং শ্রমিক ইউনিয়নের দাবি অনেক কম।

এ ব্যাপারে বিভাদি মানে বিভা মুখার্জ্জী একবার ইউনিয়নের কাছে তার অসন্তোষ ব্যক্ত করেছিলেন। প্রভাসদা তখন বুঝিয়েছিলেন বিভাদিকে।

---মিসেস মুখার্জ্জী মনে রাখবেন আমাদের ইউনিয়ন স্বীকৃত ইউনিয়ন। আমাদের ইউনিয়নের অবদান অস্বীকার করতে পারবেননা আপনারা কেউই। এমনি এমনি সব কিছু সুযোগসুবিধা আদায় হয়না। আন্দোলন করতে হয় তার জন্য। বিভিন্ন সময়ে আমাদের ইউনিয়ন সেই আন্দোলন পরিচালনা করেছে। আজকে আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন সেখানে আপনাদের নিয়ে এসেছে আমাদের ইউনিয়নই। শ্রমিক ইউনিয়ন কতটুকু করেছে আপনাদের জন্য? ওরা কোন মুখে বেশী দাবি করবে?

বিভাদি একটু স্পষ্টবাদী। প্রভাস চৌধুরীকে অন্যরা যথেষ্টই সমীহ করে চলে। ইউনিয়নের রমরমা বা সাফল্যের মূলে প্রভাস চৌধুরীর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের অবদান কম নয়। প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন তিনি তার ইউনিয়নকে। নিজের হাতে গড়ে পিটে তৈরি করেছেন অনেক কর্মীকে।

অবন্তী শুনেছে প্রমোশন পর্যন্ত নেননি উনি ইউনিয়নের কারণে। ইউনিয়নের কাজকর্মে ব্যাঘাত পড়বে এই ভয়ে নিজের ব্যক্তিগত উন্নতি বা সুখসুবিধার প্রশ্নকে তুচ্ছ করেছেন।

বিভাদি নিজেও একাধিকবার শ্যামলীদের কাছে প্রভাসদার নিঃস্বার্থপরতার প্রশংসা করেছেন। বলেছেন 'তবু প্রভাসদার কথা সহ্য হয়। আর যাই হোক ওর মধ্যে ফাঁকি নেই। কিন্তু প্রদ্যোত গুহ কিংবা সুশোভন সমাদ্দার তো দারুণ ধান্দাবাজ। নিজেদের স্বার্থটি বজায় রেখে তবে ওরা এগোয়। ওদের কি অধিকার আছে উপদেশমৃত বিতরণের?

কিন্তু ইউনিয়নকে দেয় টাকার প্রশ্নে চুপ করে থাকেননি বিভাদি। অন্যদের মত ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকার লোক নন উনি। প্রভাসদার কথার প্রতিবাদ করেন তাই।

---টাকার অঙ্কটা কিন্তু বেশি প্রভাসদা। আমাদের ইউনিয়ন বড়। তার সদস্যসংখ্যা বেশি। যে পরিমাণ টাকা কর্মীদের কাছে থেকে আদায় করা হয় তা তো সামান্য নয়? এত বেশি দিতে হবে কেন সদস্যদের?

প্রভাসদা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

---ইউনিয়ন চালাতে কত টাকার দরকার হয় জানেননা? ইউনিয়নের আসবাবপত্র, তার নির্বাচন, আন্দোলন এসব বাবদ কম টাকা খরচ হয়? কোথায় থেকে আসবে এত টাকা যদি আপনারা হাসিমুখে সামান্য কিছু তুলে না দেন ইউনিয়নের হাতে?

বিভাদি তখন মুখ গোঁজ করে বলেছিলেন 'আজকাল কথায় কথায় যে টাকা দিতে হয় আমাদের তা মোটেই সামান্য নয়। আমাদের অনেকেরই গায়ে লাগে।'

এসব সমাচার অবন্তীকে শুনিয়েছিল বিভাদি নিজে। কলেজে অবন্তী যেভাবে ইউনিয়নকে এড়িয়ে যেতে পেরেছিল চাকুরিস্থলে তা পারলনা। ইচ্ছায় না হোক জড়িয়ে পড়তে হোল তাদের অনেককেই ইউনিয়নের সঙ্গে। তারা এখানে চাকরি করবে অথচ কোন ইউনিয়নের সদস্য হবেনা এ হতে পারেনা।

তার এখনও মজা লাগে একটা কথা ভাবতে। যেদিন তারা ইন্টারভ্যু দিতে এসেছিল যেদিন তাদের চা টা খাইয়েছিল ইউনিয়ন থেকে। তারা কেউ তখন অবশ্য জানতনা যে সেই সব ছেলেরা ইউনিয়নের হয়ে খাওয়াচ্ছে তাদের। তাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছিল ছেলেরা। বলেছিল---তার চায় তাদের চাকরি হোক। অ্যাপ্রেনটিসশিপ শেষ করাব পর চাকরি পাবেনা তারা---ইয়ার্কি নাকি? তারা তাদের হয়ে অবশ্যই লড়বে।

শ্যামলীকে একান্তে পেয়ে একসময় জানিয়েছিল অবন্তী সবকিছু। শুনেই হেসে উঠেছিল সে। বলেছিল---'ওসব ওদের চালাকি। একদম পাত্তা দিবিনা। চাকরি তোর হবেই। না হয়ে পারে না। সময়ের একটু হেরফেরা হতে পারে এই যা। কিন্তু ওদের ফাঁদে পা দিয়ে যদি ওদের কাকুতি মিনতি করিস তাহলে ওরা বেশ মোটা টাকা আদায় করবে তার জন্য'।

শ্যামলীর কথা শুনেছিল সে। ইউনিয়নের দ্বারস্থ হয়নি চাকরির জন্য। কিন্তু সদস্য হতে হয়েছিল তাকে ইউনিয়নের। দুই তিনটি ছেলে এসে ওকে খুব করে বুঝিয়েছিল।

---ইউনিয়নে না এসে পারবেন কি করে? মাথার ওপরে যদি ছাতা না থাকে তাহলে রোদ বৃষ্টি থেকে আপনাকে রক্ষা করবে কে? ইউনিয়ন আপনাদের

মাথার ওপরে ছাতা ধরে আছে। আপনাদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছে ইউনিয়ন। এখন আপনাকে বেছে নিতে হবে কোন ইউনিয়নে থাকবেন? আমাদের ইউনিয়ন হচ্ছে স্বীকৃত ইউনিয়ন। এই ইউনিয়ন আপনাদের স্বার্থ যেভাবে রক্ষা করবে অপর ইউনিয়নের পক্ষে তা কোনমতেই সম্ভব হবেনা। লোকবল বলুন, আন্দোলনের ইতিহাস বলুন আমাদের ইউনিয়নের সঙ্গে তুলনাই চলেনা অন্য ইউনিয়নের।

শুধু অবন্তীকে নয়। তার সঙ্গে অন্য যে সব ছেলেমেয়েরা চাকরি করতে এসেছিল তাদেরও একই কথা বলেছিল ইউনিয়নের ছেলেরা। দু'চারদিন পরে তারা অনেকেই সদস্য হয়ে গিয়েছিল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের। দু'একজন অবশ্য বেছে নিয়েছিল শ্রমিক ইউনিয়নকেই।

প্রথম যে নিরূপায় মনোভাব নিয়ে সদস্য হয়েছিল তারা পরে সেই মনোভাব অনেকখানিই পাল্টে গিয়েছিল নানা পরিস্থিতির সামনে পড়ে। নিজেদের দাবি দাওয়া কিংবা অনুরূপ আরও অনেক সমস্যা নিয়ে তারা অনেকেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জড়িয়ে পড়ছিল। বহিরাগতের মত উদাসীন নির্লিপ্ততা বজায় রাখা আর সম্ভব হয়নি পরে। তাছাড়া তারা না চাইলে কি হবে? ইউনিয়ন ছাড়বে কেন?

অবন্তী চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতে য়্যুনিফর্মের ব্যাপারে আন্দোলন শুরু করেছিল ইউনিয়ন। অবন্তীদের সামিল হতে হয়েছিল সেই আন্দোলনের। স্লোগানে গলা মেলাতে হয়েছিল তাদের। আধ ঘন্টা করে কর্মবিরতি পালন করতে হয়েছিল।

বলাবাহুল্য ইউনিয়নের কার্যকলাপ শুধু আন্দোলন, দাবিদাওয়া আদায় কিংবা লড়াইয়ের প্রস্তুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। মাঝে মাঝে ব্যবস্থা করা হোত প্রমোদানুষ্ঠানের। বিখ্যাত গাইয়েরা আমন্ত্রিত হতেন। সেই সব উৎসবের অনুষ্ঠান যোগদান করে নির্ভেজাল আনন্দের স্বাদ পেত কর্মীরা।

নানা ভাবে এখন তারা সকলেই জড়িয়ে পড়েছে ইউনিয়নের সঙ্গে। তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে এই ইউনিয়ন যে আজ আর তাকে অস্বীকার করার কথা বলতে পারেনা তারা।

তবু কোন কোন ঘটনায় মনে ধন্দ লাগে। তাদের মনে বিচিত্র সব প্রতিক্রিয়া হয়।

সিঁড়ির মাথায় উঠে অবন্তী সে কথাই বলল শ্যামলীকে।

—দেখেছিস শ্যামলী কিভাবে নতুন ছেলেমেয়েদের বাগিয়ে নিতে চেষ্টা করে ইউনিয়ন? বিভাদি ঠিক কথাই বলেন। সদস্য বাড়াবার জন্য বড় বেশী হ্যাংলামি

করে ইউনিয়ন। আমরা এসব একদম ভালো লাগেনা।

শ্যামলী হাসে।

—তোর আমার ভাল না লাগলে কি হবে? ইউনিয়ন এ ভাবেই সদস্য বাড়াবে। যত সদস্য বাড়াবে ধনে মানে তত শ্রীবৃদ্ধি হবে তার। অনেক কিছু সত্যিই মেনে নেওয়া যায়না। কিভাবে সদস্য ভাঙ্গিয়ে নেয় তা যদি দেখতিস? অবশ্য নিজেদের থেকেও দলছুট হয়ে চলে আসে অনেকে অন্য ইউনিয়নে।

এ খবর জানতানা অবন্তী। শুনে অবাক হলো। চক্ষু বিস্ফারিত করে শ্যামলীকে প্রশ্ন করে সে।

—তাই নাকি? আশ্চর্য তো? দলছুট হয়ে আসতে লজ্জা করেনা ওদের?

লজ্জা? আজকাল লজ্জা ঘৃণা ভয়কে অকেজো মনে করে জঞ্জালের বালতিতে ফেলে দিয়েছে লোকে? সুরঞ্জনকে দেখেছিস তো? ছেলেটা এমনিতে খারাপ নয়। মিশুকে, পরোপকারী। তবে ভয়ঙ্কর চালাক। ওর ওরকম নিষ্পাপ ভালমানুষের মত চেহারা দেখলে মনেই হবেনা অতশত বোঝে। আগে ও শ্রমিক ইউনিয়নে ছিল। আমাদের ইউনিয়নে এসেছে পরে। ও বলে যে শ্রমিক ইউনিয়নের অনেক কিছু ওর ভালো লাগেনি। সেজন্যই চলে এসেছে ঐ ইউনিয়ন ছেড়ে। কিন্তু লোকে অন্য কথা বলে। ও নাকি আমাদের ইউনিয়নে এসেছে সুবিধার জন্য। অন্য কোন কারণে নয়।

এ খবরটা জানা ছিলনা অবন্তীর। সুরঞ্জনের সঙ্গে ওর আলাপ আছে। ছেলেটা ওর সমবয়সী। দেখলে অবশ্য বয়সে ওকে ছোটই মনে হয়। ওর কাছে ইউনিয়নের অনেক কুকীর্তির কথা শুনেছে ও। নেতাদের মধ্যে দলাদালি, ক্ষমতার লড়াই নিয়ে আলোচনা করছিল একদিন ও অন্য একটি ছেলের সঙ্গে। অবন্তীর কানে গিয়েছিল কয়েকটি কথা।

অবন্তীকেও একদিন উপদেশ দিয়েছিল ও। অবন্তীর সঙ্গে চাঁদার ব্যাপরে কথা কাটাকাটি হয়েছিল ইউনিয়নের পাণ্ডা গোছের একটি ছেলের সঙ্গে। পরে অবন্তীকে সতর্ক করে দিয়েছিল সুরঞ্জন।

—আপনি এভাবে তর্ক করবেননা। ওদের ক্ষমতা কত জানেননা তো? আপনাকে ঝামেলায় ফেলে দেবে। একটু সমঝে বুঝে চলবেন। ওরা যে কি পারে আর কি পারেনা তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেননা। মেয়ে বলে রেহাই দেবেনা।

অবন্তী প্রশ্ন করেছিল।

—তেমন ঘটনা কিছু ঘটেছে কি?

সুরঞ্জন দমেনি। বলেছিল—'অনেক কিছুই ঘটেছে। আমি খুব কাছের থেকে দেখেছি সেসব। এসব নেতারাও কত নীচে নামতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাসই হবেনা।

অবন্তী জানতনা সুরঞ্জন আগে অন্য ইউনিয়নে ছিল। ও ভেবেছিল তাদের ইউনিয়নের কথা বলছে সুরঞ্জন।

সেজন্য স্বভাবিক কারণেই সে একটি প্রশ্ন করেছিল সুরঞ্জনকে।

—অন্য ইউনিয়নও একই রকমের? না কোন পার্থক্য আছে?

প্রশ্নটার জবাব সোজাসুজি না দিয়ে খানিকটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল তখন সুরঞ্জন। বলেছিল 'ঐ উনিশ বিশ আর কি?'

তখনকার মত চাপা পড়ে গিয়েছিল সেই প্রসঙ্গ। শ্যামলীর কথা শুনে সেটা মনে পড়ল অবন্তীর। সেদিন সুরঞ্জন তাকে একেবারে জন্যও বলেনি ও অন্য ইউনিয়ন থেকে এসেছে তাদের ইউনিয়নে। সে প্রসঙ্গ না তুলে কেমন সুকৌশলে ও ইউনিয়নের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে গেছে ভেবে অবাক হচ্ছিল অবন্তী। শ্যামলী কিন্তু আমল দিলনা। বরং অবন্তীর বিস্ময় দেখেই বিস্মিত হোল।

—এত অবাক হচ্ছিস কেন অবন্তী? আগ বাড়িয়ে বলতে যাবে কেন ও অন্য ইউনিয়ন থেকে চলে এসেছে? আমি হলেও বলতাম না।

একটু বিব্রত বোধ করে অবন্তী।

—না ব্যাপারটা তা নয়। আসলে অতক্ষণ অতগুলো কথা বলে গেল। কিন্তু ঐ ব্যাপারটার কথা বেমালুম চেপে গেল কি ভাবে সেটা ভেবেই অবাক লাগছে আমার। আমি কিন্তু চেপে রাখতে পারতামনা।

—তোর মত বোকা হবে নাকি সকলে? ওরা সব চালাক ছেলে। যা কিছু করে বা বলে বুজে সুঝে করে। তুই এখনও অনেক ছেলেমানুষ আছিস। অনেক কিছু দেখা শোনা আর জানা বাকি আছে তোর। তুই কি জানিস শ্রমিক ইউনিয়নের রাধেশ্যাম তেওয়ারী আসলে কট্টর কংগ্রেস সমর্থক? ইন্দিরা গান্ধীর দারুণ ভক্ত ছিল ও। ইন্দিরা মারা গেলে দারুণ কষ্ট পেয়েছিল। অথচ এখানে বামপন্থীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। আবার আমাদের ইউনিয়নে এমন অনেক ছেলেমেয়ে আছে যার মার্কসবাদী। ভোট দেয় তারা মার্কসবাদীদেরই। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রয়োজনে শ্রমিক ইউনিয়নে না গিয়ে এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নেব সদস্য হয়েছে। এসব শুনে কি মনে হচ্ছে তোর? সব কিছু কেমন খেলা খেলা মনে হচ্ছেনা?

অবন্তী সায় দেয়।

---তা ঠিক। মনে হচ্ছে মতাদর্শ রাজনীতি সবই যেন গৌণ ব্যাপার। মুখ্য হচ্ছে নিজেদের প্রয়োজন বা স্বার্থসিদ্ধি।

শ্যামলী শব্দ করে তারিফ করে।

---বাঃ চমৎকার! অফিস তোকে তৈরি করেছে ভালই। অনেক কিছু বুঝতে শিখেছিস, ভাবতে শিখেছিস।

---তাহলে তোর 'বোকা' অপবাদটা ফিরিয়ে নে। ওটা অপপ্রয়োগ হয়ে যাচ্ছে কিনা বল?

---সত্যিই তো! ঠিক আছে ফিরিয়ে নিলাম আমার কথা। তুই একেবারে বোকা নোস। ভীষণ চালাক।

ঘরে এসে অবন্তী দেখে চন্দ রাগতভাবে কি যেন বলছেন বিজিতদাকে। নিজের টেবিলে বসে বাকি কাজগুলো সারতে থাকে সে। কিন্তু ঠিক যেন মন দিতে পারেনা। কাছে পিঠে উত্তেজিত হয়ে কেউ কিছু বলছে অথচ তার সারমর্ম বোধগম্য হচ্ছেনা এরকম অবস্থায় কেমন যেন স্বস্তি বোধ করা যায়না। তীব্র এক অস্বস্তি চেপে ধরে।

মিসেস চন্দ তাকে খুবই ভালবাসেন। বয়স্কা মহিলা। পঞ্চাশোর্ধ্বে বয়স। চেহারা বা সাজসজ্জা দেখে বয়স ধরা যায়না। কট্টর বামপন্থী। উঠতে বসতে কংগ্রেসের মুণ্ডপাত করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনা না করলে পেটের ভাত হজম হয়না যেন। আর ঠিক সেই অনুপাতে মাত্রারিক্ত অনুরাগ রয়েছে তার বামপন্থী রাজ্য সরকারের প্রতি।

শ্রমিক ইউনিয়নের অত্যন্ত অনুগত এই সদস্যাটি কিন্তু অবন্তীকে খুব ভালবাসেন। অনেকটা মায়ের মত সস্নেহ মনোভাব প্রকাশ পায় তার অবন্তীর প্রতি আচরণে। যে কোন সামান্য উপলক্ষেও এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল না ঝাড়তে পারলে শান্তি পাননা তিনি। এরমধ্যে বহুবার সেরকম প্রমাণ পেয়েছে অবন্তী।

অবন্তীর প্রতি প্রথম থেকেই কেমন যেন একটা দুর্বলতা জমে গেছে তার। অন্যরাও তা বোঝে। অবন্তীর তো কথাই নেই। মিসেস চন্দকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঠিকই বলবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রশ্ন করা যায়না। অথচ উঁচিয়ে ওঠা কৌতূহল কিংবা অস্বস্তির তাড়না কিছুতেই যেন রোধ করা যাচ্ছেনা।

এই একটি ব্যাপারে অসুবিধা আছে অবন্তীর। এমনিতে সে তেমন কৌতূহলী স্বভাবের নয়। অপরের কথা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জানতে চায়না। কিন্তু সামনে যদি এমন কোন ঘটনা অনুষ্ঠিত হয় যা যে দেখে বুঝতে পারছেনা কিংবা তার কানে

অসংলগ্নভাবে টুকরো টুকরো যে সব কথা আসছে তার থেকে কোন বিশেষ অ স্পষ্ট হয়ে উঠছেনা তাহলে বড় অস্বস্তি বোধ করে সে।তে

একটু পারেই অবশ্য বোধগম্য হলো ব্যাপারটা। বিজিত নিয়োগী মৃদুস্বরে কি যেন বলতে গেলেন মিসেস চন্দকে কিন্তু মিসেস চন্দ তাতে নরম হলেননা। বে জোর গলাতেই নিজের অসন্তোষ ব্যক্ত করলেন তিনি।

—দেখুন আমাকে এসব বোঝাতে আসবেননা। ঘাসে মুখ দিয়ে চলিনা আমি পঁচিশ বছরের ওপর কাজ করছি এখানে। আমাকে যা বলবেন তাই মেনে নেব নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছিনা আমি? বেছে বেছে কয়েক জনকেই খাি 'ওভারটাইম' দেওয়া হচ্ছে। এ জিনিষ হবে কেন?

অবন্তীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল ব্যাপারটা। বিজিতদার সঙ্গে কেন এমনভা কথা বলছেন তিনি তা বুঝতে পারল সে। মাত্রছাড়া অর্থগৃধ্নুতা রয়েছে মিসে চন্দর। স্বামী স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ বিলেতফেরৎ ডাক্তার। পার্ক স্ট্রীটে চেম্বার রয়ে ভদ্রলোকের। থাকার মধ্যে আছে একটি মেয়ে। শ্বশুর শাশুড়ী বহু আগেই গত দেওর ননদ ভাসুররা সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত। মিসেস চন্দের বাপের বাড়ির অবস্থা খুবই ভাল। অতএব কি বাপের বাড়ি, কি শ্বশুর বাড়ি কোথায়ও কোন দায়দায়ি বহনের প্রশ্ন ওঠেনা।

মিসেস চন্দ নিজে কম উপার্জন করেননা। তবুও ওভারটাইমের জন্য পাগ হয়ে ওঠেন। এ ব্যাপারে মাত্রাছাড়া নির্লজ্জতা আছে ওর। বেশির ভাগ সময়ে উনি ঠিক জুটিয়ে নেন ওভারটাইম। কিন্তু কখনও কখনও তার ব্যাত্যয় ঘটে অসম্ভব ক্ষেপে ওঠেন। প্রায় চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন। যারা ওভারটাই পেয়েছে ঠারে ঠোরে তাদের আক্রমণ করতে শুরু করে দেন।

অবন্তীর কাছে খুব বিস্ময়যোগ্য মনে হয় ব্যাপারটা। অত টাকা দিয়ে কি করবেন উনি? কে খাবে ওর টাকা? তিনজন তো লোক পরিবারে। দুজনে উপার্জনক্ষম। একটি মাত্র মেয়ে। তার জন্য কত টাকার প্রয়োজন?

সংসারে টাকা থাকা কত দরকার তা অজানা নেই অবন্তীর। বাবার মৃত্যু পর থেকে তাদের সংসারে শুরু হয়েছে অভাব অনটন। দাদা হাল না ধরলে কি হোত ভাবা যায়না। এখন অনেকদিন ধরেই তাদের সেই অভাব অনটন আ নেই। তবে অর্থের প্রয়োজন ভালই বোঝে সে।

এখানে না এলে অর্থের লালসা কিভাবে পেয়ে বসে মানুষকে তা সে ধারণা করতে পারতনা। তাদের তেল কোম্পানি যা মাইনে দেয় তা যথেষ্টই লোভনীয় আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধাও কিছু কম নয়। অর্থের লালসা তবু যেতে চায়

কারুরই। অর্থের ধান্দা ছাড়া আর কোন কিছুতেই যেন উৎসাহ নেই কারুর। সকলেই যেন বুঝে গেছে দুনিয়ার সার বস্তু হচ্ছে অর্থে। অতএব তাদের সমস্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা আর চিন্তাভাবনা যেন অর্থোপার্জনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে।

এসব সত্ত্বেও কোন কোন মানুষের অর্থলালসার বহর দেখলে সবিস্ময়ে মনে হয় কেবলমাত্র একটি কথা। এত লালসা কেন অর্থের জন্য? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা মানুষকে?

মিসেস চন্দের অসন্তোষ দেখে আজও সেই এক কথা মনে হোল অবন্তীর। ওঁর তো টাকার অভাব নেই? লজ্জা করেনা ওভারটাইমের জন্য এভাবে হাহুতাশ করতে?

বিজিতদা একটু পরে কাজে অন্যত্র চলে গেলে মিসেস চন্দ চলে এলেন অবন্তীর কাছে।

---অন্যায়টা দেখেছ? প্রত্যেকবার বাঁধা খরিদ্দরদের জন্য তোলা থাকবে ওভারটাইম। কিন্তু এ জিনিষ বরাবর চলবে কেন?

অবন্তীর মনে উদগত হয়েছিল লাগসই একটি জবাব।

—কেন আপনিও তো কম ওভারটাইম করেননা? অন্যদেরও তার জন্য রাগ হতে পারে নিশ্চয়?

আরও বলতে ইচ্ছা করছিল---'এত টাকা টাকা 'বাই' কেন আপানাদের চন্দদি'? কিন্তু ওঁকে বলা যায়না এসব কথা। শুধু বয়োজ্যেষ্ঠ বলে নয়। অবন্তীকে উনি দারুণ ভালবাসেন। মাঝে মাঝেই বাড়ি থেকে এটা সেটা উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী এনে খাওয়ান। এর মধ্যে বাইরে বেড়াতে গিয়ে নিয়ে এসেছেন ছোটখাট উপহার পর্যন্ত।

একবার খুব সুন্দর একটা দামী সাউথ ইণ্ডিয়ান সিল্কের শাড়ী পরে অফিসে এসেছিলেন মিসেস চন্দ। অবন্তী ওর শাড়ী দেখে খুব তারিফ করেছিল বলে পরের দিনই ওটি প্যাকেটে করে নিয়ে এসেছিলেন অফিসে। অবন্তীকে অনুরোধ করেছিলেন ওটি পরতে। বলেছিলেন —'তোমাকে খুব মানাবে। আমার থেকে অনেক বেশি।' অবন্তীর আপত্তি কানে নেননি। তাকে আসতে হয়েছিল শাড়ী পরে। অন্যরা তো তারিফ করেছিলই। উনিও খুব তারিফ করেছিলেন।

শ্যামলীরা কয়েকজন পরে তা নিয়ে আড়ালে রঙ্গরসিকতা করেছিল। বলেছিল-—'ওকে তো কোনদিন কাউকে নিয়ে এমন আদিখ্যেতা করতে দেখিনি? যদি মেয়ে না থাকত তাহলে নয় ভাবতাম যে মেয়ের মত দেখছেন। ছেলেও নেই যে ভাবব

ছেলের বউ করতে চাইছেন তোকে। ব্যাপারটা কি বলত?'

শুধু তাই নয়। কট্টর সি. পি. এম. সমর্থক মিসেস চন্দ খুব একটা পরমতসহিষ্ণু নন। এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নকে মাঝে মাঝেই বাঁকা কটাক্ষ করেন উনি। সদস্যদের সঙ্গেও তার ব্যবহার অনুরূপ। কিন্তু অবন্তীর সাত খুন মাপ। সে যে এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সদস্য সেকথা যেন ইচ্ছা করেই মনে রাখেননা উনি। অবন্তীর সঙ্গে পারতপক্ষে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেননা। কালে ভদ্রে যদিও বা অসতর্ক ভাবে গায়ের ঝাল ঝাড়েন তখন অবন্তীও কোন জবাব দেয়না তার।

এইসব কারণেই অবন্তী কিছু বলতে পারেনা মিসেস চন্দকে। মনের কথা মনের মধ্যেই বিজিবিজ করতে লাগল। তা আর বাইরে ব্যক্ত হতে পারলনা। বেশিক্ষণ অবন্তীর কাছে বসলেননা মিসেস চন্দ। হয়ত অবন্তীর নীরবতা ভাল লাগলনা। একটু যেন মনুঃক্ষুণ্ণ হয়েই চলে গেলেন তিনি নিজের সীটে। একটু পরে অবন্তী দেখল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বাড়ি ফেরার সময় শ্যামলীকে পেলনা অবন্তী। হাতের বকেয়া কাজ সারতে একটু দেরী হবে ওরং। অবন্তীর খুব মাথা ধরেছিল। ও আর থাকতে পারছিলনা। লিফটের কাছে এসে দেখে রজব আলী দাঁড়িয়ে।

---কি ব্যাপার? বন্ধু কোথায়?

---ওর দেরী হবে। আমার শরীরটা ভাল লাগছেনা। তাই ওকে বলে চলে এসেছি।

---শরীর ভাল নেই তা অত কাজ করেন কেন? আমার কথা তো কানে নেবেননা! কি হবে অত খেটে? কোন লাভ নেই। শুনলেন না মিসেস চন্দ কি বললেন? সব সুবিধা তোলা আছে কয়েকজন বাঁধাধরা লোকের জন্য। যদি মিসেস চন্দের মত চিৎকার চেঁচামেচি করতে পাবেন তাহলে অবশ্য আপানাকে বাধ্য হয়েই কিছু না কিছু দিতে হবে। দেখলেন না দরবার করতে চলে গেলেন কি রকম? দেখবেন ঠিক আদায় করে আনবে ওভারটাইম।

অবন্তীর ভালো লাগেনা কথাটা। ও প্রতিবাদ করে।

---সেটা কি করে বলছেন আপনি?

---আমি কি করে বলছি?

শব্দ করে হাসে রজব আলী।

---ভদ্রমহিলাকে বহু বছর ধরে চিনি আমি। ওর স্বামী আর শ্বশুরকে চিনি। খুব ভাল ছাত্র ছিলেন ওর স্বামী। বাইরে টাইরে ঘুরে এসেছেন। ইচ্ছা করলে

ভাল অধ্যাপক হতে পারতেন। কিন্তু বাপের ব্যবসা নিয়ে এমন মত্ত হয়ে গেলেন যে ওসব শিকেয় উঠল। টাকার মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছেন এরকম। তবু দেখুন ভদ্রমহিলার কি অর্থলিপ্সা।

অবন্তী ভয় পায়। কেউ যদি এসব শোনে ভাববে অবন্তীও বুঝি রজব আলীর সঙ্গে সমান তালে যোগ দিচ্ছে। ওকে যে ধরে বেঁধে এসব কথা শোনাচ্ছেন উনি তা অন্য লোকে বুঝবে কি করে?

রজব আলীকে বাধা দিতে চেষ্টা করে ও।

—থাকনা মিঃ আলী। যে যার মত আছে। আমাদের কাজ কি তাদের নিয়ে আলোচনা করা?

রজব আলী নিবৃত্ত হয়না। সোৎসাহে পূর্বে প্রসঙ্গের জের টেনে চলে।

—কথাটা ঠিকই বলেছেন। তবে কি জানেন আমাদের অফিসটা একটা চিড়িয়াখানা। বেশিদিন হয়নি আপনার এখানে। আস্তে আস্তে সব বুঝবেন। আপনি কি শুনেছেন বিবাহ বার্ষিকীতে বাড়িতে না থেকে কেউ ছুটির পর ওভারটাইম করে ইচ্ছা করে? বাড়িতে নিমন্ত্রিতরা অপেক্ষা করছে। কিন্তু গৃহকর্তী অনুপস্থিত। বাড়তি রোজগারের ধান্দায় অফিসে পড়ে আছেন।

আত্মবিস্মৃত হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে অবন্তী।

—সে কি? এমনতো কখনও শুনিনি?

বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রজব আলী।

—তবে আর বলছি কি? ছুটির দিনে পর্যন্ত রাত্রি ন'টা দশটা পর্যন্ত অফিস কামড়ে পড়ে থাকেন ভদ্রমহিলা। আজব দুনিয়ার অনেক আজব চরিত্রকে দেখতে পাবেন আমাদের অফিসে। আর কিছুদিন যাক। নিজেই দেখবেন শুনবেন বুঝবেন।

বাড়ি ফেরার পথে রজব আলীর কথা ভাবছিল অবন্তী। পাগলছাগল বলে লোকে গ্রাহ্য করেনা। অফিসে কোন কাজ করতে দেওয়া হয়না তাকে। অথচ কেমন বিজ্ঞ দার্শনিকের মত কথা বলছিল। মনেই হয়না ভদ্রলেকের মাথায় গোলমাল আছে। মিসেস চন্দের সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন। ওর কাছেই একবার শুনেছিল ভদ্রমহিলার স্বামী ওর সহপাঠী ছিলেন। মিসেস চন্দ কিন্তু কোনদিন সেই পরিচয়ের কথা বলেননি মুখ ফুটে।

মিঃ আলী অফিসে আজব দুনিয়ার অনেক আজব চরিত্রকে দেখেছেন। অবন্তী যদি হিম্মত দেখিয়ে বলত—'মিঃ আলী আপনিও তো অনেকের কাছেই একটি আজব চরিত্র।' তাহলে কেমন প্রতিক্রিয়া হোত তার মনে?

বাড়িতে এসে সদর দরজা খোলা পেল অবন্তী। বাইরের ঘর পার হয়ে

ভেতরের বারন্দায় পা দিয়েই নারী পুরুষের মিলিত কণ্ঠে গানের আওয়াজ কানে এল। আওয়াজ আসছে দাদার ঘর থেকে। মেয়ের গলাটা নিঃসন্দেহে বৌদিরই হবে। কিন্তু পুরষকণ্ঠটি তার ছোড়দার। দাদার ঘরে বৌদির সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছে তার ছোড়দা।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সে। ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অবন্তী। বৌদির ঘরের দরজা ভেজানো। কাউকেই দেখতে পাচ্ছিলনা সে। কিন্তু অভাবিত ত্রাসে তার বুকের ভিতরটা হাপড়ের মত ওঠানামা করতে লাগল। তার দাদা কয়েকদিন জ্বরভোগের পর মাত্র পরশু থেকে আবার দোকানে যাচ্ছে। অথচ দুজনের মিলিত কণ্ঠের গান আর হাসির আওয়াজে উৎসবের পরিবেশ যেন বিরাজ করছে সেই ঘরে।

অবন্তী ঠায় দাঁড়িয়ে রইল একভাবে। একটু পরেই গান থেমে গেল। ছোড়দার গলা কানে এল তার। কিন্তু কথাগুলো বোধগম্য হলোনা। সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছল গলায় হেসে উঠল তার বৌদি। পরক্ষণে তার বৌদির গলা কানে আসে।

—এই কি হচ্ছে? খুব অসভ্যতা করছ দেখছি! হাত সরাও হাত সরাও বলছি.....

আর কিছু বুঝতে বাকি রইলনা। চোখের সামনে কোন দৃশ্য প্রত্যক্ষ না হলে কি হবে? তার শ্রবণেন্দ্রিয় যতটুকু সংগ্রহ করল তাতে সামনের কুয়াশা সরে গেল। ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায়, লজ্জায় ত্রাসে অস্থির বোধ করতে লাগল অবন্তী।

অনেক জট খুলে গেল তার মনে। তার ভালমানুষ শান্ত স্বভাবের দাদার বিষণ্নতার উৎস স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারল সে। শুধু তাই নয়। আরও অনেক রহস্য যেন একটু একটু করে উন্মোচিত হতে লাগল। তার দিদির ক্ষিপ্ততা, ছোড়দা আর বৌদির দিদির ওপর আক্রোশ সব কিছু এক সূত্রে গাথা মনে হতে লাগল। অবন্তী ভাবল তার ভালমানুষ মা কি জানেন? কিন্তু মায়ের কথাবার্তা কিংবা আচরণ বিশ্লেষণ করে তার কোন প্রমাণ খুঁজে পেলনা।

অতঃপর এই সংসারে শান্তি কিভাবে ধূলিসাৎ হবে তা ভেবে ভীষণ আতঙ্কে তার শিউরে উঠতে লাগল। নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোতে যাচ্ছে এমন সময় বৌদির ঘরের দরজা খুলে গেল। বাইরে বেরিয়ে এল ছোড়দা। তার পেছনে অসম্বৃতবাসা বৌদি। অবন্তীকে সামনে দেখে একটু যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল অরণী। তবু মুখে দাপট দেখিয়ে সতেজে প্রশ্ন করল।

—তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?

স্থির চোখে ছোড়দাকে লক্ষ্য করে জবাব ছুঁড়ে দিল অবন্তী।

---আমি আবার কি করেছি?

সে আর অপেক্ষা না করে এগিয়ে যাচ্ছিল নিজের ঘরে দিকে। ঠিক সেইসময়ে চোখ পড়ল তার মায়ের দিকে। দিদির হাত ধরে ছাত থেকে নীচে নামছেন তিনি। যথারীতি ভাবলেশশূন্য মায়ের মুখ। কিন্তু অরণীকে দেখামাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল অরুন্ধতীর মুখের চেহারা। অরণী দ্রুতপায়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল বলে আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলনা।

অবন্তীর মনে সংশয় দেখা দিল। তার মা কি কিছুই জানেনা বা বোঝেননা? সে না হয় বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকেনা বলে অনেক কিছু বুঝতে পারেনি। দিদির ক্ষিপ্ততা দেখেও তো কিছু অনুমান করা উচিত ছিল মায়ের। সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল আরেকটি প্রতিযুক্তি। সে নিজেও তো বুঝতে পারেনি কিছু। তার দিদি হঠাৎ কেন বৌদি আর ছোড়দার ওপরে এতটা মারমুখী হয়ে উঠেছে তার কারণ সে নিজেও তো খুঁজে বেড়িয়েছে এতদিন।

তারা ভেবেছিল বৌদিকে দেখে দিদির বিয়ের ইচ্ছেটা বেড়েছে। কিন্তু তাদের বাড়িতে এরকম একটা কুৎসিত অবৈধ সম্পর্ক যে গড়ে উঠছে তাতো অনুমান করতে পারেনি তারা? দাদার অস্বাভাবিক বিষণ্ণতা আর গাম্ভীর্যের কথা মনে পড়ছিল তার। মনে হচ্ছিল দিনের পর দিন নিঃশব্দে গরল পান করে আসছে তার দাদা। নীলকণ্ঠের মত সেই বিষ ধারণ করে আছে সে। বিষে বিষে নীল হয়ে গেছে তার সমস্ত শরীর মন। এই বিষ সে না পারছে হজম করতে না পারছে উগরে ফেলতে।

অতঃপর কি হবে ভাবতে গিয়ে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল অবন্তীর। গানের ধ্রুবপদের মত বারবার আনাগোনা করতে লাগল একটি চিন্তা তার মনে। 'দাদাকে বাঁচাতে হবে। দাদাকে বাঁচাতে হবে'।

দাদার অদৃষ্টের এই ভীষণ মারের কাছে অত্মসমর্পণ করতে দেবেনা সে। দরকার হলে নিজে রুখে দাঁড়িয়ে তার মোকাবিলা করবে বরং।

আট

অফিসে এসে যথারীতি ফাইল নিয়ে বসেছিল অবন্তী। কিন্তু কাজে মন লাগাতে পারছিলনা। গতকাল সন্ধ্যার ঘটনাটা মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছিলনা। ইচ্ছা করছিল শ্যামলীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করে। কিন্তু মনে হোল আকাশের দিকে থুতু ছুঁড়লে সেটা যে নিজের গায়েই এসে পড়ে। তাব নিজের ছোড়দা আর বৌদিকে নিয়ে অপরের সঙ্গে আলোচনা

করবে? ছোট হয়ে যাবেনা সে শ্যামলীর কাছে?

অবন্তী জানে শ্যামলী পেটআলগা নয়। বিশ্বাসের অমর্যাদা সে কখনই করবেনা। আর অপরের সঙ্গে রসিয়ে কুৎসা গাইবার মত নীচ মানসিকতা তার নেই। কিন্তু নিজেকে মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কি শক্ত হাতে বন্ধ করে দিতে পারবে সে? তার মনে হবেনা অবন্তীর পরিবার কি অদ্ভুত? এইসব চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত অবন্তী ঠিক আপাততঃ সে শ্যামলীকে এ ব্যাপারে কিছুই বলবেনা।

মিসেস চন্দ তার দিকে তাকিয়ে রসিকতা করলেন।

---আজ এত উদাস ভাব কেন অবন্তী? রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা? বসিয়ে বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহারো কথা?

জোর করে হাসি আনল মুখে অবন্তী।

---ইচ্ছে থাকলেও কি উদাস থাকতে পারি? কাজের ঠেলায় প্রাণান্ত। আমাদের তেল কোম্পানি মাইনে ভাল দেয়। তবে ঘাড়ে ধরে কাজটুকু করিয়ে নেয় ঠিক। উদাস আনমনা ভাব বাপ বাপ করে পালিয়ে যাবে এখানে এসে। আর বিরলে থাকার উপায় কই? চারপাশে তো গিজগিজ করছে মানুষ।

মিসেস চন্দ ফাঁক খুঁজে নেন কথার মধ্যে।

----তাই নাকি? সত্যিই তোমার প্রাণান্ত অবস্থা তাহলে? বিরলে থাকতে পারছনা? আমাদের মুখগুলো দেখতে হচ্ছে কেবলি?

অবন্তী আর কথা বাড়ালনা। চেষ্টা করে অল্প একটু হাসল। কথা বলতে ইচ্ছা করছিলনা ওর। মাথার মধ্যে একটা ছবি একেবারে গেঁথে গিয়েছিল যেন। দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে তার ছোড়দা। পাজামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে। চকচকে মুখে সুখের উজ্জ্বলতা গড়িয়ে পড়ছে যেন। পেছনে দেখা যাচ্ছে অসম্বৃতবাসা বৌদিকে। ছোড়দার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। পলকের দৃষ্টিপাতেই চোখে পড়ছিল অন্তর্বাসহীন শরীরে ব্লাউজের প্রথম বোতামটা খোলা।

অবন্তী ভেবে পাচ্ছিলনা কিভাবে শুরু হয়েছে তার ছোড়দা আর বৌদির এই অবৈধ স্পর্ক? এতগুলি লোকের চক্ষু এড়িয়ে কি করে সম্ভব হলো সেটি? তার পাগল দিদি নিশ্চয়ই কিছু দেখেছে। আর অপ্রকৃতিস্থ হয়েও অশোভন বিকৃত জিনিষ মেনে নিতে পারেনি। মারমুখী হয়ে প্রতিবাদ করেছে তার।

কিছুদিন ধরেই যেন সে একেবারেই সহ্য করতে পারছেনা তাদের দুজনকে। একসঙ্গে দেখলেই মুখের ভাবটা কেমন শক্ত হয়ে ওঠে। শিকারী পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গী ফুটে ওঠে মুখেচোখে। চোখের দৃষ্টি হয়ে ওঠে হিংস্র, ক্রুর।

সে ভাবছিল তার দাদার চোখেও নিশ্চয়ই কোন না দৃশ্য ধরা পড়ে গেছে।

দুঃসহ লজ্জা অপমান আর মনঃকষ্টে ভেঙ্গে পড়েছে তাই তার শরীর। তার দাদা যদি অতটা চাপা আর ভালমানুষ স্বভাবের না হতো তাহলে হয়ত অনেক আগেই ফয়সলা হতে পারত ব্যাপারটার।

অবশ্য কিই বা ফয়সলা হোত? জবরদস্তি করে কোন সম্পর্ক ভাঙ্গা বা তৈরি করা যায় না। অবন্তীর অবাক লাগছিল ভেবে তার দেবতুল্য দাদাকে ভাল না লেগে বৌদির ভাল লাগল ছোড়দাকে। তার ছোড়দার চেহারা খুবই সুন্দর নিঃসন্দেহে। আর সে যথেষ্ট রকম সচেতনও বটে। এই দৈহিক সৌন্দর্য অপরের চোখে প্রকট করার কলাকৌশলও তার অজানা নয়।

কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি বৌ সব রকম প্রচলিত সংস্কার কিংবা নীতি নৈতিকতা অগ্রাহ্য করে এরকম একটা বিকৃতির পাকে জড়িয়ে পড়বে ভাবা যায়না। বৌদিকে দেখে এরকম মনে হয়নি তার আদৌ।

আর একটি কথা ভাবলেও অবাক হয়ে যায় সে। অর্চনার চেহারা বড়জোর সুশ্রী বলা চলে। সুন্দর সে কোন মতেই নয়। তার ছোড়দার মত সৌন্দর্যসচেতন খুঁতখুতে স্বভাবের লোকের কি করে ভাল লাগল বৌদিকে?

অবন্তী ভাবে প্রথম থেকেই সবুজ সঙ্কেত পেয়েছে তার বৌদি ছোড়দার কাছে। দাদার জন্য পছন্দ না করে নিজের জন্যে মনোনীত করতে পারত সে অর্চনাকে। সব কিছুই অন্যরকম হতো তাহলে। তার দাদার বিয়ে ঠেকে যেতনা। দাদার বিয়ে নয় পরেই হোতো। এভাবে শরশয্যার যন্ত্রণা সইতে হোতনা তাহলে তাকে।

ফাইলে চোখ রেখেও মনটাকে নিবদ্ধ রাখতে পারছিলনা সে ফাইলের পরিসরে। আকাশ পাতাল চিন্তা এসে ঘিরে ধরেছিল ওকে কেবলি। মনে হচ্ছিল অভিশপ্ত যেন ওদের পরিবার। একের পর এক অভিশাপের উদ্যত খড়গে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে ওদের পরিবারের সুখ শান্তি আশা আনন্দ। অবন্তীর মনে হচ্ছিল ওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। শুধু ওর কেন? ওদের বাড়ির কেউই আর সুস্থ থাকতে পারবে না।

গত রাতে একদম ঘুম হয়নি। দুঃখে কষ্টে ঘৃণায় লজ্জায় পাগলের মত অস্থিরতা নিয়ে কাটিয়েছে সে রাতটা। মাথাটা তাই ঝিমঝিম করছিল। কখন যে তার সামনে এসে পট্টনায়ক দাঁড়িয়ে আছে তা সে খেয়ালই করেনি। পট্টনাযক কিছু বলার আগেই অবশ্য তার সম্বিত ফিরে এল। নিঃশব্দ হাস্যে তাকে অভিসম্ভিত করল পট্টনায়ক। তার মাথা থেকে অনেক ভার নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

সে ভুলেই গিয়েছিল পট্টনায়কের সঙ্গে তার আজ সিনেমা দেখার কথা। বুঝল সে কথাটাই মনে করিয়ে দিতে এসেছে তাকে পট্টনায়ক। সেবারের সেই অনুপস্থিতির ব্যাপারটা পুরোপুরি হজম করতে পারেনি পট্টনায়ক। সেদিন সেটা যে তার ইচ্ছাকৃত ছিলনা তা বুঝতে পেরেও যেন বুঝতে চায়না। পরে আরও কয়েকবার দেখা করেছে তারা। তবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেদিনের কথা তুলবে পট্টনায়ক। তাদের দেখা করার কথা হলেই সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলবে 'দেখবেন আবার যেন আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়। আপনাকে আবার বিশ্বাস নেই।'

অবন্তী ভেবেছিল আজও তার ব্যতিক্রম হবে না। কিন্তু অবন্তীর মুখচোখের ভাব লক্ষ করেই যেন অন্য সুরে কথা বলল সে।

—আপনার কি শরীর খারাপ?

রীতিমত উদ্বেগ প্রকাশ পায় তার কণ্ঠস্বরে।

—শরীর খারাপ না। মনটা ভাল নেই নানা কারণে।

একটু যেন আশ্বস্ত হলো পট্টনায়ক। প্রায় ফিসফিস করে বলল—

'কেন মন ভাল নেই কেন? কি হয়েছে?'

এড়িয়ে গেল অবন্তী। এ প্রশ্নের জবাব পট্টনায়ককে দেওয়া যায় না।

—আমার কিছু হয়নি। পারিবারিক কতগুলো ঝামেলা ঝঞ্ঝাট চলেছে। সেজন্য মনটা ভাল নেই।

পট্টনায়ক তবু জেদ করে জানতে চায়।

—আপনার দিদি এখন কেমন আছেন?

একদিন কথা প্রসঙ্গে তাদের পরিবারের কথা জানতে চেয়েছিল পট্টনায়ক। তখনই সে বলেছিল তার দিদির কথা। বলেছিল তার দিদি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। শুনে দুঃখ প্রকাশ করে পট্টনায়ক বলেছিল মানুষের জীবনের এর চেয়ে বড় অভিশাপ আর কি হতে পারে? মস্তিষ্ক মানুষের একটি অত্যন্ত দামী সম্পদ। সেই সম্পদ খোয়া যাওয়ার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

পট্টনায়কের প্রশ্নের জবাব আগের মত নিরাসক্ত ভঙ্গীতেই দিয়েছিল অবন্তী—'একই রকম।'

অবন্তী বুঝতে পারছিল পট্টনায়ক স্পষ্ট করে জানতে চাইছে ব্যাপারটা কি। কিন্তু সেটা কোন মতেই বলা যায় না। পট্টনায়ক অবশ্য সেটা নিয়ে আর লেগে রইল না। আগের মতই রহস্যময় ভঙ্গীতে ফিসফিস করে কথা বলল ও।

—মনে আছে তো? ঠিক সময়ে চলে আসবেন।

অস্ফুট স্বরে জবার দিল অবন্তী—'হ্যাঁ'।

চলে যেতে গিয়েও মুখ ফেরাল পট্টনায়ক।

—সুন্দরী মেয়ের গোমড়া মুখ দেখতে ভাল লাগেনা। মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন ওসব।

মুহূর্তকাল মোহাবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থেকে পরে আস্তে আস্তে চলে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল অবন্তী অন্য সব কথা। ওর বুকের মধ্যে ধ্বনিত হতে লাগল পট্টনায়কের কথাগুলো। সে জানে তার রূপ আছে। সেই রূপ কোন তরুণ সুদর্শন পুরুষের বুকে যদি ঝড় তোলে তাহলে তার একটা বিচিত্র মাদকতা আছে।

মাঝখানে কিছুদিন জোর করে অন্যরকম অভ্যাস রপ্ত করেছিল সে। এখন শুরু হয়েছে আবার আগের অভ্যাস। মাঝে মাঝে রূপ-স্তুতি না শুনলে কেমন যেন বিস্বাদ লাগে। নিজের প্রতি নিজের আকর্ষণ কমে যায়। তার মানে হোল ভাগ্যিস এখানে এসে পট্টনায়কের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার।

পট্টনায়ককে শ্যামলী পছন্দ করেনা বলে অবন্তীও ওর কাছে পট্টনায়কের কথা তোলেনা। তবু যেদিনই পট্টনায়কের সঙ্গে ওর দেখা করার কথা থাকে সেদিনই নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়। মনে হয় ছুটির পর একা একা বাড়ি যাবে শ্যামলী। পট্টনায়কের প্রতি তার দুর্বলতা দেখে মনে করুণা করবে তাকে। মুখে কিছু না বললেও পট্টনায়কের সঙ্গে তার গোপন মেলামেশার খবর যে শ্যামলীর অজানা নেই তা ভাল করেই বুঝতে পারে অবন্তী। দ্রুত হাতে কাজ সেরে নিয়ে উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে অনুমতি চেয়ে যথা সময়ের একটু আগেই বেরিয়ে পড়ল অবন্তী। বাসস্টপে এসে দেখা হয়ে গেল সুধাংশু বোসের সঙ্গে। সুধাংশু বোসও দাঁড়িয়ে আছে বাস ধারর অপেক্ষায়। অবন্তী এড়াতে চাইছিল। কিন্তু সুধাংশু তার সুযোগ দিলনা।

অবন্তীর দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসি হাসে সে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যুত্তর দিতে হোল অবন্তীকে কাষ্ঠ হাসি হেসে। মনে মনে প্রমাদ গুনছিল সে। ঠিক এই সময়ে সুধাংশুকে এখানে আশা করেনি। সুধাংশু জানে সে বেহালায় থাকে। যদি লক্ষ্য করে সে অন্য বাসে উঠেছে তাহলে কিছু একটা ভেবে নিতে পারে। এইসব চিন্তা করে সে ইচ্ছা করেই দেরি করল অবন্তী।

'ইন্দিরা' সিনেমার টিকিট কাটা আছে। তার টিকিট অবশ্য কাছেই রেখে দিয়েছে সে। তবু দেরি করলে রাগ করবে পট্টনায়ক। পরপর কয়েকটা বাস ছেড়ে দিল সে। কিন্তু একটু পরেই চিন্তিত হোল ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করে। আর

বেশি দেরি করলে সিনেমা শুরু হয়ে যাবে। তেরচা চোখে দেখতে চেষ্টা করল অবন্তী সুধাংশু তখনও বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে কিনা।

তাকে দেখতে না পেয়ে আর কালবিলম্ব না করে ভবানীপুরের বাস আসা মাত্র একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপরে। লেডিস সীট খালি ছিল। বাসে বসে আর একবার জানলা দিয়ে বাইরেটা জরীপ করে নিতে ইচ্ছা করল। কিন্তু ধারে কাছে কোথায়ও চোখে পড়লনা সুধাংশুকে।

'ইন্দিরা-র স্টপেজে যখন নামতে যাচ্ছে তখন ভূত দেখার মত চমকে গেল সে সুধাংশুকে দেখে। দোতলা থেকে নেমে আসছে মূর্তিমান সেই স্টপেজে নামবার জন্য। দারুন ভয়ে অস্বস্তিকে গলা শুকিয়ে গেল অবন্তীর।

সহজ ভঙ্গীতেই কথা বলল তার সঙ্গে সুধাংশু।

—এখানে যে? কাজ আছে কোন?

সুধাংশুর সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ে জবাব দিল অবন্তী বিরস গলায়।

হ্যাঁ।

অদ্ভুত একটা আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তার মুখ জরীপ করতে করতে ততোধিক আচ্ছন্ন গলায় প্রশ্ন করল সুধাংশু।

—কোথায়?

তীব্র রাগে জ্বলতে থাকে অবন্তী ভেতরে ভেতরে। একবার ভাবল সমুচিত জবাব দেবে সে এই উদ্ধত প্রশ্নের। লোকটা ভেবেছে কি? হতে পারে ও অফিসার। অবন্তী সামান্য একজন কেরানী। কিন্তু তাই বলে সে কারুর কেনা গোলাম নয়! ঐ লোকটার কি অধিকার আছে তাকে অফিসের বাইরে এইসব প্রশ্ন করার? তার যেখানে ইচ্ছা যবে।

ওর সাহস বা ধৃষ্টতার বহর দেখেও কম বিস্মিত হচ্ছিলনা অবন্তী। ঐ তো চেহারা! তাকাতেও ইচ্ছা করেনা। ওকি ভেবেছে ওকে দেখে মোহিত হয়ে ওর প্রেমে হাবুডুবু খাবে অবন্তী? বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চায়?

অথচ অফিসে যথেষ্ট সুনাম আছে লোকটার। সকলেই বলে দারুণ ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট নাকি ওর! কাজে কর্মেও রয়েছে খুবই সুনাম। আর মেয়েঘটিত কোন রকম দুর্বলতা নাকি কোনদিন দেখেনি কেউ ওর মধ্যে। তাহলে এই যে মাঝে মাধ্যে গায়ে পড়ে কথা বলতে আসে সেটার কি নাম দেওয়া যায়? লোকটার চেহারা যেমনই হোক ওর পচ্ছন্দটা ভাল। বেছে বেছে অবন্তীকে পছন্দ করেছে ঠিক।

প্রথমে ভাবল দু'কথা শুনিয়ে দেয় ও সুধাংশুকে। বলে 'আপনার কি দরকার

তা জেনে'? কিন্তু চকিতে আত্মসংবরণ করে তেজী গলায় জবাব দিল অবন্তী।

—সিনেমা দেখব।

একটু যেন হকচকিয়ে গেল সুধাংশু বোস। কি একটা বলতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু অবন্তী অপেক্ষা করেনা। 'আমি আসছি' বলে দ্রুত এগিয়ে গেল সে সিনেমা হলের দিকে। তার কৌতূহল হচ্ছিল অতঃপর সুধাংশু কি করে তা জানবার জন্যে। কিন্তু পিছনে ফিরে তাকালে সুধাংশুকে বেশি পাত্তা দেওয়া হবে।

হলে সিনেমা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পট্টনায়ক আগেই এসে উপস্থিত হয়েছিল। অবন্তীকে দেখে অভিমানাহত স্বরে প্রশ্ন করে সে।

—এত দেরি?

এত মুর্হূত চিন্তা করল অবন্তী সত্যি কথাটা বলবে কিনা? পরক্ষণে সমস্ত জড়িমা ঠেলে সরিয়ে তার সমস্যার কথা জানাল সে পট্টনায়ককে। গম্ভীর হয়ে গেল পট্টনায়ক সব শুনে।

—কি ব্যাপার বলুন তো? সুধাংশু বোস আপনার ওপর এত নজরদারী করছে কেন? ওর এ ব্যাপারে স্বার্থ কি?

অবন্তী অসন্তুষ্ট হোল। সুধাংশুর কথা আলোচনা করার সময় নয় এখন।

—আমি কি করে বলব? আপনি সেটা সুধাংশুকেই জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।

পট্টনায়ক বুঝল। অবন্তীর হাতে উষ্ণ চাপ দিয়ে হাসল।

—ঠিক কথা। আপনি কি করে জানবেন? যেতে দিন ওসব কথা। কে কি বলল বা করল তা নিয়ে দরকার কি আমাদের?

সিনেমা হলে পট্টনায়কের হাত প্রায় সারাক্ষণই চঞ্চল হয়ে বিচরণ করল অবন্তীর পিঠে, বুকে আর উরুর ওপরে। অবন্তী সরিয়ে দিচ্ছিল সেই হাত। কিন্তু পট্টনায়ক তেমন ভ্রূক্ষেপ করছিলনা। দু'একবার অবন্তীর হাত টেনে নিজের কোলের ওপরও চেপে রাখছিল। রুদ্ধশ্বাস ভয়ে ছবি দেখতে পারছিলনা অবন্তী। তবু তেমন করে বুঝি প্রতিহতও করতে পারছিলনা।

পট্টনায়কের সান্নিধ্যে সে দুর্বল বোধ করে। সেই দুর্বলতা অজানা নেই পট্টনায়কের। তারই সুযোগ নিচ্ছিল সে। পট্টনায়কের যৌবনতপ্ত সান্নিধ্যে অবন্তীর শরীরে মনেও সঞ্চালিত হচ্ছিল নরম একটি দাহ। কিন্তু তবু তার অস্বস্তি হচ্ছিল।

পট্টনায়কের চঞ্চলতা দেখে অবন্তীর মনে হচ্ছিল সিনেমা দেখতে আসেনি সে। সিনেমা হলের নিভৃত অন্ধকারে শরীরের সান্নিধ্যে পেতে এসেছে। মাঝে মাঝে সেই লুব্ধ হাতের কামুক স্পর্শে শিউরে উঠছিল সে। পট্টনায়কের সান্নিধ্য তার যত

ভালই লাগুক, তার সন্ধানী হাতের সেই অনলস বিচরণ তার ভালো লাগছিলনা। আশে পাশে কেউ লক্ষ করবে এই ভয় তো ছিলই। তাছাড়াও শরীরের জন্যে পট্টনায়কের নির্লজ্জ কামুকতা দেখে তার মন যেন বেসুরো বাজছিল।

অবন্তীর মনে হচ্ছিল অত ছটফট না করে স্থির হয়ে বসে যদি পট্টনায়ক সিনেমাটা দেখতো তাহলে অনেক বেশি উপভোগ করতে পারত অবন্তী তার সান্নিধ্য। তবু সে রূঢ় হতে পারছিলনা। অতীতে অনুরূপ অভিজ্ঞতার সময়ে তার অপ্রসন্নতা দেখে বেজার হয়েছিল পট্টনায়ক। বন্ধ করে দিয়েছিল মেলামেশা। তার প্রতি অবন্তীর দুর্বলতা আছে বলেই তো অতটা সাহসী হতে পারে সে?

অবন্তী যদি আপত্তি জানায় তাহলে কি তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগবেনা এই লোক? দরকারে কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে তা সে দেখছে আগে। তখন তো জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তাকেই। যে লোক এখন এখন এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে তখন ফিরেও দেখবেনা তার দিকে। সামনে পড়ে গেলেও মুখ ফিরিয়ে নেবে বিতৃষ্ণায়। অবন্তীর জীবন মহানিশা করে তুলব।

অবন্তী বোঝে পট্টনায়কের ভাল করেই বুঝেছে যে অবন্তীর মনে তাকে কেন্দ্র করে যে দুর্বলতার বীজটি রোপন হয়েছে তা এত সহজে উমূলিত হবার নয়। কথাচ্ছলে শ্যামলী একদিন একরকম একটি ইঙ্গিত দিয়েছিল। বলেছিল ছেলেরা বড় সাংঘাতিক। তারা যদি একবার বুঝতে পারে একটি মেয়েকে কব্জা করে ফেলেছে তাহলে তার সবরকম ফায়দা ওঠাবেই ওঠাবে।

প্রায় সমবয়সী হয়েও শ্যামলীর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। রঙীন চশমা পরে জগৎটাকে রঙীন স্বপ্নময় চোখে দেখেনা। অবন্তীর প্রায়ই মনে হয় শ্যামলীর চিন্তাভাবনা ভুইফোঁড় নয়। নিশ্চয় সে জীবনযাপনের বহমান স্রোতের মুখে আহরণ করেছে এরকম কয়েকটি চিন্তার কুসুম। আপন রুচি আর মেজাজ অনুসারে নিজের মত করে গেঁথে নিয়েছে বিশেষ একটা পুষ্পমাল্যের মত বিশেষ করে জীবনদর্শন।

পট্টনায়কের আচরণ দেখে মাঝে মাঝে তার মনে পড়ে শ্যামলীর কথাগুলো। ভাবে এভাবে রাশ আলগা করে দেবেনা সে। কিন্তু লোকটির যেন চুম্বকশক্তি আছে। ওর সংস্পর্শে এলেই অবন্তীর সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়। তবে শ্যামলী যাই বলুক। পট্টনায়ক যে তাকে খুবই ভালবাসে তা বুঝতে অসুবিধা হয়না তার। মাঝে মাঝে অবন্তীর দিকে এমন কাঙাল চোখে তাকিয়ে থাকে যে মায়া হয়

তার। নির্ভেজাল ভালবাসার নিদর্শন বলেই মনে হয় তা। তবে মাঝে লোকমুখে শোনা উল্টোপাল্টা ব্যাপারগুলো তাকে ভাবায়। তার মনের শান্তি নষ্ট করে।

কিন্তু পট্টনায়ক যখন তার কাছে থাকে তার সুন্দর যৌবনদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কোন রকম মালিন্য খুঁজে পায়না। মনে হয় যদিও বা থেকে থাকে তেমন কোন অতীত তাহলেও তা মিথ্যা হয়ে গেছে। তবে বাড়াবাড়ি করে যখন তখন ভাল লাগেনা।

হয়ত পট্টনায়ক কিছু অনুমান করল। ওর কথায় ইঙ্গিত মিলল আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টার। ফিসফিস করে সে।

—আপনার মত এত সুন্দর কাউকে দেখিনি আগে আমাদের অফিসে। আপনি এসে আমার সব গোলমাল করে দিয়েছেন। আপনার অনবদ্য সৌন্দর্যের কি যাদু আছে বলতে পারেন?

পট্টনায়কেব মুখের ভাষা শুনলে কে বলবে এই লোকটি বাঙ্গালি নয়? চেহারা, কথাবার্তা, চালচলন সব একেবারে বাঙ্গালিদের মত। উড়িষ্যার ঐতিহ্য বহন করছে তার পদবীটি। মাঝে মাঝে রসিকতা করে পট্টনায়ক বলে ভারতীয় সংহতির মূল সুরটি আত্মস্থ করার প্রকৃষ্ট জায়গা হচ্ছে তাদের অফিসটি। উড়িষ্যা বা আসামের 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলন বিহারের 'ঘরের ছেলে ঘরে', তামিলনাড়ুর হিন্দী বিরোধিতা, বম্বের শিবসেনাদের প্রাদেশিক জিগির কিংবা আমরা বাঙ্গালির সযত্নে প্রচার সব অর্থহীন মনে হবে এখানে এলে। ভারতবর্ষের জাতি ধর্ম সমন্বয়ের অনায়াস কর্মকান্ড চলেছে যেন তাদের অফিসগুলোতে। তা সে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যেখানেই হোক না কেন।

কলকাতা শহরের অফিসটিতে বসে কাজ করতে করতে অবন্তীরও মাঝে মাঝে মনে হয় এরকম কথা। তবু হতাশা এসে অনেক সময়েই ঘিরে ধরে তার মন। তার বাড়ির কেউই মেনে নেবেনা পট্টনায়ককে। ভারতীয়দের সংহতি কিংবা সর্বধর্মসমন্বয় পুঁথির কথা হতে পারে। মহাপুরুষদের বাণী হিসাবে জানা কথা হতে পাবে। কিন্তু পারিবারিক জীবনচর্যার ধারাবাহিক ঐতিহ্যের মধ্যে তার কোন স্থান নেই।

উদগত দীর্ঘশ্বাস গোপন করে সহজভাবে কথা বলতে চেষ্টা করে অবন্তী। পট্টনায়কের মতই ফিসফিস করে জবাব দিল সে।

—আপনি খুব বাড়িয়ে বলতে ভালবাসেন। আমার চেয়ে কত সুন্দর মেয়ে আছে!

—থাকতে পারে। কিন্তু আমার চোখে এ পর্যন্ত আপনার মত সর্বাঙ্গসুন্দর মেয়ে বড় একটা চোখে পড়েনি। কারুর হয়ত মুখ সুন্দর, কারুর বা শরীর। কিন্তু আপনার সব কিছুই বড় সুন্দর। যেমন মুখ তেমন শরীর।

আবার আরক্ত হলো অবন্তী। অনাত্মীয় যুবকের মুখে এরকম রূপবর্ণনা শুনলে কেমন যেন শিরশির করে শরীর। মনে হয় কথাগুলো যেন আসঙ্গ লিপ্সায় জড়িয়ে ধরছে তার সমস্ত শরীর। এরকম অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার পট্টনায়কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠার পরই।

একটা অনিশ্চিত ভয়ও যেন ঘিরে ধরে তার মনকে। পট্টনায়কের সঙ্গে যদি কোনদিন বিচ্ছেদ হয় তাহলে সেই দুঃখ সইবে কি করে? দিদির মত মানসিক যন্ত্রণার চাপে হারিয়ে ফেলবে না তো তার স্বাভাবিকতা?

সিনেমার পর বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আচমকা প্রশ্ন করে পট্টনায়ক।

—আপনি আজ খুব অন্যমনস্ক দেখছি। নিশ্চয় সুধাংশু বোসের কথা চিন্তা করছেন। তাই না?

ধাক্কা খেল অবন্তী। সুধাংশুর কথা তার এতক্ষণ মনে ছিল না। কিন্তু সুধাংশুকে অবন্তী পাত্তা না দিলেও কিভাবে যেন উদয় হয় সে ধূমকেতুর মত। পট্টনায়কের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের দিনে। তাদের দুজনে মাঝখানে প্রাচীরের মত বাধা সৃষ্টি করতে চায় যেন। অফিসে তার যত প্রশংসাই থাক অবন্তীর মনে হয় লোকটি সুবিধার নয়। পট্টনায়কের প্রতি অবশ্যই সে ঈর্ষা পোষণ করে। তার সঙ্গে অবন্তীর ঘনিষ্ঠতা যেন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেনা। ছলে ছুতোয় আবিভূর্ত হয়ে কেমন যেন অশুভ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।

পট্টনায়কের কাছে নিজের মনোভাব অব্যক্ত রাখেনা সে।

—লোকটাকে সুবিধার মনে হয় না। অথচ অফিসে সকলের মুখেই ওর কত সুখ্যাতি শুনি।

—না না লোক খারাপ নয় সুধাংশু বোস। আপনাকে হয়ত ভাল লাগে ওর। তার জন্য ওকে দোষ দেওয়া কি ঠিক? আপনি এত সুন্দর হলেন কেন?

বাস পেতে দেরি হোল বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। দরজা খুলে দিয়েই ফেটে পড়লেন যোগমায়া দেবী।

—কি ভেবেছিস তুই বিন্তী? এত রাত করে বাড়ি ফিরবি? আজকাল প্রায়ই দেরি করে ফিরছিস। তোরা আমায় এত কষ্ট দিচ্ছিস কেন?

বলতে বলতে নিজেকে আর সামলাতে পারলেননা তিনি। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। স্তম্ভিত হয়ে গেল অবন্তী। এই কান্না যে তার বেচালপনার জন্য নয়

তা বুঝতে দেরি হোলনা। মনের অবরুদ্ধ কষ্ট সামান্যতম উপলক্ষে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছে। অবন্তীর সন্দেহ হোল মা কি বৌদিদের ব্যাপারটা টের পেয়েছেন? সেজন্যই কি এই উষ্মা?

মাকে জড়িয়ে ধরে আস্তে করে প্রশ্ন করে সে।

—কি হয়েছে মা? তুমি কাঁদছে কেন?

—ইন্দর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে অর্চনার। অর্চনা রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে।

—কি নিয়ে ঝগড়া হোল?

ইচ্ছা করেই প্রশ্নটা করে সে মাকে।

—আমি কি কান পেতে ওদের কথা শুনেছি নাকি? আর দেরি করিসনা। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিবি চল।

অবন্তী তবু জেদ করে। মায়ের ওপর উল্টে ঝাঁঝ দেখায়।

—তুমি তো সারাদিন বাড়ি থাক। কি হয় না হয় কিছুই জাননা? আমার চোখে পড়ে আর তোমার চোখে পড়েনা? তুমি কি চোখে ঠুলি এঁটে আর কানে তুলো গুঁজে রেখে সংসার চালাবে বলে ঠিক করেছ মা?

দারুণ ত্রাসে সাদা রক্তহীন দেখায় যোগামায়া দেবীর শীর্ণ ক্লান্ত মুখটা।

—তুই কি বলতে চাইছিস বিন্তী?

—তুমি বুঝতে পারছনা কি বলতে চাইছি?

প্রখর চোখ মায়ের দিকে তাকায় অবন্তী।

হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে বেফাঁস কথা বলে ফেলেন যোগমায়া দেবী।

—তুই জানিস?

—আগে জানতাম না। এখন জানি। কিন্তু বৌদি গেল কখন?

—এই কিছুক্ষণ আগে। রণ নিয়ে গেল সঙ্গে করে।

—চমৎকার! তোমার বৌ কি একা একা চলাফেরা করতে পারে না? রণকে পৌঁছে দিতে হয়? দাদার সঙ্গে যখন বৌদির ঝগড়া হচ্ছিল ছোড়দা কি তখন সেখানে ছিল?

—না রণ বাড়ি ছিলনা। ও বাড়ি ফিরতে অর্চনাই বলল ওকে পৌঁছে দিতে।

—তার মানে ছোড়দা জানেনা কারণটা?

—তা কখনও হয়? অর্চনা ওকে নিশ্চয়ই বলেছে। এত রাত্রে হঠাৎ বাপের বাড়ি যাচ্ছে দেখে রণ কি জিজ্ঞাসা করবেনা ওকে? অবন্তীর অবাক লাগছিল তার দিদিকে দেখে। জানালার কাছে স্থির হয়ে বসে আছে সে। দিদিকে দেখে

প্রায়ই অবন্তীর মনে উদয় হয় একটি ভাবনা। পাগলামি আর মানসিক সুস্থতার মধ্যে সীমারেখা কিভাবে টানা যায়?

প্রকৃতিস্থ মানুষের মত অপ্রকৃতিস্থ মানুষও কি যখন তখন পার হতে পারে এই সীমারেখা? আর বিশেষ পরিস্থিতিতে সুস্থ মানুষের মত আচরণ করতে পারে? কিংবা তার পাগলামি সীমিত থাকে বিশেষ কতগুলি বিষয়ের মধ্যে? অন্য সব বিষয়ে সে সম্পূর্ণ সুস্থ?

হঠাৎ ভীষণ ভয় করতে লাগল অবন্তীর। তার দাদা পাগল হয়ে যাবে না তো? কিংবা সে নিজে? তার মনে হোল যদি পট্টনায়ক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় সে কোন কিছু ভাববেনা। তার বাড়ির লোকজনের আপত্তি, অফিসের লোকদের কানাঘুষো সব অগ্রাহ্য করে সাগ্রহে বরণ করে নেবে পট্টনায়ককে। তার জীবন কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেবেনা।

সে বৈরাগ্য বোঝেনা। ত্যাগ বোঝে না। ভোগবাসনায় কোন অনীহা নেই তার। আর দশজন মানুষের মত সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চায়। সুন্দর স্বাস্থ্যবান স্বামীর সঙ্গে সপ্রেম সহবাসে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে চায় তার জীবন।

সে জানেনা কতখানি তার আয়ুষ্কালের পরিধি। কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকবে ভালভাবে বেঁচে থাকবে। পট্টনায়ক তাকে উদ্ধার করুক এই অশান্তিপুরী থেকে। তার আর বরদাস্ত হচ্ছে না এই নিরানন্দ পরিবেশ। এই বাড়ি জেলখানা হয়ে উঠেছে। এখানে আর বেশিদিন কয়েদ থাকলে হারিয়ে ফেলবে সে অনেক কিছু একটু একটু করে।

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙ্গে গেল অবন্তীর দারুণ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে। তাদের বাড়ির বারান্দায় স্ট্রেচারে শুইয়ে রাখা হয়েছে যেন কাউকে। সাদা চাদরে মোড়া রয়েছে সেই দেহ। আশেপাশে ভিড় করে রয়েছে অনেক লোক। তার মধ্যে বৌদিকেও দেখতে পেল সে। হঠাৎ তার কানে এল মায়ের কান্না। ভিড়ের মধ্যে তার মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে প্রাণপণে এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল তার উত্তেজনায়। সঙ্গে সঙ্গে কানে আসে তার মায়ের গলায় আর্তস্বরে কান্নার আওয়াজ।

ধড়মড় করে উঠে পড়ে অবন্তী। ভয়ে শক্ত হয়ে যায় তার শরীর। দরজার কাছে এসে দেখে দাদার ঘরের দরজা খোলা আর তার মা দাঁড়িয়ে উর্ধ্ব মুখে। ঘরের মাঝখানে বুকের ওপর দুই হাত চেপে ধরে। একটু এগিয়ে যেতেই তার চোখে পড়ে দাদার নিষ্প্রাণ দেহটা ঝুলছে। সিলিং ফ্যানের উপর থেকে। সামনেই

রয়েছে একটা চেয়ার। সিলিং ফ্যানের সঙ্গে দড়ি লাগিয়ে বেঁধে ঝুলে পড়েছে অরিন্দম। সংগ্রামসর্বস্ব জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে বেছে নিয়েছে স্বেচ্ছামৃত্যু।

অবন্তী কাঁদতে পারছিলনা। তার মনে ভিড় করে আসছিল প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অল্প বয়স থেকে লড়াই করে সংসারের রণাঙ্গনে যে বিজয়কেতন উড়িয়েছিল তার লড়াকু শক্তি অন্তর্হিত হলো কেন হঠাৎ? তার দাদার মত মানুষের এরকম ধৈর্যচ্যুতি হলো কেন?

অবন্তীকে দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন আরেকবার যোগমায়া দেবী।

—বিন্তী এ আমার কি সর্বনাশ হলো? আমি কেন বুঝতে পারলাম না কাল এরকমটা করতে পারে ইন্দ?

চিত্রার্পিতবৎ তাকিয়ে রইল অবন্তী দাদার দিকে। একটু পরেই এসে উপস্থিত হলো অরণী আর অরুন্ধতী। অরণীর মুখে বিস্ময়, অরুন্ধতীর মুখে চাপা যন্ত্রণার প্রকাশ। খবর দেওয়া হলো অর্চনাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘর ভরে গেল পাড়ার লোকে। থানা পুলিশ শ্মশান ইত্যাদি যাবতীয় করণীয় সম্পন্ন করল পাড়ার ছেলেরাই।

অরিন্দমের স্বহস্তে লেখা চিরকুটে 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয় কথাটা ছিল বলে তেমন ঝামেলা হলোনা।

আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ খবর পেয়ে এসে উপস্থিত হলো। টুকরো টাকরা কথা, কন্না, ব্যস্ততা ইত্যাদির মধ্যে অবন্তীর মন কেমন যেন ভাবলেশহীন হয়ে রইল। সব কিছু এমনভাবে পরপর ঘটে যেতে লাগল যে তাদের উদ্যোগী হয়ে কিছু করতে হোলনা।

কিন্তু অনেক রাতে মাকে জড়িয়ে ধরে আর নিজেকে সামলাতে পারলনা অবন্তী। যোগমায়া দেবীও ভেঙ্গে পড়লেন বুকফাটা কান্নায়। অরুন্ধতী যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল। মায়ের কান্না দেখে তাকে খাবলে জড়িয়ে ধরে বারবার প্রশ্ন করতে থাকে।

—ওরা কেন মেরে ফেলল দাদাকে? বল না মা দাদাকে ওরা মারলে কেন?

পাগল মেয়ের কথা শুনে যোগামায়া দেবী ভাবছিলেন একটা কথা। কি দরকার ছিল তার অরিন্দমের বিয়ে দেওয়ার? বোসদা বারবার নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন 'ঐ মেয়ের সঙ্গে ইন্দর বিয়ে দিওনা বৌমা। ও সুখী হবেনা।' শুধু কি তাই? উনি বলেছিলেন ঐ মেয়ে বউ হয়ে আসলে সংসারে আসবে ঘোর অশান্তি। বলেছিলেন 'বৌমা আমি চোখের সামনে ঘোর অমঙ্গল দেখতে পাচ্ছি। তুমি তড়িঘড়ি এখানে বিয়ে ঠিক করোনা।'

কিন্তু তবু তার কি যে দুমর্তি হলো! বোসদার কথায় তেমন করে ক
দিলেন না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনিও নেচে উঠলেন। যেন আর দু'দিন প
বিয়েটা হলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হতো?

এসব কথা যত ভাবেন তত অপরাধী বলে মনে হয় নিজেকে। কেবলি ম
হয় কেন তিনি ছেলেকে চোখে চোখে রাখলেননা? বউ ঝগড়া করে বাপে
বাড়ি চলে যাওয়ার পর মুখ ভারী করে বসেছিল ইন্দ। তার সোনার চাঁদ ছে
কোনদিন কারুর সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলেনি। পাগল বোনের সঙ্গে ব্যবহা
পর্যন্ত কত ধৈর্য, কত সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়েছে। সেই ছেলে কত অস
হয়েছে বলেই না বউকে দুটো কথা বলেছে। চোখের সামনে যা চলেছে তা স
করতে পারে কোন পুরুষ মানুষ?

তবু নিজেকে সরিয়ে নেবে সে এমনভাবে? দুঃখী মায়ের কথা, বোনদে
কথাটাও ভাবলনা? অভিমান হয় যোগমায়া দেবীর। ভাবেন বউয়ের ব্যবহা
জীবন অতটা অর্থহীন হয়ে গেল ওর কাছে? আর সকলের কথাটা চি
করলনা? যে ছেলের মা অন্ত বোনঅন্ত প্রাণ তার মধ্যে এরকম পরিবর্তন হ
কি করে?

আবার মনে হয় লজ্জায় ঘৃণায় নিজেকে শেষ করে দিয়েছে তার ইন্দ। বাড়ি
মধ্যে এই কেলঙ্কারি বরদাস্ত হয়নি। তাই যাতে চোখে এসব না দেখতে হয় ত
জন্য চলে গেল এমন অকালে তাদের সকলকে কাঁদিয়ে।

সময় এক সার্বভৌম সম্রাট। বিশ্বচরাচর তার নিয়ন্ত্রণাধীন। শোক দুঃখ কা
সব আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে আসে তার প্রবল পরাক্রমের কাছে।

প্রথম দিকে অসহ্য দুঃখের তীব্র আগুনে দগ্ধ হচ্ছিল অবন্তীরা। নাও
খাওয়ার ঠিক নেই। কখনও বউয়ের বাপের বাড়ি থেকে কেউ এসে, কখন
বা পাড়া প্রতিবেশীরা জোর জবরদস্তি করে খাইয়ে যায়। ঘুম আসেনা। থে
থেকে মনে পড়ে টুকরো টুকরো কথা, টুকরো টুকরো ঘটনা। হু হু করে ও
বুকের ভেতরটা। মাঝ রাতে বুকের ভেতর থেকে আর্তনাদ উদগত হয়ে আসে
কিছুতেই শান্ত করা যায়না তাকে।

তবু সময়ের দ্রুতগামী রথের চাকায় পিষ্ট হয় ব্যক্তিমানুষের বোধ অনুভূতি
শোক থিতিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হয়ে ওঠে জীবনের চাহিদা। ক্ষুধা তৃষ্
ঘুম আবার হানা দেয় প্রবল দাপটে। মৃত মানুষের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে জাগ্র
মানুষের দাবি।

অবন্তীদের সংসারেব চাকা ঘুরতে লাগল আবার আগের মত। একা

আদরের মানুষ অভিমানে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে বলে পৃথিবীর সব কিছু থেমে যায়না। তার জন্য তার স্মৃতি কষ্ট দেয়। তার অপূরণীয় শূন্যতা দুর্বিষহ মনে হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু নিষ্ঠুর প্রয়োজনের তাগিদে চলমান জীবনের গতি অব্যাহত থাকে।

কয়েক দিনের বিরতির পর আবার অফিস যেতে শুরু করল অবন্তী। আবার দোকান খুলল অরণী। যোগমায়া দেবী পর্যন্ত মনের দুঃখ চাপা দিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন। ভাঙ্গা বুক নিয়েই আবার রান্নাঘর ঠাকুরঘর করতে লাগলেন। অবশ্য অনেক আলগা ভাবে।

মাঝে মাঝে ঠাকুর ঘরে গিয়ে উদ্বেলিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। বলতেন 'আমাকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছ ঠাকুর? ইন্দকেও কেড়ে নিলে আমার কাছ থেকে? আমরা এমন কি পাপ করেছি যে ক্রমাগত এভাবে শাস্তি পেয়ে চলেছি'? রাতে মায়ের পাশে শুয়ে অবন্তী টের পেত লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছেন মা। বুকটা ভারী হয়ে যেত তার। কিন্তু মাকে কিভাবে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারতনা। তার গলা থেকে যে কান্নাটা বেরিয়ে আসতে চাইত সেটা জোর করে চেপে রাখত।

মাঝে মাঝে বিচিত্র ঘটনা ঘটত। অরুন্ধতী কেঁদে উঠত চিৎকার করে। তখন সেই পাগলকে সামলাতে বেগ পেতে হোত তাদের। সব থেকে বিচিত্র লাগত এ বাড়ির অন্য দুটি প্রাণীর আচরণ। অবন্তী ভেবেছিল তার দাদার কাজটাজ হয়ে যাওয়ার পর বাপের বাড়ি চলে যাবে বৌদি। তাদের সঙ্গে তার কিছু অনেক বছরের সম্পর্ক না। আর যার জন্য সম্পর্ক সেই যখন চলে গেল তখন আর এখানে পড়ে থাকবে সে কি সুবাদে? মৃত্যু সব মানুষকেই কিছুটা নাড়া দেয়।

কিন্তু অর্চনাকে দেখে বোঝা গেলনা তার স্বামী মাত্র কিছুদিন আগেই আত্মহত্যা করেছে। কয়েকটা দিন একটু গম্ভীর দেখিয়েছিল তাকে। কিন্তু গাম্ভীর্যের মধ্যে বিষণ্ণতা যত না ছিল তার থেকে অনেক বেশি ছিল অপ্রসন্ন কাঠিন্য। তাকে দেখে মনে হোত তার স্বামীর আচরণে সে খুবই বিরক্ত। অবন্তীদের সঙ্গেও তার আচরণ ছিল কাঠকাঠ, যান্ত্রিক। অরুন্ধতীকে তো একেবারেই সহ্য করতে পারত না।

অরণীর সঙ্গে কিন্তু পূর্ববৎ রইল তার সম্পর্ক। কিছুদিন বাদে আবার সুরু হোল তাদের হাসি ঠাট্টা গল্প। দুজনের অন্তরঙ্গ বাক্যালাপ চোখে পড়ত অবন্তীর আর সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতরে দাপাদাপি শুরু হোত। মৃত দাদাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলত 'তুমি এমন বোকামি করলে কেন দাদা? যাদের আচরণে দুঃখ পেয়ে লজ্জা পেয়ে জীবন দিলে তারা তো সুন্দর হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছে।

দিনান্তে একবারও কি তোমার কথা ভাবে তারা? বরং তাদের পথ তো তুমি নিষ্কন্টক করে দিয়েছ।'

কখনও বলত 'অন্যভাবে কি ফয়সলা করা যেতনা? তুমি তো পরিত্যাগ করতে পারতে এই স্ত্রীকে। আইনের সাহায্য নিয়ে। আবার নতুন করে শুরু করতে পারতে তোমার জীবন। দুর্বল মানুষের মত নিজের অধিকার ছেড়ে পরাজয় স্বীকার করলে কেন'?

তার বৌদি আর ছোড়দা দিব্যি রয়েছে বহাল তবিয়তে। একমাত্র সিঁদুরটিই পরিত্যাগ করেছে অর্চনা। পোষাক পরিচ্ছেদ আগের মতই আছে। খাওয়ার ব্যাপারেও কোন বিধিনিষেধ মানছেনা। অর্চনাদের কিছুই মনে হোতনা এসব দেখে যদি না দাদার আত্মহত্যার কারণটা কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধত অনবরত।

বিধবাদের বিশেষ করে অল্পবয়সী বিধবাদের ক্ষেত্রে আচারনিয়মের কড়াকড়ি কোনদিনই সমর্থন করেনা অবন্তী। তার মায়ের সঙ্গে পর্যন্ত এ নিয়ে অনেক খটাখটি হয়েছে তার। তারা ভাইবোনেরা কেউই সমর্থন করেনি মায়ের নিয়মকানুনের আতিশয্য। আজ অর্চনার ক্ষেত্রেও তারা অন্যরকম চিন্তা করতনা।

কিন্তু যে পরিপেক্ষিতে তার দাদাকে চলে যেতে হল আর তার পরও বৌদিদের নির্লজ্জ আচার আচরণ দেখে অর্চনার মনে মাঝে মাঝেই জিঘাংসার উদ্রেক হয়। মনে হয় জোর করে সাদা শাড়ি পরিয়ে মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ করে দেয় সে এই নির্লজ্জ মহিলাটির। মনে হয় তার উপায় থাকলে বাড়ি থেকে বিদায় করত সে এই দুষ্ট পাপগ্রহটিকে।

ছোড়দার নিলর্জ্জতা তো চরমে উঠেছে। দাদা বেঁচে থাকলে এতটা পারতনা কিছুতেই। তার মা যদি এতটা ভীরু না হতেন তাহলো হয়ত বাড়ির পরিস্থিতি অন্যরকম হতো। চিরকাল সকলকে ভয়ে পেয়ে কেমন যেন নির্জীব মেরুদন্ডহীন হয়ে গেছেন মা। শ্বশুর শাশুড়ীর আমলে যেমন ছিলেন এখনও প্রায় সেরকমই আছেন।

নিজের মতামত বলে কিছুই নেই। ছেলেমেয়েদের মতই তার মত। বরং অবন্তীকে তবু একটু আধটু ধমক টমক দেন। অবন্তী বোঝে সেও যেন ঠিক ধমক নয়। নিজের ভেতরের চাপা উদ্বেগ প্রশমিত করারই প্রয়াস সেটা। দিদিকে যে ছোড়দা এত মারধর করে তা মা সহ্য করতে পারেননা। তবু তেমন জোরালো ভাবে তার প্রতিবাদও করতে পারেননা।

অরুন্ধতী ক্রমশঃ এই পরিবারের পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। যখন

তখন মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোড়দা বা বউদির ওপরে। আঁচড়ে কামড়ে একসা করছে। ছোড়দা প্রায়ই ধুয়ো তুলছে 'ও একেবারে অমানুষ হয়ে গেছে মা। ওকে আবার পাঠিয়ে দাও সরকার পুলে।' যোগমায়া দেবী খালি টালবাহানা করে ঠেকিয়ে রাখছেন। টাকার প্রশ্ন জড়িত না থাকলে ছোড়দা অবশ্যই নিজের জোর খাটাত। মায়ের কথায় কান দিতনা।

দিদির আচরণ দেখে কম অবাক হয়না অবন্তী। দিদির তো মাথার ঠিক নেই। এসব ব্যাপার সে বোঝে কি করে? বেছে বেছে ছোড়দা আর বউদির ওপরেই বা তার রাগ দেখায় কেন?

তাদের অফিসে যেসব ছিটগ্রস্ত লোক আছে তাদের সম্পর্কে একবার একটা চমৎকার মন্তব্য করেছিল প্রতীপ। হ্যামলেটের উল্লেখ করে বলেছিল হ্যামলেটের মত ওদের রয়েছে 'মেথোড ইন্ ম্যাডনেস।'

অবন্তীর মনে হয় এই উক্তিটির মধ্যে পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় মেলে। এ পর্যন্ত যতগুলি অস্বাভাবিক চরিত্র দেখেছে সে তাদের আচরণ দেখে মনে হয় একটা নির্দিষ্ট ছকে চলে তাদের পাগলামি বা অস্বাভাবিতা।

আগে মায়ের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠত তার দিদি। কারণ মা দিদির ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর হস্তক্ষেপ করতেন। এখন মায়ের সঙ্গে কোন অসদ্ভাব নেই। অবন্তীর সঙ্গে তো নয়ই। কিন্তু ছোড়দা বা বউদিকে হাসতে বা কথা বলতে দেখলে রাগে ফুঁসবে সে। তার শান্ত টানা টানা চোখ দুটিতে ঝলসে উঠবে বিদ্যুৎ। মুহূর্তকাল স্থির চোখে দেখে পরক্ষণেই ঝাপিয়ে পড়বে তাদের ওপরে। অবশ্য সে যত না মারে তার থেকে মার খায় অনেক বেশি। সারা গায়ে তার প্রহারের চিহ্নের অন্ত নেই। অবন্তীরা নিরুপায় হয়ে মুখ বুজে সহ্য করে। এখন এ বাড়ির কর্তৃপক্ষ হয়ে উঠেছে তার ছোড়দা আর বউদি।

একদিন সকালে মাথায় রক্ত চড়ে গেল অবন্তীর। হাতে কিল চড় মেরেও ক্ষান্ত হোলনা সেদিন তার ছোড়দা। ক্রিকেটের ব্যাট নিয়ে অরুন্ধতীকে মারতে গেল সে। আর তখনই ধৈর্যচ্যুতি হোল অবন্তীর। ঝটতি ছোড়দার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে চিৎকার করে উঠল সে।

—খবরদার। ভাল হবেনা বলছি। কি ভেবেছ তোমারা? নিজেরা যা খুশি করে বেড়াবে আর যত দোষ হোল ঐ পাগলের তাই না?

অরুণী স্তম্ভিত হয়ে গেল অবন্তীর সেই দুঃসাহস দেখে। প্রথমে মন্ত্রপড়া সাপের মত নুইয়ে গেল সে। পরক্ষণেই হৃত তেজ পুনরুদ্ধার করে ঝাঁঝিয়ে উঠল।

—কি বলতে চাইছিস তুই?

অবন্তীর মধ্যে যেন জেগে উঠেছিল মহামায়ার দুরন্ত তেজ।

—কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছনা? কি চলছে আমাদের বাড়িতে? দাদা কেন আত্মহত্যা করল? কিছু জাননা তোমরা তাই না? ছি ছি ছি। তোমরা কি মানুষ? এত বড় অন্যায় করেও বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করেনা তোমাদের?

এরকম তিরস্কার সহ্য করার পাত্র অরণী নয়। সে কোনদিনই কারুর তেমন পরোয়া করেনা। আর এখন তো এ বাড়ির একমাত্র পুরুষ অভিভাবক। অবন্তীর কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না সে। পরিবর্তে তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবন্তীর হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে সেটা দিয়ে ঘা কতক লাগিয়ে দিল তার পিঠে, কোমরে আর পায়ে। অর্চনা আর যোগমায়া দেবী ছুটে এসে ব্যাটটা কেড়ে না নিলে অবন্তীকে হয়ত আধমড়া করে ছাড়ত সে।

—কি শুরু করেছিস তোরা রণ? তোরা কি চাস আমিও গলায় দড়ি দিই?

অরণী তাতে দমেনা। আগের মত অপ্রতিহত ভঙ্গীতেই জবাব দিল।

—তোমার মেয়েদের সঙ্গে থাকা আমার পোষাবেনা। এই সব পাগল ছাগলের সঙ্গে তুমি থাকতে পার। আমরা পারিনা।

অবন্তী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তার হাঁটুতে খুব জোরে লেগেছে। কিন্তু অরণীর মুখে নির্লজ্জ 'আমরা' কথাটা চাপা দিয়ে দিল তার অন্যসব অনুভূতি। প্রবল হয়ে উঠল রাগ, ঘৃণা, ক্রোধ।

—আমরা মানে তুমি আর বৌদি তো? লজ্জা করেনা তোমার আমাদের সামনে এসব বলতে। আমরা তো পাগল ছাগল আর তোমরা? তোমরা কি? তোমাদের মুখ দেখলেও যে ঘেন্না হয় আমাদের তা জান?

—এতই যদি ঘেন্না তাহলে আছিস কেন এই বাড়িতে? চলে যা না যেখানে খুশি। কে তোকে থাকতে বলেছে?

—কেন যাব? এ বাড়ি কি তোমার? তুমি আছ কেন এখানে? তোমার যখন পোষাচ্ছেনা তুমি কেন চলে যাচ্ছনা?

—তোর খুব বাড় বেড়েছে বিন্তী। কি মনে করিস তুই নিজেকে? তুই অফিসে কি করে বেড়াচ্ছিস জানিনা আমি ভেবেছিস? অনেক কথাই কানে এসেছে আমার। ঐ উড়িয়াটার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন তুই? ঐ লম্পটটা তোকে বিয়ে করবে কোনদিন? কিছু বলিনা বলে ভেবেছিস কিছু জানি না?

অবন্তী অবাক হয়ে গেল ছোড়দার কথা শুনে। ছোড়দা যে পট্টনায়কের কথা

জানে তা তো ঘৃণাক্ষরেও ভাবেনি সে। কিন্তু সকলের সামনে এরকম যা তা বলবে ওর সম্বন্ধে? আর বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নেবে সে?

—কি জানো তুমি? ও যদি লম্পট হয় তুমি তাহলে কি?

—কি এতবড় কথা?

মায়ের হাত থেকে ব্যাটটা কেড়ে নিতে যাচ্ছিল অরণী। যোগমায়া দেবী দিলেন না। ব্যাট হাতে নিয়েই দুই হাত জড়ো করে মিনতি করলেন।

—আমি হাত জোড় করে মিনতি করছি তোদের। অনেক হয়েছে। আর না। আগের জন্মে অনেক পাপ করেছি নিশ্চয়। নাহলে এত শাস্তি পাই?

অরুণী চলে গেল ঘর থেকে। তার পিছন পিছন অর্চনাও। এক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইলেন যোগমায়া দেবী। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুকের পাঁজর ভেদ করে।

অবন্তীর হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়েছিল। দুই হাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরে মায়ের দিকে ফেরে সে।

—আজ অফিসে যাবনা মা। তুমি না আটকালে আজ আমায় মেরেই ফেলত তোমার ঐ ছেলে।

হাঁটুর কাপড় তুলে পরীক্ষা করেন যোগমায়া দেবী।

—খুব লেগেছে নারে? তুই কেন রণব সঙ্গে লাগতে যাস? এখন তো মাথার ওপরে তোর দাদা নেই। তোদের আমি রক্ষা করব কি করে? আমার কি সে হিম্মত আছে? একটু তো বুঝে সুঝে চলবি বিন্তী।

অবন্তী কোন জবাব দিলনা। মায়ের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে গোঙাতে থাকে অরুন্ধতী।

—ও মা ও কেন এত মারল আমায়? আমি কি করেছি?

যোগমাযা দেবী অরুন্ধতীর বুকে পিঠে হাত বুলোতে থাকেন।

—তুমি কিছু করোনি মা। সবই তোমার অদৃষ্ট।

একটুক্ষণ সবাই চুপচাপ থাকে। যোগমায়া দেবীর মনে পড়ে অরণীর কথাগুলো। তার মনে হোল রণ যা বলল বিন্তীর সর্ম্পকে তা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। তিনি অক্ষম মা। সন্তানদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা নেই তার। তবু সময় থাকতে বুঝিয়ে বলতে পারেন এই আর কি!

—বিন্তী রণ যা বলল তা কি সত্যি? তুই কি লম্পট একটা লোকের সঙ্গে মেলামেশা করছিস? আবার শুনলাম সে নাকি বাঙ্গালি নয়, উড়িয়া।

—সে বাঙ্গালি নয় ঠিকই। কিন্তু লম্পট কখনই নয়।

—তা না হয় হোল। কিন্তু অবাঙ্গালি একজন লোকের সঙ্গে তো তোর বিয়ে হতে পারেনা বিন্তী? তুই আবার কি সর্বনাশ করতে চলেছিস?

মাকে থামিয়ে দিল অবন্তী।

—তোমার মেয়ে এত কাঁচা নয় মা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ছোড়দা অনেক বাড়িয়ে বলছে। ওর কথা ধরোনা তুমি।

মাকে থামিয়ে দিয়ে তখনকার মত সেই প্রসঙ্গ বন্ধ করল অবন্তী। কিন্তু ছোড়দার কথা শুনে তার মনের মধ্যে সারাক্ষণ অশান্তি বিজবিজ করতে লাগল। ছোড়দা কার কাছে কি শুনল পট্টনায়কের সম্বন্ধে?

পট্টনায়ককে তার দেহাতুর মনে হয়। তবে লম্পট মনে হয় না। তবু কোন কোন কথার প্রভাব বড় দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর হয়। 'লম্পট' কথাটা তার মনের মধ্যে কেমন একটা চিড় ধরাল যেন।

কিছুদিন থেকে নিজের থেকেই দেখাসাক্ষাৎ কমিয়ে দিয়েছে সে। এর মধ্যে একদিন আউটরাম ঘাটে বেড়াবার প্রস্তাব করেছিল পট্টনায়ক তার কাছে। কিন্তু সে নিজেই রাজী হয়নি। দাদার অপমৃত্যু তার মনের মধ্যে কেমন একটা ছায়া ফেলেছে। দাদার স্মৃতি তাকে শয়নে স্বপনে উঠতে বসতে পীড়া দেয়।

এখনও বেশিদিন হয়নি। এরমধ্যে সব কিছু ঝেড়ে ফেলে পট্টনায়কের সঙ্গে প্রমোদবিহারের জন্য কোন ইচ্ছা জাগেনি তার। অফিসের অনেকেই খবরটা জানে। তারা তার জন্য যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। পট্টনায়কও খবরটা শুনে দুঃখ প্রকাশ করেছিল।

—মিস মিত্র এই হলো আমাদের জীবন। আপনি জোর করে কিছুই বলতে পারেননা। এই মনে হচ্ছে আপনি ভীষণ সুখী। তার পরেই এমন কিছুই ঘটবে যে মনে হবে আপনার মত দুঃখী আর কেউ নেই পৃথিবীতে। এর মধ্যে যতটুকু আপস করে চলা যায় ততই মঙ্গল।

একটু পরেই প্রস্তাব করেছিল বেড়াতে যাওয়াবে।

—আজ ছুটির পর আউটরাম ঘাটে বেড়াতে যাবেন? আপনার ভাল লাগবে।

সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিয়েছিল অবন্তী।

—এখন থাক। আমার মনটা ভাল নেই। কয়েকটা দিন যাক।

আর দ্বিরুক্তি করেনি তখন পট্টনায়ক। আরও দু'চারটে কথাবার্তার পর ভগ্নমনোরথ হয়ে চলে গিয়েছিল সেখান থেকে। অবন্তীর কিন্তু সত্যি ইচ্ছে হয়নি বেড়াতে যাওয়ার। বরং পট্টনায়কের প্রস্তাব শুনে ভেতরে ভেতরে তার খারাপই

লাগছিল। কেমন যেন বেসুরো ঠেকেছিল সেটা। স্বভাবের ঘাটতি বলে মনে হয়েছিল।

আশ্চর্যের কথা সুধাংশু বোস কিন্তু তখন অনেক কাছে চলে এসেছিল অবন্তীর। পট্টনায়কের সান্নিধ্যের মাদকতা সে পেতনা সুধাংশু বোসের কাছে। কিন্তু ঈষৎ স্থূলকায় অসুন্দর চেহারার এই পুরুষটির অন্য ধরণের সম্মোহন ক্ষমতা ছিল।

পট্টনায়ক সুন্দর কথা বলত। কিন্তু অবন্তীরও মনে হোত চেহারার মত কথাগুলোও সাজিয়ে তুলে ধরতে ভালবাসে পট্টনায়ক। সুধাংশুও সুন্দর কথা বলে। কিন্তু তার কথার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যে তার সেটা মনকে চুম্বকের মত কাছে টানে।

সুধাংশুর প্রতি প্রেম সে বোধ করেনা। এরকম চেহারার লোকের সঙ্গে প্রেম হয়না। তবে সখ্য বোধহয় অসম্ভব নয়। একটা কারণে ধোঁকা লাগে অবন্তীর মনে। পট্টনায়ক আর সুধাংশু কেউ কাউকে পছন্দ করেনা। বিশেষ করে সুধাংশুর অপছন্দ খুবই চোখে পড়ে। অবন্তী দেখেছে পট্টনায়কের দিকে কেমন বিরস দৃষ্টিতে যেন তাকায় সুধাংশু। অপরপক্ষে সুধাংশুর সামনে কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করে পট্টনায়ক। অনেক ভেবেও এই রহস্যের সমাধান করতে পারতোনা সে?

আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিল সে। পট্টনায়ক যখনই তার সঙ্গে কথা বলত ছল ছুতোয় সুধাংশু সেখানে উপস্থিত হতো। এ জিনিষ অবন্তী আগেও একাধিকবার লক্ষ করেছে। আর তাতে তার সুধাংশুর প্রতি ক্রোধেরই উদ্রেক হয়েছে। তার মনে হোত তাদের দুজনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হোক তা চায়না সুধাংশু। তাতে বাগড়া দেওয়াই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। ভাবত কুদর্শন সুধাংশু ঈর্ষা পোষণ করে সুদর্শন পট্টনায়কের প্রতি।

কিন্তু ইদানীং তার নিজেরই সন্দেহ হয় সুধাংশুর আচরণের এত সরলীকৃত ব্যাখ্যায়। দুঃখ মানুষের চোখের পরদা সরিয়ে দেয় অনেকটা। কিংবা অনুভূতির ধার তীক্ষ্ণ করে। অবন্তীর কাছে সুধাংশুর মূল্যায়ন অনেক পাল্টে গেল।

অবন্তীর দাদা মারা যাওয়ার পর সুধাংশু যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তখন অবন্তী তা ঠেলে সরিয়ে দিতে পারেনি। দাদার মৃত্যু তাকে দুর্বল করে দিয়েছিল অনেকটা। মনের সেই দুর্বল তন্ত্রীতে ঘা মেরেই অনুরণন তুলেছিল সুধাংশু বোস। একটু একটু করে সুধাংশুর সঙ্গে পরিচয় গভীর হোল আর অবন্তীর মনে হোল এই আপাতঅসুন্দর চেহারার লোকটির সব কিছুই অসুন্দর নয়।

কয়েকদিনে আলাপের পর তার মনে হোল এই লোকটিকে আগে এত বিরক্তিকর লেগেছিল কেন? পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষের মানসিক অনুভূতির কত ওলোটপালোট ঘটে তা লক্ষ করে অবন্তীর নিজেরই অবাক লাগছিল।

সুধাংশু একজন সিনিয়র অফিসার হওয়া সত্ত্বেও লাঞ্চ টাইমে কিংবা ছুটির আগে আগে এসে যে অবন্তীর সঙ্গে গল্প করে তা পট্টনায়কের পছন্দ নয়। নিজের মুখেই ব্যক্ত করে সে তা।

—মিঃ বোসের ব্যাপার কি মিস মিত্র? এখন দেখছি রোজই উনি এসে আপনাব সঙ্গে গল্প করেন। আমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই তো?

অবন্তী আশ্বস্ত করেছিল অল্প হেসে।

—কি যে বলেন? কোন লোকের সঙ্গে কথা বললেই তার সঙ্গে অন্য রকম সর্ম্পক হয়ে যাবে? কত জনের সঙ্গেই তো মিশি, কথা বলি তা বলে—

অবন্তীকে শেষ করতে দেয়নি পট্টনায়ক। হো হো করে হেসেছিল কিছুক্ষণ। পরে মৃদু মাদকতাময় ভঙ্গীতে রসিকতা করেছিল।

—কথাটা একেবারে বেঠিক বলতে পারিনা। তবে আপনার সৌন্দর্যই হলো তার একমাত্র কারণ। সুধাংশু বোসের চেহারা দেখে প্রেমট্রেম বাপ বাপ করে পালিয়ে যাবে। তবে ওর যে আপনার প্রতি দুর্বলতা আছে তা কিন্তু হলফ করে বলা যায়।

অবন্তীরও যে সেরকম সন্দেহ হয়নি তা নয়। কিন্তু ও বুঝতে পেরেছে ওর ভয়ের কোন কারণ নেই। ওর যে সুধাংশুর প্রতি কোন দুর্বলতা নেই তা সুধাংশু বোঝে। আর বোঝে বলেই জোর করে নিজের অনুভূতি চাপাবেনা ও। পট্টনায়কের মুখে সুধাংশুর চেহারা সম্বন্ধে কুৎসিত কটাক্ষ তার ভাল লাগল না। নিজের সম্বন্ধে পট্টনায়কের মনে যে গর্ব আছে তাও প্রকট হয়ে পড়ল। যদিও চেহারার কথা বাদ দিলে আর সব দিকেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে সুধাংশু।

তবু অবন্তী নীরব রইল। কিছু বললনা। ওর নীরবতার অর্থ সম্মতি ধরে নিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল পট্টনায়ক।

—সুধাংশুর কথা থাক্। সেদিন আউটরাম ঘাটে বেড়াবার কথা বললাম। রাজী হলেননা। আজ চলুন হাওড়ার ওদিকে ঘুরে আসি। ওখানে ভাল হোটেল আছে। কয়েক ঘন্টা চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। নিরিবিলি। আশেপাশে কেউ থাকবেনা। শুধু আমি আর আপনি।

— হোটেলে কেন?

—হোটেলে আপত্তি? কেন বলুনতো? হোটেলই তো ভাল। এরকম ভাল হোটেল আছে। কয়েক ঘন্টার জন্য ভাড়া পাওয়া যায়। আপনার খারাপ লাগবেনা। শরীর মন চাঙ্গা রাখার জন্য মাঝে মাঝে কিছু দাওয়াই দরকার হয়।

শরীরের একটি বিচিত্র মোহময় ভঙ্গী করে অবন্তীকে প্রলুব্ধ করতে চাইল পট্টনায়ক। অবন্তীর ভালো লাগলনা। স্পষ্ট করে কিছু না বললেও কেন জানি অন্য রকম মনে হলো কথাটা তার কাছে। হোটেলের প্রসঙ্গ খুব রুচিকর ঠেকল না। সেই মুহূর্তে পট্টনায়কের সুন্দর চেহারাও তার কাছে নরখাদক বাঘের মত হিংস্র লোলুপ বলে মনে হোল। তবু তাকে রূঢ় কথা বলতে পারলনা অবন্তী। পাছে সে বিরূপ হয়ে সম্পর্ক ছেদ করে। মনের এই দুর্বলতার জন্য নিজেরই খারাপ লাগল। সবদিক বাঁচিয়ে জবাব দিল সে।

—আমার বাড়িতে এখন অনেক ঝামেলা চলছে মিঃ পট্টনায়ক। আমার পক্ষে সম্ভব নয় অতক্ষণ সময় বাইরে থাকা।

তবু নাছোড়বান্দা পট্টনায়ক। অবন্তীকে সম্মোহিত করার চেষ্টা তার চোখে, তার কণ্ঠস্বরে।

—দেখবেন ভালো লাগবে।

'ভালো' শব্দটা টেনে টেনে দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টা করে সে। তখনকার মত এড়িয়ে গিয়ে অবন্তী জবাব দিয়েছিল—'পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব। হাতের কাজটা সেরে ফেলি।'

পট্টনায়ক চলে যেতে অনেকক্ষণ ধরে ভেবেছিল সে কথাটা নিয়ে। মোটামুটি সে ভেবে নিয়েছে বিয়ে যদি করতেই হয় পট্টনায়ককেই করবে। এ পর্যন্ত আর কোন যুবকের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেনি সে। পট্টনায়ক যাই বলুক, যাই করুক কিভাবে যেন তার সঙ্গে কেমন একটা গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে।

বাড়ির অমতে বিয়ে করার ঝুঁকি বড় কম নয়। তবু আকাঙ্খিত পুরুষের জন্য সেই ঝুঁকি সে নেবে। কিছু না ছাড়লে কিছু পাবে কেন? শুধু মায়ের জন্যে, দিদির জন্য বড় কষ্ট হয়। ছোড়দার অমতে বিয়ে করলে তাদের সঙ্গেও সর্ম্পক থাকবেনা তার।

হাঁটুতে চোটটা একটু বেশি লেগেছে। আজ কেন? মনে হচ্ছে কালও হয়ত অফিস যেতে পারবেনা। উরুর কাছেও অনেকটা জায়গা ফুলে উঠছে। হাতে পায়ে যন্ত্রণা টের পেতে পেতে অবেন্তীর মনে হয় তার দাদার কথা। মনে হয়

তার বাবা কিংবা দাদা বেঁচে থাকলে এরকম অসম্মান ভোগ করতে হোতনা। বাড়ির হালচাল এমনটা হতোনা।

এই বাড়িতে আর বেশিদিন পড়ে পড়ে এমন অসম্মানের মার খেতে রাজী নয় সে। এরকম ঘটনা ভবিষ্যতেও ঘটবে। তার পাগল দিদি এখন তার ছোড়দা আর বউদির ওপরে খাপ্পা হয় মাঝে মাঝেই এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। মায়ের মত সহ্যশক্তি তার নেই। অতএব তাকেও রেহাই দেবেনা ছোড়দা। কতদিন চলতে পারে এসব? পট্টনায়ককে বিয়ে করলে এসবের সুরাহা হবে। শুধু মুশকিল হোল বিয়ের কথা তোলেনি সে কোনদিনও। হয়ত অবন্তীই তার সুযোগ দেয়নি। একাধিকবার অন্যত্র যাওয়ার প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়েছে সে। বলা যায়না আউটরাম ঘাট বা হোটেলের কথা বলেছিল হয়ত এরকম একটি প্রস্তাব করার উপযুক্ত পরিবেশ পেতেই।

এরপর এরকম কোন প্রস্তাব আসলে রাজী হয়ে যাবে সে। আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেবে তার পারিবারিক পরিবেশ কেমন প্রতিকূল হয়ে পড়েছে। আর সে তাই মুক্তির জন্য কতটা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। পট্টনায়ক তার প্রতি যেরকম আসক্ত তাতে মনে হয় এরকম ইঙ্গিত সে লুফে নেবে।

সন্ধ্যাবেলায় অফিসফেরৎ শ্যামলী এলো দেখা করতে। যোগমায়া দেবী মন ভাল করতে মেয়েকে নিয়ে মঠে গিয়েছিলেন। দাদার মৃত্যুর পর অনেকদিন ছুটিতে ছিল অবন্তী। আজ আবার সে অফিস কামাই করতে চিন্তিত হয়ে পড়ল শ্যামলী।

সম্প্রতি অবন্তীদের বাড়িতে একটি র্মমান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আবার সেরকম কিছু ঘটল কিনা ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল শ্যামলীর। প্রথমে অবন্তী সব খুলে বলতে চাইছিলনা। কিন্তু শ্যামলীর উদ্বেগ দেখে, দুশ্চিন্তা দেখে ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারলনা। আগে এসব ব্যাপার নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে দ্বিধা করেছে।

কিন্তু আজ শারীরিক যন্ত্রণা, মানসিক যন্ত্রণা তার মনের আগল খুলে দিল অনেকটা। কিন্তু আশ্চর্য কথা! সব শুনে শ্যামলী খুব একটা অবাক হোলনা। অবন্তীকে কাঁদতে দেখে সান্ত্বনা দিল সে।

—ভেঙ্গে পড়িসনা অবন্তী। তুই ঠিকই করেছিস। মাথা উঁচু করে নিজের ব্যাক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে গেলে এরকম মার খেতে হয়। মাসিমার সঙ্গে একমত নই আমি এ ব্যাপারে। তবে শারীরিক জোরেই তো আধিপত্য সর্বত্র। সেজন্য সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

অবন্তী বলল—'তোর শুনে নিশ্চয় খুব অবাক লাগছে। ভাবছিস ভদ্র পরিবারে এসব ঘটে কি করে? তাই না? আমিও কোনদিন ভাবতে পারিনি আমাদের বাড়িতে এরকম একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটবে।'

শ্যামলী বলল—'বরং শুনে অবাক হবি আমি একটুও অবাক হচ্ছি না এসব শুনে। তোর দাদার মৃত্যুর পর তোদের বাড়িতে এসে আমার মনে কেমন একটু খটকা লেগেছিল। মনে হয়েছিল তোর ছোড়দা আর বউদিব সম্পর্কটা হয়ত স্বাভাবিক নির্দোষ নয়। কথা না উঠলে এসব কথা তোকে বলতাম না। তবে আমার মনে সন্দেহ জাগার প্রধান কারণ তোর দাদার আত্মহত্যা। আমি নিজে বেশ কয়েকবার তোর ছোড়দা আর বউদিকে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। তোকে বলিনি। পাছে তুই আমার কথার অন্য অর্থ করিস'।

চুপ করে শুনছিল অবন্তী। শ্যামলীর প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তি, অভিজ্ঞতা আর চাপা স্বভাবের সঙ্গেই সে অনেকদিন ধরেই পরিচিত। তবু বিস্মিত হচ্ছিল ভেবে যে বাড়ির লোক হয়েও যে জিনিস বুঝতে দেরি লেগেছে তার সেটা কত সহজে বুঝে ফেলেছে শ্যামলী।

তার চমক তুঙ্গে পৌছাল শ্যামলীর কথা শুনে।

—তুই কি মনে করেছিস তোদের বাড়িতেই এরকম ঘটনা ঘটেছে একমাত্র? আমার দিদিকে দেখেছিস তো? কুমারী মেয়ের মতো থাকে। কিন্তু ওর বিয়ে হয়েছিল। বছর পুরতে না পুরতেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে জামাইবাবুর সঙ্গে ব্যভিচারের কারণে। বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে সর্ম্পক ছিল জামাইবাবুর। আড়ালে আবডালে কত অবৈধ সম্পর্ক থাকে কত নোংরামি চলে। সেরকম ঘটনা পরিচিতদের মুখে শুনিনি তা নয়। কিন্তু দিদির যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সে ছিল পয়লা নম্বরের পারভার্ট। দিদির সামনে দিদিকে দেখিয়ে দেখিয়ে কাজের লোকের সঙ্গে এক বিছানায় শুত ও। তার সঙ্গে যত রকম অভ্যাসতা করা যায় করত। কাজের লোকটা আপত্তি জানাত। কিন্তু ও শুনত না। দিদি সহ্য করতে পারত না। অন্য ঘরে শুতে চাইত। কিন্তু তাতে আপত্তি ছিল জামাইবাবুর। দিদির চোখের সামনে দিদিকে দেখিয়ে নোংরামি না করলে তৃপ্তি পেতনা ও। এতসব সত্ত্বেও দিদি চেয়েছিল ওকে বুঝিয়ে টুঝিয়ে স্বাভাবিক করতে। কিন্তু তার ফল হয়েছে কি জানিস? দিদিকে কিল চড় ঘুসি হজম করতে হয়েছে। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে চলে এসেছে দিদি। কোর্টে মামলা চলেছে। শেষে ডিভোর্স পেয়েছে দিদি।

অবন্তী হতভম্ব হয়ে গেল। তার বাড়িতেই একমাত্র এসব বিশ্রী ঘটনা ঘটেনি।

শ্যামলীদের পরিবারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো বৌদির সঙ্গে দেওরের অবৈধ সম্পর্ক আর তার পরিণামে স্বামীর আত্মহত্যা আরও অনেক বেশি দৃষ্টিকটু।

শ্যামলীর কাছে নিজের মনোভাব ব্যাক্ত না করে পারে না অবন্তী।

—কিন্তু নিজের দাদার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার বল? আর আমার দাদাকে তো তুই দেখেছিস। নিপাট ভালমানুষ। কোন বকম বদ অভ্যাস ছিল না। মেয়েদের সঙ্গে পারতপক্ষে মিশতেই চাইতনা। ভীষণ লাজুক ছিল। শুধু বাইরে নয়, বাড়িতেও কোনদিন নিজের মত জাহির করতনা। ছেলেবেলা থেকে কত কষ্ট করেছে আমাদের সংসারটাকে দাঁড় করবার জন্যে। আমার বিয়ে না দিয়ে নিজে নিজে বিয়ে করতে চাইছিল না। আমরাই জোর জবরদস্তি করে ওর বিয়ে দিলাম। সত্যি কথা বলতে কি বিয়ের পর কিছুদিন দাদাকে খুব খুশি দেখেছিলাম। হঠাৎ যেন পালটে গিয়েছিল কেমন। গুন গুন করে গান গাইত। একটু আধটু রসিকতাও করত আমাদের সঙ্গে। হঠাৎ যেন কি যে হোল। আবার অন্যরকম হয়ে গেল সব কিছু। দাদা গম্ভীর হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গেও আর কথা বলতে চাইত না। মাঝে মাঝে হুট হাট দোকান বন্ধ করে চলে আসত বাড়ি। অনেক সময়ই বাড়ি থাকতনা বউদি। নিজের মনে চুপচাপ শুয়ে থাকত। ইদানীং প্রায়ই জ্বর হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলে বলত তেমন কিছু হয়নি। তারপর তো এই ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ঘটল। আমাদের দুঃখ শুধু এই ভেবে যে আমরা যদি আরোও বেশি সঙ্গ দিতাম দাদাকে তাহলে হয়ত অতটা ভেঙ্গে পড়ত না। আসলে নিজে অত ভালমানুষ ছিল বলে অতটা শয়তানী আর নোংরামি হজম করতে পারেনি। লজ্জায় ঘেন্নায় অভিমানে চলে গেল সকলকে ছেড়ে।

শ্যামলীব খুব কষ্ট হচ্ছিল। অবন্তীর দাদাকে কয়েকদিন মাত্র দেখেছিল সে। দেখামাত্র ভাল লেগেছিল। গম্ভীর স্বল্পবাক মানুষটির চেহারাব সততা ও সরলতার ছাপ ছিল। অবন্তীদের তুলনায় সাদামাটা লেগেছিল চেহারাটা। তবে তার বড় কারণ জৌলুশের অভাব। নাহলে মুখ চোখ খারাপ ছিলনা মোটেই।

শ্যামলী বলল—'অবন্তী আমার মনে হয় তোর এখন বিয়ে করা উচিত। ভাল দেখেশুনে। সংসারে সমস্যা ক্রমশঃ বাড়বে বই কমবেনা। ভবিষ্যতে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। অবন্তী সায় দিল।

—আজ মা বা বৌদি না আটকালে আমাকে হয়ত জীবিত দেখতিনা। চিরদিন স্বার্থপর আমার ঐ ছোড়দা। দাদা যে বরাবর আমাদের দেখেছে তবু মুখ ফুটে কোনদিন বলেনি আমরা ওর ভার। বরং সব সময় চেষ্টা করত যাতে আমরা

কেউ বাবার অভাব টের না পাই। ছোড়দাকে ব্যবসাতে টেনে এনেছে তো দাদাই। কিন্তু ছোড়দার সে কি রোয়াব! উঠতে বসতে চোখা চোখা কথা শুনিয়েছে। সুযোগ পেলেই বলত আমরা ওর ভার। আমি যে চাকরিতে ঢুকেছি তা অনেকটা এসব কারণেই। দাদার কিন্তু খুব মত ছিল না। মায়ের তো নয়ই।

শ্যামলী—'সে এক হিসাবে শাপে বরই হয়েছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের ব্যাক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। কিন্তু বিয়ের কথা কি ভাবছিস? তোর ছোড়দা যতদূর বুঝছি কিছুই করবেনা। মাসিমাও ভালো মানুষ। তুই নিজেই দেখেশুনে বিয়ে কর'।

অবন্তী বুঝতে পারছিল না শ্যামলী তাকে এসব কথা কেন বলছে? পট্টনায়কের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা তো ওর অজানা নয়? ওকি তবে ভাবছে অবন্তী ফ্লার্ট করছে?

এক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিল অবন্তী।

—বিয়ে করবনা কেন? এই বাড়িতে চিরকাল থাকার ইচ্ছা নেই আমার। কেন তুই কি ভাবছিস পট্টনায়কের সঙ্গে ফ্লার্ট করছি করবি?

—কি বলছিস তুই অবন্তী? পট্টনায়ককে বিয়ে করবি?

—নিশ্চয়। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা কি তোর অজানা?

—তা বলছিনা। কিন্তু তুই এতদূর এগিয়েছিস? পট্টনায়ককে জিজ্ঞাসা করলিনা?

—কি আশ্চর্য। বিয়েটা কি আমার একার ইচ্ছেমত হবে না কি?

—পট্টনায়ক বলেছে তোকে বিয়ে করবে?

শ্যামলীর গলায় আন্তরিক বিস্ময়ের ছোঁয়া।

অবন্তী বিরক্ত হোল।

—তুই এত অবাক হচ্ছিস কেন? ও আমাকে বিয়ে করতে পারেনা?

—ও তোকে বিয়ে করবেনা অবন্তী। তোকে তো আমি বলেছি এসব লোক অন্য ধরনের। এরা অনেক মেয়েকেই নাচাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে অনেক পণ নিয়ে বিয়ে করবে অভিভাবকদের পছন্দ করা কোন শান্তশিষ্ট মেয়েকেই। আমি তোকে বলেছিলাম ওসুবিধার লোক নয়। তুই আমার কথা কান দিলিনা। ইচ্ছা করে কষ্ট পেলি অবন্তী। তুই যে এতটা এগিয়েছিস তা কিন্তু ভাবিনি আমি।

অবন্তী তার শারীরিক কষ্ট ভুলে গিয়েছিল। ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছিল সে। শ্যামলী ওর মন ভাঙ্গাতে চাইছে কেন? ওর কেন যেন মনে হোল নিশ্চয় কোনদিন ও প্রত্যাখাত হয়েছিল পট্টনায়কের কাছে। অপমানের সেই জ্বালা এখনও ভোলেনি। ছলে ছুতোয় তাই ওর নিন্দামন্দ করে সুখ পায়।

কিন্তু অবন্তীকে পট্টনায়ক কত ভালোবাসে তা তো ওর জানা নেই। ও তো দেখেনি পট্টনায়কের চোখের দৃষ্টি? কিংবা শোনেনি ওর মুখের ভাষা?

দাদার মৃত্যুর পর বেশ কেয়েকদিন অনুপস্থিত থাকার পর যখন সে অফিসে এসেছিল তখন পট্টনায়ক ওর কাছে এসে প্রায় আর্তনাদ করেছিল।

—আপনি আমার কি করলেন বলুন তো? এই কয়দিন আপনি আসেননি। আমি কাজে মন দিতে পারিনি। উঠতে বসতে আপনার চেহারা ভেসে উঠেছে আমার চোখের সামনে। মেয়েদের কেন অবলা বলে, দুর্বলা বলে বুঝিনা। আসলে দুর্বল কিংবা বলহীন তো আমরা পুরুষরা।

ওর ইচ্ছা করল শ্যামলীকে শোনায় কথাগুলো। ওকে জিজ্ঞাসা করে এর চেয়েও স্পষ্ট করে ভালোবাসার কথা কিভাবে বলা যায়?

নিজেকে সামলে নিল অবন্তী। থাক না। দেখা যাক্ না আর কি বলে শ্যামলী। তখন নয় ঝুলি থেকে বেড়াল বার করা যাবে। শ্যামলী কিন্তু আর কথা বাড়াল না। বাড়ি যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

—আজ চলি। মাসিমার সঙ্গে দেখা হলো না। ওঁর ফিরতে বোধহয় দেরি হবে!

—মঠে গেছেন তো! পাঠ শেষ না হলে হয়ত আসবেন না।

—অরুদি অতক্ষণ চুপ করে থাকবে?

—মা বলেন মঠে নাকি শান্ত হয়ে শোনে দিদি। কোন ঝামেলা করেনা।

—চলি। তোর বউদিকে কিছু বলে গেলাম না। তবু তো আসার পর চা বিস্কুট দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে!

—রাখ তো! ওর মুখ দেখলেও আমার ঘেন্না হয়।

দরজার কাছে এসে মুখ ফেরায় শ্যামলী। একটু থমকে দাঁড়ায়। তাকে দেখে বোঝা যায় কিছু একটা বলতে চাইছে সে। কিন্তু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

অবন্তীই প্রশ্ন করে।

—কিছু বলবি শ্যামলী?

—সামনের মঙ্গলবার পট্টনায়কের বিয়ে। ও আজ থেকে ছুটি নিয়েছে।

অবন্তীর প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য দাঁড়ালনা শ্যামলী। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে।

দশ

অবন্তীর বাড়ির পরিবেশ উত্তরোত্তর খারাপ হতে লাগল। অরুন্ধতীকে নিয়ে প্রায় রোজই অশান্তি লাগছে। আগে তার মধ্যে এমন চণ্ডালে রাগ দেখা যায়নি কোনদিন। এখন তার হাবভাব প্রায়ই বদ্ধ উন্মাদের মত দেখায়। চিৎকার করে জিনিসপত্র ছুঁড়ে সে তার ক্রোধ ব্যক্ত করে যখন তখন। বউদির ওপর তার রাগের যেন সীমা পরিসীমা নেই। তাকে দেখবামাত্র তার ক্রোধ জিগির ওঠে। চুলের মুঠি ধরে কিল চড় ঘুঁষি লাগাবে তখন সে বউদিকে।

অরণী বাড়ি না থাকলে যোগমায়া দেবী বৌকে ছাড়ান কোনমতে তার কবল থেকে। কিন্তু অরণী থাকলে আধমড়া না করে ছাড়েনা সে অরুন্ধতীকে। আজকাল সেও যেন দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে। মাকে পর্যন্ত পরোয়া না করে তেড়ে আসে মাঝে মাঝে।

একদিন মাঝ রাত্রিতে পরিস্থিতি রীতিমত সঙ্গীন হয়ে উঠল। দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমোন যোগমায়া দেবী। সেদিন হঠাৎ দুমদুম আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। ধড়মড়িয়ে উঠে দেখেন এপাশে অরুন্ধতীর জায়গা শূন্য। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন তার পাগল মেয়েই আওয়াজ করবে ওভাবে। অবন্তীকে আর জাগালেন না তিনি। সারাদিন অফিস করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। তার ওপরে স্নেহ ভালবাসাহীন বাড়ির পরিবেশে ভাল করে হাঁফ ফেলতেও পারেনা মেয়েটা। ইদানীং মাঝে মাঝেই রাত্রে শুয়ে শুয়ে নিঃশব্দে কাঁদে। যোগমায়া দেবী টের পান সব কিছু। কিন্তু সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাননা বলে নিঃশব্দে কাঠ হয়ে পড়ে থাকেন। অবন্তীকে বুঝতে দেননা তিনি জেগে আছেন। অঘোরে ঘুমোচ্ছে দেখে অবন্তীকে আর উত্যক্ত করলেননা তিনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে তার বড় ছেলের ঘরের সামনে এসে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান যেন। অরুন্ধতী দুমদাম করে কিল মারছে দরজায়। কিন্তু দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমন বন্ধই রইল। ভেতরে যে কোন জীবিত প্রাণী আছে তা মনে হচ্ছিলনা। এমন নিঃসাড়ে কোন জীবিত ব্যক্তির ঘুমিয়ে থাকা সম্ভব নয়। যোগমায়া দেবীর মনে হোল একটাই কথা। যে জেগে ঘুমোয় তাকে ঘুম থেকে জাগানো যায় না।

মেয়েকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেন তিনি।

—লক্ষ্মী মা আমার। এমন করছ কেন? চল ঘুমোবে চল।

কিন্তু অরুন্ধতীর ঘাড়ে যে দুষ্ট সরস্বতী ভর করেছিল সে এত সহজে নিস্তার হলোনা। মায়ের কথায় কান দিলনা সে। সমানে আগের মতই দুমদাম করে ধাক্কা মারতে লাগল। অর্চনার ঘরের দরজা বন্ধই রইল। কিন্তু অবন্তীর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিছানায় মা বা দিদিকে না দেখতে পেয়ে সে অনুমান করল দিদি আবার কোন উৎপাত শুরু করেছে। দরজার কাছে আসামাত্র সব কিছু অনুধাবন করতে পারল সে। অবন্তীকে উঠে আসতে দেখে যোগমায়া দেবী ততোধিক শঙ্কিত হলেন। পাগল মেয়ের থেকে এই মেয়ের প্রতিক্রিয়ায় বেশি ভয় তার।

মাঝ রাত্রিতে বাড়িতে আবার কি তুলকালাম কাণ্ড শুরু হবে ভেবে তার বুকের মধ্যে দড়াম দড়াম করে হাতুড়ির মত আওয়াজ হতে থাকে। অবন্তীকে মৃদু ধমক দিয়ে শুতে পাঠাবার চেষ্টা করেন তিনি।

—তুই আবার উঠে এলি কেন বিন্তী? সারাদিন খেটেখুটে আসিস। এখন যদি ঠিকমত ঘুম না হয় তাহলে চলে কি করে? আমি সামলাব তোর দিদিকে। মাঝ রাত্রিতে আবার যে কি পাগলামি শুরু করেছে! তুই দাঁড়িয়ে থাকিসনা। শুতে যা।

মায়ের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকায় অবন্তী।

—তুমি কি মা? আমাকে ভয় পাচ্ছ তুমি? পাছে আমি সব কিছু বুঝে ফেলি? ভাবছ এতদিনেও আমার চোখে কিছু পড়েনি? এত জোরে দরজা ধাক্কা দেওয়ার পরেও কেউ শুনতে পায়না মনে করেছ? ইচ্ছা করেই দরজা খুলছেনা।

অবন্তীর কথার জবাব দিলেন না যোগমায়া দেবী। বড় মেয়েকে বলপ্রয়োগে দরজার সামনে থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকেন ক্রমাগতঃ। একটু পরে অরুন্ধতী কি বুঝল কে জানে? দরজা থেকে স্বেচ্ছায় সরে এসে আবার নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। অবন্তী তখনও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে যোগমায়া দেবী তাড়া লাগান তাকে।

—কি হোল বিন্তী? দাঁড়িয়ে কেন? যা শুতে যা।

অবন্তী মৃদু কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলল—'ছোড়দা কোথায়'?

শক্ত হলেন যোগমায়া দেবী।

—আমি বলেছি শুতে যা। অনেক কেলেঙ্কারী হয়েছে। তোদের জন্য কি আমি গলায় দঁড়ি দেব বিন্তী?

—তুমি এভাবে চোখ বুজে আছ বলেই তো এসব হচ্ছে। এতটুকু গ্রাহ্য করছেনা কেউ তোমাকে। কেন? এখনও তুমি বেঁচে আছ।

—আমি বেঁচে নেই বিন্তী। আমি মরে গেছি কবেই। কিন্তু আর কথা বাড়াসনা। আবার মাঝ রাত্রে মারধর, চেঁচামেচি শুরু হলে পাড়ার লোক আর টিকতে দেবে না আমাদের। যা তা বলবে।

—এভাবে যা তা বলা বন্ধ করবে তুমি মা? তুমি ভাবছ কেউ কিছু দেখছে না, কেউ কিছু বলছেনা? অনেক আগে থেকেই বলতে শুরু করছে লোকে।

—আমি চললাম বিন্তী। তোর সঙ্গে কথা বাড়াবার ইচ্ছে নেই আমার।

অবন্তী ছোড়দার ঘরের কাছে এসে দেখে দরজা ভেজানো। ইচ্ছা করেই নিঃসংশয় হওয়ার জন্য বাতি জ্বালিয়ে বিছানার দিকে তাকায়। বিছানায় কেউ নেই। অপ্রত্যাশিত নয় এ জিনিষ। তবু ভাল করে নিঃসংশয় হয়ে ছি ছি করে উঠল তার মন। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল একটি কথা। তার দিদি কি দেখতে পেয়েছিল? আর তার দুর্বল মস্তিষ্ক সত্ত্বেও দুয়ে দুয়ে চার করতে পেরেছিল? প্রতীপের মুখে শোনা 'মেথোড ইন্ ম্যাডনেস্' কথাটা বারবার হানা দিতে থাকল তার চেতনায়।

পরদিন সকালবেলায় ঠাকুর ঘরের পূজার্চনা শেষ করে যোগমায়া দেবী সামনে এসে দাঁড়ান অরণীর। খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকাল সে সবিস্ময়ে। যোগমায়া দেবী লক্ষ্য করলেন অন্যদিনের চেয়ে অনেক স্তিমিত, অনেক অবসাদগ্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে। অপরাধীর মত কেমন যেন ত্রস্ত, শঙ্কিত আর নিস্তেজ তার মুখভাব। কোনরকম ভনিতা না করে দৃঢ় গলায় যোগমায়া দেবী তার আদেশ ঘোষণা করলেন।

—রণ তুই বিয়ে কর অর্চনাকে।

—কি বলছ তুমি মা?

অকৃত্রিম বিস্ময় ধ্বনিত হলো অরণীর গলায়।

—ঠিকই বলছি। এসব কেলেঙ্কারির চেয়ে সে অনেক ভাল।

বিস্ময়াহত ছেলেকে দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন যোগমায়া দেবী।

অবন্তী অবাক হয়ে গেল শুনে। অরণীর মত একই প্রশ্ন উচ্চারিত হলো তার কণ্ঠে।

—কি বলছ তুমি মা?

—হ্যাঁ বিন্তী। এটাই ভাল সমাধান। সবই তো বুঝছিস। আমরা চাই বা না

চাই ওদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা যাতে ব্যভিচার না হয়ে ওঠে তারই জন্য এই বিধান দিলাম আমি। তুই ভাবছিস আমি কিছু না ভেবে বলেছি? তা নয়রে। অনেকদিন আগেই মনে হয়েছে আমার একথা। তবে এভাবে অবশ্য চিন্তা করিনি। ভেবেছি রণর যখন অত পছন্দ অচর্নাকে তখন ওতো বলতেপারত আগে। ইন্দর বিয়ে আমি অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে দিতাম। ইন্দ চলে যাবার পর পরও এরকম কথা চিন্তা করিনি। কিন্তু তারপর চোখের সামনে যা দেখছি তাতে মনে হোল আর দেরি না করে ওদের বিয়ে করাই ভাল।

—দিদিকে দেখেছ তো? ওদের দেখলে কেমন খাপ্পা হয়ে ওঠে? এরপর সামলাতে পারবে ওকে?

—তা কি করব বল? পাগল মেয়ের জন্য ওদের পথে বাধা হব? তুই আর কিছু বলিসনা বিন্তী। আমি মা হয়ে আমার আত্মঘাতী ছেলের শোক চাপা দিয়ে যখন রণকে ও কথা বলতে পেরেছি তখন তোদের আর কিছু বলার মানে হয় না।

এ বিয়েতে অনুষ্ঠানের প্রশ্নই ওঠেনা। রেজিস্ট্রি বিয়ের নিয়মমতো নোটিশ দেবার নির্দিষ্ট সময়সীমা উত্তীর্ণ হবার পর যথারীতি রেজিস্ট্রী বিয়ে করল অরণী আর অর্চনা। অর্চনার সিঁথিতে আবার সিঁদুরের রেখা উঠল। ওদের উৎফুল্ল প্রাণোচ্ছ্বল মুখ দেখে অবন্তী আর যোগমায়া দেবীরও মনে হোল এ অন্ততঃ মন্দের ভাল হয়েছে। চোরাগোপ্তা ব্যভিচারের লজ্জা রইলনা অন্ততঃ।

লোকে যা বোঝার তা অনেক আগেই বুঝেছে। আর যা বলার তাও অনেক আগে থেকেই বলতে শুরু করেছে নিশ্চয়। এখন সবদিক রক্ষা করে এই ব্যবস্থা নিয়ে খারাপ করেননি তিনি। শুধু মাঝে মাঝে মনে মনে তার ছেলেটিকে ডেকে তিরস্কার করেন।

—কি বোকা তুই ইন্দ! ওদের কি এসে গেল তোর মৃত্যুতে? ওরা কি একবারও ভাবছে তোর কথা? কেমন হেসেখেলে দিন কাটাচ্ছে ওরা। তুই কেন বোকার মত আত্মঘাতী হলি? তোর কি লাভটা হোল? তোর দুঃখী মায়ের কথাটা পর্যন্ত ভুলে গেলি? মনে পড়লনা বেচারা বোনদুটোর কথা? অর্চনার মত বউ আর রণর মত ভাইয়ের জন্য তোর দামী জীবনটা তুই শেষ করলি এভাবে?

অরুন্ধতীকে এখন অনেক বেশি চোখে চোখে রাখেন যোগমায়া দেবী। অরণী আর অর্চনার তাই প্রয়োজন হয়না ওর ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ার।

সব দেখেশুনে অবন্তীর মনে হয় হঠাৎ যেন তার বয়স অনেকটাই বেড়ে গেছে। জীবনের উত্তাল অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে

পেরিয়ে এসেছে সে অনেক বিস্ময়, অনেক আদর্শ আর অনেক স্বপ্ন নিয়ে মোড়া তারুণ্যের বন্দর। নিজেকে আজকাল তার নিরালম্ব, নিরাশ্রয় মনে হয়। আরও মনে হয় বড় অবাঞ্ছিত সে। কেউ তাকে চায়না। জোর করে এ সংসারে পড়ে আছে সে। তার ইচ্ছা করে অন্য কোথায় ও চলে যায়। কিন্তু মনে পড়ে তার অকালবৃদ্ধ মায়ের কথা। তার বুদ্ধিভ্রষ্ট দিদির অসহায়তার কথা। মনে হয় নিজের প্রয়োজন না হলেও এদের প্রয়োজনেই থাকতে হবে তাকে সংসারে।

কিন্তু তার বিধবা বৌদির আবার সধবা হওয়া চেহারার অশ্লীলতা তাকে পীড়া দেয়। তার দেহসর্বস্ব ছোড়দার নির্লজ্জ কামাচার দেখে সারা শরীর রিরি করে ওঠে। তার মনে হয় এদের সে সহ্য করতে পারছেনা। উপায় থাকলে এদের সংস্পর্শ থেকে দূরেই থাকত সে। কিসের সম্পর্ক তার এদের সঙ্গে?

এই দুটি খুনী একযোগে মিলিতভাবে একটি মানুষকে খুন করেছে। এখন তার সবরকম দায় থেকে মুক্ত হয়ে অবারিত জীবনযাপন করছে। কি সুন্দর সপ্রতিভভাবে লোকের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন অনুতাপ, কোন ন্যায়নীতিবোধের তাড়না এদের উত্যক্ত করছে না। এরা কি মানুষ? এদের সঙ্গে আপস করে চলাটাও কি চরম অন্যায় নয়?

তার মায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা চলেনা। তার আজন্ম ভীরু মা খালি সবদিক বাঁচিয়ে চলার কথা ভাবেন। তার ব্যক্তিত্বের সামান্য যে স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল সেদিন সকালে ছোট ছেলেকে বিয়ের নির্দেশ দেওয়ার মধ্যে তার সব তেজ যেন নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

তাকে দেখে কে বলবে তার এই সংসারে অস্বাভাবিক দুটি ঘটনা ঘটে গেছে। অন্য আরও দশটা পরিবারের মা বা শাশুড়ীর মতই সহজ স্বাভাবিক আচরণ করে। স্বামীঘাতিনী বিশ্বাসহন্ত্রী দুশ্চরিত্রা পুত্রটির সঙ্গেই বা তার ব্যবহারে কেন হেরফের নেই তা মানবচরিত্রের এক জটিল রহস্যেব মত তাকে তাড়া করে মাঝে মাঝে।

কিন্তু এই পরিবারের বাইরেই বা তার জন্য শান্তির সেই আশ্রয় কই? অফিসে আজকাল নিজেকে নিয়ে তার বড় লজ্জা। মনে হয় অনেকেই মুখটিপে মনে মনে হাসছে তাকে দেখে। পট্টনায়কের সঙ্গে তার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা অজানা নেই অনেকেরই। সেই পট্টনায়ক তাকে নাচিয়ে অনায়াসে দেশে গিয়ে বিয়ে করে আসল অভিভাবকদের পছন্দ করা মেয়েকে।

অবন্তী তার কাছে ছিল শুধুমাত্র তার খেয়াল মেটাবার উপকরণ মাত্র। ঐ লোকটির মনে সে যে এতটুকু গভীর ছাপ ফেলেনি তা তো দিবালোকের মতই

স্পষ্ট। তার সবচেয়ে খারাপ লাগছিল এই ভেবে যে বোকার মত নিজের মত অনেক কিছু ভেবে নিয়েছিল সে। পট্টনায়ক যে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে তা যেন চিন্তার অতীত ছিল তার।

পুরুষের ছলচাতুরীর নমুনা দেখে সে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে। পট্টনায়ক তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিল। অবন্তী বুঝেছিল সাফাই গাইবে ঐ নির্লজ্জ পুরুষটি। সে তার সুযোগ দেয়নি। এড়িয়ে গিয়েছিল কৌশল করে। কিন্তু একদিন সুযোগ পেয়ে তাকে ধরল পট্টনায়ক।

বাড়ির কি একটা দরকারে অফিস থেকে অনেক আগে ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিল। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিল সে বাসের অপেক্ষায়। হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে পট্টনায়ককে দেখে। মিষ্টি মিষ্টি হেসে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে পট্টনায়ক।

অবন্তীর মুখ শক্ত হয়ে উঠল। পট্টনায়ককে না দেখার ভান করল। একটু এগিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল সে ইচ্ছা করে। কিন্তু সেসব ইঙ্গিত গ্রাহ্য না করে তার সামনে চলে এল পট্টনায়ক। একেবারে তার কাছে এসে আগের মত মাদকতাময় ভঙ্গীতে তাকে প্রশ্ন করল।

—আমার সঙ্গে কথা বলবেননা বলে ঠিক করেছেন? কিন্তু আমার সব কথা না শুনে আমাকে অপরাধী বানিয়ে রাখবেন। সেটা কি ন্যায়বিচার হবে?

কথাটা বলে অবন্তীর মুখভাব লক্ষ্য করে পট্টনায়ক। অবন্তী যদি ক্ষেপে গিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় তাকে যা তা বলে অপমান করে তাহলে সেটা খুব রমণীয় হবেনা। অবন্তীকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু সাহস হয় তার। অবন্তীর একেবারে পাশটিতে এসে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করে।

—জানেন নিশ্চয় আমার বাবা মায়ের আমি বড় ছেলে। আমাকে খুব ভালবাসেন তারা। আমার জন্য নিজেদের পছন্দমত পাত্রী বেছেছেন। আমি ভেবেছিলাম ওদের বুঝিয়ে টুঝিয়ে নাকচ করে দেব সেই সম্বন্ধ। কিন্তু বাবা ভয় দেখালেন যদি আমি ওদের পছন্দমত ওখানে বিয়ে না করি তাহলে তার পরিণাম খুব ভাল হবেনা। আমাকে পরে পস্তাতে হবে তার জন্য। আপনার কথা জানিয়ে চিঠিও দিয়েছিলাম। কিন্তু বাবা শুনতে চাইলেন না। বললেন উড়িষ্যা বাংলা মিশ খাবেনা। আমি যেন ঐসব দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করি। শুধু তাই নয়। আমাকে হুমকি দিলেন পত্রপাঠ আমি যদি দেশে চলে না আসি তাহলে আর কোনদিনই আমার মুখদর্শন করবেন না। আপনাকে সত্যি বলছি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমার বাবা ভীষণ রাগী মানুষ। দুর্বিনীত ছেলেকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য আত্মহত্যা

করতেও বাঁধবেনা তার। আমার বাবাকে তো আমি চিনি। সেইসময়ে আমার অবস্থার কথা ভাবুন একবার। আপনি ছুটি নিয়ে বাড়িতে। সামনে এমন কেউ নেই যার সঙ্গে পরামর্শ করে আমার কি করণীয় তা ঠিক করতে পারি। একদিকে দুঃশ্চিন্তা বাবা হঠাৎ না কিছু করে বসেন। আরেক দিকে প্রচণ্ড মনোকষ্ট। আপনাকে হারাতে হবে। শেষ পর্যন্ত নিজের স্বার্থ বা সুখের চিন্তা বিসর্জন দিয়ে চলে গেলাম দেশে। মত দিলাম বিয়েতে। তবে বিশ্বাস করুন আমার কোন উপায় ছিল না। বাবার কথামত না চললে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিতেন যা সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়াতে হোত আমায়।

বলতে বলতে জলে ভরে আসে পট্টনায়কের দুই চোখ। তার গলাটা কেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা শোনায়। তার বিষণ্ণ করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে অবন্তীর মন হঠাৎ দুর্বল হয়ে গেল। এসব কথা সে অবিশ্বাস করে কি করে? সে জানে পট্টনায়ককে বিয়ে করতে চাইলে তার বাড়ির পরিবেশও ধূমায়িত হয়ে উঠত। তবে তার মা আত্মহত্যার হুমকি দিতেননা নিশ্চয়ই। কিংবা মুখে বললেও তা কার্যে পরিণত করতেননা কখনই।

তার ছোড়দা যে কি বলতনা আর কি করতনা তা তার অনুমানের বাইরে। তার ছোড়দার চক্ষুলজ্জার ব্যাপারটা একেবারে শূন্য বললেই চলে। নিজের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য সে যে লজ্জা পাচ্ছে তা মনে হয়না। বোন কোন উৎকলীকে বিয়ে করতে চাইলে সেটা সে ভালভাবে কখনই মেনে নিতনা।

উড়িষ্যা অনেক বেশি অনগ্রসর। সেখানে পুত্রের পিতার মনোভাব ততোধিক রক্ষণশীল হবারই কথা। আর ব্যক্তিবিশেষে তার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু এসব কোন চিন্তা না করে পট্টনায়ককে সে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। ভেবেছিল সে চালাক, চতুর, সুবিধাবাদী। অবন্তীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছে।

কিন্তু এসব ভেবেও মনের থেকে সন্দেহের কাঁটাটা সরিয়ে নিতে পারেনা। মনে হয় কোন গূঢ় মতলব হাসিল করতে চাইছে না তো পট্টনায়ক?

হঠাৎ পট্টনায়কের কথা শুনে চমকে গেল সে। তার মনে হোল তার মনের চিন্তাটা বুঝি ধরা পড়েছে তার চোখের পরদায়। চারপাশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে মিনতি পেশ করে পট্টনায়ক।

—মিস মিত্র বিশ্বাস করুন চালাকি করছিনা আমি। আপনার সঙ্গে পুরনো সম্পর্ক আবার জোড়াতালি দেওয়ার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। আমি বুঝি এরপর আমাদের হয়ত আগের মত মেলামেশা করাটা ঠিক হবেনা। তবু আমার একান্ত অনুরোধ আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেবেননা। আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে

নেবেননা। কিছুদিন ধরে আমাকে বড় কষ্ট দিচ্ছেন। তাই আজ আপনাকে সব জানালাম। আপনি নিজেই বিবেচনা করে দেখুন আমি কতটা দায়ী।

অবন্তীর খুব কষ্ট হচ্ছিল। একান্ত প্রিয় পুরুষটির বঞ্চিত সান্নিধ্যে তার মনে অনেকগুলি প্রশ্নের এলোমেলো ঝড় উঠেছিল। পট্টনায়ক তো সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তাকে কেন সে অকারণ শাস্তি দেবে? আর তারা দুজনেই দুজনকে ভালবাসে। অভিভাবকদের রক্ষণশীলতার বলি হবে কেন তাদের সেই ভালবাসা? মান্ধাতা আমলের বিধিনিষেধ আজকের এই অনগ্রসর যুগেও মেনে চলবে কেন তারা? সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এল পাপ, পুণ্য, দেশাচার, সমাজমানুষের কথা। মনে হোল তাদের স্বাধীনতা কই? তারা তো এসবের নিগড়ে বাঁধা। কিন্তু মুখে সে কিছুই না বলে নীরব রইল।

পট্টনায়কই কথা বলল এবার।

—বাসস্টপে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলা যায়না। আপনি যদি অনুমতি দেন আরেকদিন এসম্পর্কে কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে আজ আর আপনার সময় নষ্ট করবনা।

অবন্তীকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল পট্টনায়ক সেখান থেকে। তার কয়েকদিন পরেই আবার যোগাযোগ করল পট্টনায়ক। ইতিমধ্যে অবন্তীর মনে অনেক টানাপোড়েন চলেছিল। শেষ পর্যন্ত তার মনে হলো সে হাঁফিয়ে উঠেছে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই সে বন্ধ করবেনা মেলামেশা। তার অসুখী জীবনে ভালোবাসার স্বাদ পেয়ে বাঁচার অর্থ খুঁজে পেয়েছিল একদিন! এখন আবার তাকে ঘিরে ধরেছে হাঙ্গর, কুমীরের মত যত দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অশান্তি।

কিন্তু তাকে বাঁচতে হবে। তার মায়ের মত মার খেতে খেতে অকালে বুড়িয়ে যাবেনা সে। জীবনের কি অর্থ যদি সুখ শান্তি না থাকে? প্রয়োজন হলে ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে ছিনিয়ে আনবে সে সেই সুখ শান্তি আনন্দ।

অনেক দিনের ব্যবধানে তাদের দুজনের সেই সাক্ষাৎ মাঝখানের ফাঁকটুকু ভরিয়ে দিয়েছিল নিবির রমণীয়তার স্বাদে। শহরতলীর নিরালা পরিবেশে মুখর হয়ে উঠেছিল পট্টনায়ক। আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেছিল আসলে সে ভালবাসে অবন্তীকেই। অবন্তীর সঙ্গে তুলনায় পৃথিবীর অন্য সব মেয়েকে তার নীরস অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মনে হয়। সে আরও বলেছিল নিজেকে অপরাধী মনে হয় তার। কিন্তু কি করবে সে? অবন্তীর সঙ্গে দেখা না হলে তার মন যে অস্থির হয়ে ওঠে।

অবন্তী সব শুনে তার কৌতূহল ব্যক্ত করেছিল।

—আপনার স্ত্রী কেমন দেখতে?

—লোকে তো সুন্দরীই বলে। কিন্তু আপনার সৌন্দর্য যে একেবার দেখেছে তার চোখ তো বন্দী থাকবে সেই সৌন্দর্যের মোহময় জালে। স্বাধীনভাবে অপরের সৌন্দর্য সে বুঝবে কেমন করে?

সেই স্তুতির মধ্যে বাড়াবাড়ি আছে বুঝেও দারুণ খুশি হয়ে উঠেছিল অবন্তী। তবু প্রতিবাদ করেছিল লজ্জিত মুখে।

—আপনি বড় বাড়িয়ে বলেন।

অবন্তীকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দুঃসাহসিক একটি কাজ করেছিল পট্টনায়ক। ঠোঁটের ওপর চেপে ধরেছিল নিজের দুই লুব্ধ ঠোঁট। দ্রুত একটি চুম্বন উপহার দিয়ে বলেছিল—'ধৃষ্টতার এই হলো উপযুক্ত শাস্তি'।

ত্রস্তভাবে চারদিকে তাকিয়ে বিরক্তিপ্রকাশ করল অবন্তী।

—কি করছেন? কি ভাববে লোকে?

—লোকে যা খুশি ভাবুক। আপনি না ভাবলেই হোল।

মুহূর্তের মধ্যে একটু আগের আনন্দ, স্ফূর্তি সব যেন মিলিয়ে গেল হঠাৎ। তার মনে হোল বিবাহিত একটি পুরুষের সঙ্গে এরকম সম্বন্ধ স্থাপনের কি নাম দেবে লোকে? আর সদ্যবিবাহিত একটি পুরুষই বা কেন তার সঙ্গে এরকম সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী? অবন্তীই বা এরকম দুর্বলতার প্রশ্রয় দিচ্ছে কেন? হঠাৎ তার মনে হোল এই যে লোকটি তার পাশে বসে আছে সে খুব চতুর সুবিধাবাদী। হয়ত বা গাছেরও খাবে আবার তলারও কুড়োবে। অবন্তীকে খুব সস্তা মেয়ে মনে করে মজা লুটতে চাইছে। সে কেন এর বিকৃত অন্যায় ইচ্ছাপূরণের যন্ত্র হবে?

অবন্তী উঠে দাঁড়াল।

—চলুন। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে।

করুণ অনুনয়ের সুর বাজে পট্টনায়কের গলায়।

—আর একটু বসিনা। ট্যাক্সি করে পৌঁছে দেব আপনাকে।

নরম হলোনা অবন্তী।

—কি বলছেন? আমার আর দেরি করলে চলবে না। আমি আর একটুও দাঁড়াবনা।

অবন্তীকে গমনোদ্যত দেখে বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়ায় পট্টনায়ক।

—চলুন। এত ভাল লাগছিল! আবার কবে দেখা হবে?

—বলতে পারছিনা।

অবন্তীর গম্ভীর মুখ দেখে পট্টনায়ক বুঝতে পারল কোন কারণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে। কিন্তু কারণ অনুধাবন না করতে পেরে ভাবল মেয়েদের মন বোঝা দায়। কিছুক্ষণ আগেই যে এত সহজসরল অনায়াসলভ্য ছিল সে হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে জটিল দুর্বোধ্য দুর্লভ হয়ে উঠল। কিন্তু বিধাতার আপন খেয়ালে সৃষ্টি এই নারীদের তল খোঁজা তার সাধ্য নয়। মনে মনে হতাশ আর বিরক্ত হয়েই উঠে দাঁড়াল পট্টনায়ক। অবন্তীকে অনুসরণ করল মনে মনে তাকে গালমন্দ করতে করতে।

পরপর কয়েকদিন পট্টনায়ককে এড়িয়ে চলল অবন্তী। পট্টনায়ক অবশ্য যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অবন্তী পাত্তা দিল না। তার মনে হঠাৎ অন্য সুরে অন্য রাগিণী বাজছিল। হঠাৎ কিভাবে যেন অনমনীয় এক দৃঢ়তা এসেছিল তার মধ্যে। জীবনের অসহায় দুর্বলতাগুলো বর্জন করে শক্ত মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চাইছিল সে।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই আবার কোথায় অন্তর্হিত হলো সেই দৃঢ়তা, কাঠিন্য আর সবলতা। তার মনে হোল প্রেমহীন জীবনে বৈচিত্র্য কই? বাড়ির পরিবেশে কেবলই পালাই পালাই করে মন। অফিসের কাজ একঘেয়ে লাগে।

দাদার মৃত্যুর পর সুধাংশু বোস প্রায়ই তার কাছে এসে কথাটথা বলত। জীবনের অনিত্যতা, মানুষের অসহায়তা সত্ত্বেও মানুষের আত্মশক্তির মহিমা কতখানি সে সম্পর্কে নিজের চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করত অবন্তীর কাছে। অবন্তী তার চব্বিশ পঁচিশ বছরের জীবনে এসব নিয়ে কোনদিনই ভাবেনি। তার জীবনযাত্রার ছকে এসব দার্শনিক চিন্তার কোন স্থান ছিল না। প্রাত্যহিক জীবনের কাঠামোতে ছোট ছোট সুখ দুঃখ আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত কোন অনুভূতি ধরা যেতনা।

তবু সব মানুষকেই নাড়া দেয় মৃত্যু। বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত হঠাৎ কোন অপার্থিব চিন্তায় স্পৃষ্ট হয় মানুষের মন। অবন্তীর ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি। সে যখন ভাবছে কেন বিনা দোষে তার নিপাট ভালমানুষ দাদাকে চলে যেতে হোল পৃথিবী ছেড়ে তখন সুধাংশুর সান্নিধ্য তার সামনে যেন আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিল।

সুধাংশুর সঙ্গে দার্শনিক আলোচনায় তার মনে যে চিন্তার পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল তা কিন্তু অপসৃত হলো খুব তাড়াতাড়িই। পট্টনায়কের সান্নিধ্যে যে মাদকতা ছিল তা ছিলনা সুধাংশুর সান্নিধ্যে। পট্টনায়ক স্বমহিমায় পুনরায় অর্বিভূত হয়ে সরিয়ে দিয়েছিল সুধাংশুকে।

অবন্তী বুঝতে পারত পট্টনায়কের সঙ্গে তার যোগাযোগের ব্যাপারটা সুনজরে দেখেনা সুধাংশু। সুধাংশুর গাম্ভীর্যই ছিল তার প্রমাণ। অবন্তীর খারাপ

লাগত। তবু নিজেকে মোহমুক্ত করতে পারত না। সুধাংশুকে সেজন্য তার একটু ভয়েই করত।

কিন্তু এখন তার মনে হল সুধাংশু যদি আবার তার সঙ্গে আলাপটা ঝালিয়ে নিত তাহলে যেন অনেক ভাল হতো। পট্টনায়কের অভাবে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তার মনে তা খানিকটা পূর্ণ হতো। তার মনের অবাধ্য গতি নিয়ন্ত্রিত করতে পারত সে।

প্রেমিক হিসাবে সুধাংশুকে সে ভাবতেই পারত না। কিন্তু পরিত্রাতা হিসাবে কেউ তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভাবলেই তার মনে হয় সুধাংশুর কথা।

একমাসের ছুটি নিয়ে রাজস্থানে বেড়াতে গেছে শ্যামলী। বাব মা আর দিদির সঙ্গে। সে থাকলে লজ্জা সংকট ত্যাগ করে তার সঙ্গে কিছুটা খোলাখুলি আলোচনা করতে পারত অবন্তী। অবশ্য সে নেই বলেই আবার তার সঙ্গে পুরনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নিতে সাহস করেছে পট্টনায়ক। শ্যামলীর ব্যক্তিত্বের সামনে কেমন যেন কুণ্ঠিত বোধ করে পট্টনায়ক।

শুধু পট্টনায়ক কেন? গম্ভীর স্বল্পভাষী শ্যামলীর ব্যক্তিত্বের জন্য অনেকের কাছেই সে রীতিমত সমীহের পাত্রী। বন্ধু হয়েও কি অবন্তী তার প্রভাব টের পায়নি এতদিন? পট্টনায়কের সঙ্গে মেলামেশা করেছে সে একরকম শ্যামলীকে লুকিয়েই।

পরে অবশ্য সবই জেনেছে শ্যামলী। তবু তার একেবারে চোখের সামনে ঠিক যেন সাহস হয়নি। আর বিয়ের পর পট্টনায়কের সঙ্গে তার সর্ম্পক ছেদ পড়ে গিয়েছিল। নতুন করে আবার যে তারা সর্ম্পক ঝালিয়ে নিয়েছে তা এখনও জানেনা শ্যামলী।

এখন যদি শ্যামলী কলকাতায় থাকত তাহলে অবন্তী তার কাছে সাহায্য চাইত। বলত 'আমার এই দুর্বলতা দেখে নিজেই লজ্জা পাচ্ছি। তাই তার শরণপন্ন হচ্ছি। তুই আমাকে বাঁচা শ্যামলী?'

তার মনে হয়েছে আরেকটি সমাধানের কথা। শ্যামলী তাকে বিয়ে করতে বলেছিল। সে বলবে রাজী আছে। তবে পাত্র নির্বাচনের ভার থাকবে শ্যামলীর ওপর। নিজেকে আর সে বিশ্বাস করেনা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠে পট্টনায়কের চেহারা। মনে হয় অন্য কাউকে বিয়ে করে সুখী হতে পারবে তো সে?

বাড়ির পরিবেশ আজকাল তার একেবারেই যেন সহ্য হয়না। মাঝে মাঝে

মায়ের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে সে! মনে হয় মা বড় অস্বাভাবিক। ছোড়দা আর বৌদির সঙ্গে কেমন স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক ব্যবহার তার। অথচ দাদা সবচেয়ে আদরের সন্তান ছিল!

ছোড়দা আর বৌদিকে দেখে অবাক হয়ে যায় সে! ওরা কি করে দাদার স্মৃতি মুছে ফেলে এরকম নির্লজ্জভাবে পরস্পরের সান্নিধ্যে সুখী হতে পারছে? রাত্রিবেলা ছোড়দা যখন দাদার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় অবন্তীর নিজেরই লজ্জা করতে থাকে। অতঃ পর দাদার বিছানায় দাদার একদা বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে কি করে সে শোয়? মানুষের ওপর সব বিশ্বাস যেন মুছে যেতে থাকে। সকাল বেলায় বউদি যখন দরজা খুলে বেরোয় তখন তার দিকে তাকিয়ে সমস্ত শরীর ঘৃণায় লজ্জায় কেমন করতে থাকে।

অথচ এই ছেলে বৌয়ের পুরিতুষ্টির জন্য মায়ের সযত্ন প্রয়াসের যেন অন্ত নেই। অবন্তী ভেবে পায় না এত ভয় কেন তার মায়ের? যারা এত বড় অন্যায় করতে পারল তার চোখের সামনে তাদের এত তোয়াজই বা করেন কেন?

অরুন্ধতী কিন্তু আগের মতই আছে। ওদের যুগলমূর্তি দেখলেই হোল! খ্যাপা কুকুরের মত তেড়ে যাবে সে। বেশির ভাগ সময় মেয়েকে চোখে চোখে রাখে যোগমায়া দেবী। যখন তা সম্ভব হয় না বৌকে কিংবা ছেলেকে ডেকে বলেন—'তোমরা দরজাটা বন্ধ রেখো। অরু রইলো ও ঘরে।'

এসব সাবধানতা সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই অঘটন ঘটে যায়। অরুন্ধতী চিৎকার চেঁচামেচি মারধর শুরু কের দেয়। অরুণী তো বটেই। অর্চনা পর্যন্ত তার প্রত্যুত্তর দিতে দ্বিধা বা কার্পণ্য করেনা। শেষে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে পাগল মেয়েটা যখন গোঙাতে থাকে তখন তারা ক্ষান্ত হয়! ওদের অলক্ষ্যে মেয়ের শরীরে মলম লাগাতে লাগাতে চোখের জলে বুক ভেসে যায় তার। সব দেখে শুনে অবন্তী ভাবে তারও পাগল হতে দেরি হবেনা বুঝি।

পট্টনায়কের ওপর তার রাগ হয়। দুষ্ট গ্রহের মত লোকটা তার জীবনে অশুভ ছায়া ফেলতে চাইছে। সেই দুষ্ট গ্রহকে সমূলে উৎপাটিত করা দরকার। কিন্তু সে তা পারে কই? এই যে কদিন ধরে তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছে তাতে পট্টনায়কের আর কত ক্ষতি হচ্ছে? তার নিজেরই বরং মানসিক ভারসাম্য হারানোর মত দুঃসহ অবস্থা।

আজকাল বিচিত্র ভয়ের ছায়া ঘুরঘুর করে অবন্তীর মনে। তারও দিদির মত অবস্থা হবে না তো? মনের সঙ্গে এভাবে যুদ্ধ করে কতদিন চলতে পারবে? দুর্বল মূহুর্তে প্রলোভিত হয় তার মন। মনে হয় যা খুশি হোক সে আর পারেনা।

পট্টনায়কের সঙ্গে যদি সে দেখা সাক্ষাৎ করে তাহলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে? সে তো কারুর কোন ক্ষতি করছেনা! শুধু নিজের জন্য ছোট্ট একটু আনন্দের জায়গা খুঁজে নিতে চাইছে। মানসিক চাপ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন এই যোগাযোগ বা মেলামেশা কি এতই গর্হিত?

প্রেমহীন এই নীরস জীবনের আর যেন সে বইতে পারছেনা। অভিমান করে পট্টনায়কও আর আসেনা তার ধারেকাছে। কতদিন সেই সুন্দর মুখটি দেখতে পায়নি সে। কতদিন চোখে পড়েনি দুটি রূপমুগ্ধ চোখের সতৃষ্ণ ব্যাকুলতা। অত নীতি নৈতিকতা মেনে সে চলতে পারবেনা।

সেদিন দুপুরের দিকে অবন্তীদের সার্কুলার দিয়ে গেল উৎপলরা। ইউনিয়নের মিটিং আছে। সদস্যদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। ইউনিয়ন রুমে যখন উপস্থিত হলো অবন্তী তখন মিটিং শুরু হতে সামান্যই বাকি। অনেকেই চলে এসেছে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে তারা।

অবন্তী লক্ষ্য করল তাকে যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে কেউ কেউ। আভাদির পাশে বসে পড়ল সে কিছুটা অস্বস্তি নিয়েই। কট্টর কংগ্রেস সমর্থক আভাদি। একটু পরেই বামফ্রন্টের কার্যকলাপের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন তিনি। রাজনীতিতে আকর্ষণ নেই অবন্তীর। সে চুপ করে শুনে যেতে লাগল।

অবন্তীর কাছে সাড়া না পেয়েই বোধ হয় ওপাশের সরস্বতীদির দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি সমর্থনের আশায়। সরস্বতীদি কিন্তু সেই আলোচনায় উৎসাহ না দেখিয়ে অভাবিতভাবে উত্থাপন করলেন সম্পূর্ণ অন্য এক প্রসঙ্গে।

—রাজনীতির কথা পরে। আমাদের এই অফিসে কি ব্যাপার চলেছে? তার কোন হিল্লে হচ্ছে না কেন? আগে নিজের ঘর তবে তো দেশ? দেশ তো আর নিজেদের ঘরটুকু বাদ দিয়ে নয়?

আভাদি সবিস্ময়ে তাকান সরস্বতীদির দিকে।

—কি বলছ তুমি সরস্বতী? আমি তো কিছুই বুঝছিনা!

—কেন পট্টনায়কের লীলা খেলা চোখে পড়ছে না তোমাদের? বিয়ের আগে কতজনকে নাচাল। সন্ধ্যা সাহানী হঠাৎ অত তড়িঘড়ি বিয়ে করল কেন? তাও ওরকম চেহারার একটা লোককে? অত সুন্দর চেহারা ওর! অনেক সুন্দর বর হতে পারত। যে বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল বিয়ের পর সেটা কার বাচ্চা কে জানে? সন্ধ্যার আগেও বাঙালি বিহারী আরও কয়েকজনের সঙ্গে অ্যাফেয়ার্স ছিল ওর। পরে সন্ধ্যাকে দেখে মাথা ঘুরে গেল। তারপর মনে আছে তোমার রেখার কথা? কয়েকদিন রোজ রেখার সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছে। রেখার দাদা এসব দেখে

তাড়াতাড়ি বিয়ে ঠিক করে তবে ওর হাত থেকে বাঁচাল রেখাকে।

স্তব্ধ হয়ে শুনছিল অবন্তী। এতসব জানতনা সে। আড়ে আড়ে কিছু কানাঘুঁষো কানে এসেছে তার। কিন্তু তার পরিমাপ কতটা তা জানতনা। তার নাম অবশ্য উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু যারা এত জনের খবর রেখেছে তার তার খবরটা জনতে পারবেনা হতে পারেনা। সে সামনে উপস্থিত না থাকলে হয়ত তার কথাও বলতেন সরস্বতীদি। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল তার।

আভাদিকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল অস্বস্তি ভোগ করছেন তিনি। চকিতে একবার অবন্তীর দিকে তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। অবন্তীকে আমল দিলেননা কিন্তু সরস্বতীদি। আগের মতই সমান বিরক্তি নিয়ে আবার শুরু করেন তার বক্তব্য।

—এখন যে বিয়ে করেছে তাও কি এতটুকু পরিবর্তন হয়েছে ভাবছ? এই তো সুভাষ বলছিল সেদিন সন্ধ্যায় নাকি শিউলির বাড়িতে দেখেছিল ওকে। শিউলীর ছেলেও নাকি ছিলনা তখন। অনেক পরে ফিরেছিল ও পাশের ফ্ল্যাট থেকে। অফিস থেকে পাঠিয়েছিল সুভাষকে কি একটা কাজে। শিউলির সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি খুব নির্দোষ হবে বলে মনে করেন?

অবন্তীর মনে হচ্ছিল ছুটে পালায়। লজ্জায় ঘৃণায় নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল তার। আজ সকালেও পট্টনায়কের বিচ্ছেদে কাতর হয়ে সে আপসের কথা ভেবেছিল। অথচ ঐ অপদার্থ লোকটা তার আশা নেই ভেবে ঝুঁকছে ঐ শিউলি পুরকায়স্থের দিকে।

তার মনে আছে একদিন শিউলির চেহারার প্রশংসা করেছিল বলে পট্টনায়ব স্থূল একটা ভঙ্গী করে বলেছিল 'ঐ চেহারাটাই আছে। আর সব নীল। চরিত্র বলে কিছু নেই। যার তার সঙ্গে শুতে পারে ঐ মহিলা।' সে শুনেছিল তিনবার বিয়ে করেছিল নাকি শিউলি। প্রথম স্বামী মারা গিয়েছিল। পরে দু'দুবার বিয়ে করেছিল। কিন্তু কোনটাই টেঁকেনি। ডিভোর্স হয়ে গেছে। ছেলেটি ওর প্রথম স্বামীর।

বাধাবন্ধনহীন মুক্ত যৌন জীবন যাপন করে শিউলি। রাতে বেরাতে অনেক পুরুষমানুষকেই দেখা যায় ওর ফ্লাটে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন অনুমান করা কারুর পক্ষেই কঠিন নয়।

আর সাজপোষাক বা হাবভাবও খুব রুচিকর ঠেকবেনা অনেকের কাছেই। মানুষের চেহারার যদি তার জীবনযাপনের ছাপ ধরা পড়ে তাহলে বলতেই হবে শিউলি পুরাকায়স্থের চেহারার মধ্যে কেমন একটা যৌনসর্বস্বতার স্থূলতা।

রঙ ময়লা হলে হবে কি? মুখশ্রী বা শরীরের গড়নটি ভারী চমৎকার তার। অনেকের মত অবন্তীও আকৃষ্ট হয়েছিল শিউলি পুরকায়স্থের চটকদার চেহারা দেখে। পরে নানা জনের কাছে নানা ধরনের অকথা কুকথা শুনেছে সে শিউলির সম্পর্কে। শ্যামলী একেবারেই সুনজরে দেখেনা শিউলিকে। শিউলিও প্রথম থেকেই এড়িয়ে চলে শ্যামলীকে। কিন্তু অবন্তী যেমন অকৃষ্ট হয়েছিল শিউলির প্রতি শিউলিও তেমন আকৃষ্ট হয়েছিল অবন্তীর প্রতি। এখনও তাকে অপছন্দ করেনা শিউলি। কিন্তু অবন্তীই পারেনা তার প্রতি সহৃদয়তা বজায় রাখতে।

যেসব ছেলেরা শিউলির বাড়িতে যায় তারাও আড়ালে আবডালে ছেড়ে কথা কয় না তাকে। অনেক রকমেরই হাস্য পরিহাস করে তারা শিউলিকে নিয়ে। অবন্তীকে অবাক হয়ে যেতে দেখে শ্যামলী তার স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গীতে একটি মন্তব্য করছিল।

—আমি কিন্তু অবাক হইনা অবন্তী। নিজেরা যত দুশ্চরিত্র আর লম্পটই হোক্‌না কেন কোন পুরুষই ডাল ভাতের মতো অনায়াসে মেনে নিতে পারে না মেয়েদের চরিত্রস্খলনের ব্যাপারটা। বেশ্যালয়ে নিয়মিত যায় কিংবা অন্যভাবে অবাধ যৌনজীবনে অভ্যস্ত পুরুষও কিন্তু সুনজরে দেখেনা স্খলিতচরিত্র কোন মেয়েকে।

ইদানীং শিউলির চেহারায় অমিতাচারের ছাপ যেন প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। কীটদষ্ট পুষ্পের মত তার সেই সৌন্দর্য একটু একটু করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার আগ্রাসী থাবায় পর্যুদস্ত হয়েছে সৌন্দর্য, সৌকুমার্য, রমণীয়তা। অবন্তীর চোখে পড়ে কেমন একটা পুরুষালী বন্যতা ছড়িয়ে পড়ছে শিউলি পুরকায়স্থের চোখে মুখে।

কিন্তু এই মহিলার কাছে ভিড়ল কেন পট্টনায়ক? সে তো বিবাহিত। দৈহিক ক্ষুধা উপশমের বৈধ উপকরণ তো তার কাছে? তাহলে? অবন্তীর মনে পড়ল একধিকবার পট্টনায়ক প্রস্তাব করেছিল কোন একটি হোটেল ভাড়া করে কয়েক ঘন্টা কাটাবে। মনের সুখে গল্প গুজব করবে দুজনে। অফিসের বাইরে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত অবকাশে দুজনে দুজনে সান্নিধ্যে রমণীয় সন্ধার কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত করবে। অবন্তী তখন রাজী হয়নি।

কিন্তু খুব খারাপ কোন উদ্দেশ্যে পট্টনায়ক সেই প্রস্তাব করেছিল বলে ভাবেনি সে। নিভৃতির সুযোগে পট্টনায়ক তার বুকে উরুতে কিম্বা নিতম্বে হাত না দিয়ে যে পারবেনা তা সে বোঝে। শরীরের স্পর্শসুখের জন্যই বড়ই উদগ্রীব সে। কিন্তু এরকম কোন অভিজ্ঞতার আশঙ্কা ছিল না তখন। এখন তার মনে হল

খুব বেঁচে গেছে সে। সুযোগ পেলে এই ব্যক্তিটি কতটা মাত্রাবোধের পরিচ দিত কে জানে?

মিটিং শুরু হোল কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু মন দিয়ে দাবিদাওয়া কিংব ক্ষোভের বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারছিলনা অবন্তী। আগেও সে এটাসে শুনেছে পট্টনায়কের সম্বন্ধে। কিন্তু এত ইতিহাস জানা ছিল না। আজ যে পট্টনায়কের মুখোশটা একটানে পুরোপুরি খুলে ফেলা হয়েছে। বেরিয়ে পড়ে আদি অকৃত্রিম চেহারা। নিজের কথা ভেবে অনুতাপে আফশোসে জর্জরি হচ্ছিল সে। সেদিন সেই মিটিং থেকে ফিরে আসার পর অবন্তীর মনে হলো তা মধ্যে বিরাট এক রূপান্তর ঘটে গেছে। পট্টনায়কের প্রতি তীব্র আসক্তির জোয়া হঠাৎ যেন সরে গেছে তার মন থেকে। অবশিষ্ট আছে ঘৃণাটুকু যা তলানির মত বাড়তি আবর্জনার মত রয়ে গেছে একদা অনুভূত সেই জোয়ারের রেশ হয়ে

এগার

অরুন্ধতীকে নিয়ে খুবই ঝামেলায় পড়েছেন আজকাল যোগমায়া দেবী। এ মুহূর্তের জন্য চোখের আড়ালে গেলেই তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দেয়। তা ভয়ে অরণীরা আজকাল দরজা বন্ধ করে রাখে বেশিরভাগ সময়। কিন্তু স সময় তা সম্ভব হয়না। আর কি যে তার রাগ দুজনের ওপর! ফাঁক পেলে হোল। ঘরে ঢুকে কিছু না কিছু অপকর্ম শুরু করে দেবে।

এরমধ্যে অর্চনার একাধিক শাড়ী ব্লাউজ তার ধ্বংসলীলার সাক্ষ্য বহ করেছে। বিছানার চাদর কিংবা বালিসও রক্ষা পায়নি তার হাত থেকে। অর্চন আর অরণীর ওপর তার পূঞ্জীভূত রাগ সে প্রকাশ করে এই ভাবে। মারধর কম খায়না তার জন্য।

আগে অর্চনার তবু কিছু সংকোচ ছিল। এখন সে অবণীর সঙ্গে তাল মিলি নির্দয় ভাবে মারধর করে ননদকে। সারা শরীরে মারের দাগ দেখে যোগমা দেবী মনে মনে বলেন 'আর না। মেয়ের এত কষ্ট আমার সহ্য হয়না ঠাকুর আমি মরলে এই পাগলকে তো দেখার কেউ থাকবে না। বিন্তীও কি চিরদি তার দিদিকে দেখবে? সেও তো ঘরসংসার করবে। তার চেয়ে আমি থাকতে থাকতে চলে যাক আমার এই মেয়ে। নাহলে মরেও যে শান্তি পাব না।'

কখনও বা ভাবেন 'সারা জীবন সুখের মুখ দেখলাম না। আর এখন শান্তিতে মরব তারও উপায় রাখলে না ঠাকুর? আমি এত কি পাপ করেছিলাম

কিন্তু এরমধ্যে এক রবিবারের সকালে চরমে উঠল ঘটনা। লণ্ড্রী থেকে

কাঁচিয়ে এনেছিল অর্চনা দামী একটা সাউথ ইণ্ডিয়ান সিল্ক। অরণীর এক বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল। শাড়ীর সঙ্গে ব্লাউজটা খুঁজে পাচ্ছিলনা সে। পেছন ফিরে আলমারিতে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল তাই ওটার খোঁজে। দরজাটা খোলা ছিল। ঠিক তখনই অরণী গিয়েছিল বাথরুমে। সেই অবসরে ঘরে ঢুকে শাড়িটা তুলে নিয়ে নিজেদের ঘরে এসে কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটল সে।

যোগমায়া দেবী তখন ব্যস্ত ছিলেন রান্নাঘরে। ছেলে বৌ একসঙ্গে আছে। অত্যন্ত নিশ্চিন্তই ছিলেন তিনি। অরুন্ধতী যে এরকম একটা কাণ্ড করতে পারে ভাবতেই পারেননি। হয়ত অবন্তী বাড়ি থাকলে এতদূর গড়াতে পারত না ব্যাপরটা। কিন্তু অবন্তী তখন বাড়ি ছিল না।

রাজস্থান সফর শেষ করে ফিরে এসেছে শ্যামলীরা। লোক মারফৎ খবর পেয়ে অবন্তী চলে গেল তার সঙ্গে দেখা করতে। অনেকদিন দেখা হয়নি দুই বন্ধুতে। অবন্তীর একেবারেই ভাল লাগছিলনা। পট্টনায়কের সম্পর্ক ছিন্ন না হলে বন্ধুর বিরহে হয়ত এতটা কাহিল হতনা সে। বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া দাওয়া সেরে গল্পগুজব করে রাজস্থান থেকে আনা উপহার নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় যখন বাড়ি ফিরছিল তখন অনেকদিন পর মনের স্বাভাবিক ফূর্তি ফিরে পেয়েছিল সে।

কিন্তু বাড়িতে এসে যা দেখল, যা শুনল, তাতে তার সব আনন্দ, সব ফূর্তি যেন নষ্ট হয়ে গেল। তার ছোড়দা বৌদি তখন বাড়ি ছিল না। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিল তারা সবকিছুই সত্ত্বেও। কিন্তু মাকে দেখে দিদিকে দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল অনেককিছুই ঘটে গেছে তার অনুপস্থিতিতে। দিদির সারা গায়ে ক্ষতচিহ্ন। হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। মাকে জিজ্ঞাসা করে শুনল সব বৃত্তান্ত।

মায়ের চোখ মুখ ফোলা দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারল অবন্তী সারা দুপুর বসে বসে কেঁদেছেন তিনি। অবন্তীর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

—বিন্তী আমি কি করি বলত অরুকে নিয়ে? বেশ তো ভাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার যে পাগলামি শুরু হোল এখন তো ওকে আর বাড়িতে রাখা যায় না। রণ তো পরিষ্কার বলল যে ওকে যদি সরকার পুলে না পাঠানো হয় তাহলে আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেনা ও। ওকেই বা দোষ দিই কি করে বল? অরু যা শুরু করেছে আমারই ধৈর্য থাকে না। দামী শাড়িটা ওভাবে ফালাফালা করে কেটে ফেলল? অর্চনার ওপর কি যে রাগ ওর!

—পাগল হয়েও দিদি বোঝে যে ছোড়দা আর তোমার অর্চনার ব্যাপারটা

খুব স্বাভাবিক নয়। আমারই তো মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে কষে কটা থাপ্পড় লাগা ঐ অসভ্য মেয়েমানুষটাকে।

—ছিঃ বিন্তী। তোর হয়েছে কি? তুইও কি পাগলমি শুরু করলি?

—না মা এটা পাগলামির কথা নয়। তবে অনেক কিছু দেখে শুনে সত্যি মনে হয় আমিও বোধহয় পাগল হয়ে যাব শিগগিরিই।

সেই মুহূর্তে অবন্তী শুধু অর্চনা আর অরণীর কথাই ভাবছিলনা। তার মনে হচ্ছিল পট্টনায়কের কথাও। সে ভাবছিল বিশ্বাস, প্রেম, মমতা এসব নিয়ে যার মাথা ঘামায়না সুখকে কব্জা করে তারাই। তার মনে পড়ছিল সুধাংশুর কথা সুধাংশু তাকে বলেছিল জীবজগতে বাঁচার অর্থ পালটে দিয়েছে মানুষই। জীবনে বৈচিত্রের স্বাদ আনতে চেয়েছে কখনও সুখ কখনও বা দুঃখের উপলব্ধির মধ্যে

অবন্তী তার বক্তব্য অনুধাবন করতে পারেনি। সে প্রশ্ন করেছিল দুঃখের উপলব্ধি সাধ করে চাইবে কেন মানুষ? মানুষ তো চাইবে সুখী হতে, সুখকে করায়ত্ব করতে। জবাবে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু বলেছিল সুধাংশু। এত সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে বলেছিল যে এখনও মনে আছে সব কথা।

সুধাংশু বলেছিল মানুষ মাথা খাটিয়ে অনেক শব্দ, অনেক বিমূর্ত ধারণা সৃষ্টি করেছে। জন্ম, জীবন আর মৃত্যুর বৈচিত্র্যহীন পরিসরের মধ্যে অন্য কিছুর অন্বেষণে রত হয়েছে।

প্রেম প্রীতি মায়া মামতা কি জিনিষ? তাদের কি ধরা ছোওয়া যায়? জীবনের অর্থ যাতে সম্প্রসারিত হয়, পরিশীলিত হয় তার জন্য সতত প্রয়াসশীল মানুষ সৃষ্টি করেছে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প কিংবা সিনেমা থিয়েটার আর ক্রীড়ানুষ্ঠানের মত বহুবিচিত্র উপকরণসম্ভার। বিমূর্ত কতগুলি ধারণা দিয়ে তৈরি করেছে মনুষত্বের ইমারত।

সুধাংশু আরও বলেছিল মানুষ তার নিজের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার লক্ষণ টের পেয়ে তাকে শৃঙ্খলিত করতে উদ্যত হোল নিজের থেকেই। পাশাপাশি সেই একই মানুষ আবার অস্বীকার করল নিজের তৈরি সেই শৃঙ্খল। আত্মসুখের তাড়নায় অগ্রাহ্য করল নিজের তৈরি ন্যায়নীতি বোধকে।

অবন্তী প্রশ্ন করেছিল মানুষে মানুষে এই মৌলিক পার্থক্যের কারণটা কি সুধাংশু বলেছিল—'তা তো বলতে পারবনা ঠিক করে। তবে একটা কথা বুঝি যে মানুষ একটু অবসর নিয়ে অন্য কিছু খুঁজেছে সেই মানুষই দুর্লভ কিছু পেয়েছে। হতে পারে মানুষের মূল্যবোধ আমূল পাল্টে যাবে একদিন। তবু এইটুকু বুঝি কিছু মানুষ দৈনন্দিন ডাল ভাত চচড়ির বাইরে মাংস পোলাও কালিয়া

স্বাদের মত কিছু উপলব্ধি বা অনুভূতি আস্বাদন করতে চায়। যারা তা চায়না তারা সন্তুষ্ট থাকে মোটা প্রয়োজন মিটলেই। দামী অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হয় তারা। তবে তাদের ফাঁকিটা অনেক সময়েই টের পায় না। তাদের মানসিকতাই তার অন্তরায় হয়ে ওঠে'।

অবন্তীর মনে আছে দাদার অপমৃত্যুতে তার শোকগ্রস্ত মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। 'তাতে কি এসে যায়'? সুধাংশু যেন সেটি অনুমান করতে পেরেছিল। কারণ ত্বরিতে নিজের কথার খেই ধরে আবার বলেছিল—'যারা জীবনে সেই সব দামী উপলব্ধির স্বাদ পেয়েছে তারা আহরণ করতে পেরেছে একটি দুর্লভ শক্তি। তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লোভ ঈর্ষার ওপরে উঠতে পারে। অগ্রাহ্য করতে পারে সাময়িক হতাশা।'

সুধাংশুর কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত এক মাদকতা আছে। ওরকম একটি কুদর্শন চেহারার ব্যক্তি যে এরকম অনুপম কণ্ঠস্বরের অধিকারী হতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না। সুধাংশুর দিকে না তাকিয়ে অনেকবার তার কণ্ঠস্বর মন দিয়ে শুনেছে। অবন্তীর মনে হয়েছে হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হচ্ছে যেন তার প্রতিটি কথা। একই সঙ্গে সুরেলা আর গাম্ভীর্যময়। সুধাংশুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝেই অবন্তীর মনে হয়েছে তার চেহারাটা আর একটু ভাল হলে কি ক্ষতি হতো?

তবু অবন্তী বোঝে প্রথম প্রথম সুধাংশুকে তার যতটা অসহ্য মনে হোত এখন তেমন হয় না। হয়ত দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে কুৎসিত চেহারাও সহনীয় হয়ে ওঠে চোখে। এখন তার শ্রীহীনতা আর তত উৎকট পীড়াদায়ক মনে হয়না।

সুধাংশুর সঙ্গে আলাপটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর তাকে আস্থাভাজন নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়েছে তার। শ্যামলীও তার কাছে যথেষ্টই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার মনে হয় শ্যামলীর কাছে জীবনের অন্ধকার দিকটা যতটা প্রকট হয়ে ওঠে ততটা প্রকট হয়না আলোর দিকটা। হয়ত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলেছে বলে জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারেনা সে।

অবন্তীর জীবনও খুব সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়নি। তবু তার ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি আঁকতে ইচ্ছা হয়। মনে হয় সারা জীবন পড়ে পড়ে মার খাবেনা সে ভাগ্যের কাছে।

শ্যামলী কিন্তু স্বপ্ন দেখেনা। জীবনের সব বিস্ময়, সব রোমাঞ্চ, সব স্বপ্ন যেন কবেই শেষ হয়ে গেছে। জীবনের ক্যাছে যেন তার তেমন প্রত্যাশা নেই। বেঁচে

আছে বলেই যেন সে তার করণীয়টুকু করে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম খুব অবাক হতো অবন্তী। শ্যামলীকে তার মনে হোত অনুভূতিশূন্য নিরাবেগ বলে। কোন ব্যাপারেই যেন তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

কিন্তু এখন মনে হয় অনুভূতির কোন কমতি নেই তার মধ্যে। আর প্রতিক্রিয়া ঠিকই হয়। কিন্তু জীবন এরকমই এমন একটা মনোভাব নিয়ে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জীবনকে দেখে ও। তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে সবকিছু। অনেক কিছুই ধরা পড়ে তাই তার সজাগ দৃষ্টিতে। কিন্তু মনের প্রতিক্রিয়া চেপে রাখে ও। বাইরে তা প্রকাশ করে না।

ওর দিদির যে বিয়ে হয়েছিল তার যে একটা নির্মম বেদনাময় ইতিহাস আছে সেকথা পর্যন্ত অপ্রয়োজন বোধে ব্যক্ত করেনি অবন্তীর কাছে। নিজের মনের বেদনাকে কি আশ্চর্য সংযমে চেপে রেখেছিল ও এতদিন একথা ভেবে বহুবার মনে মনে বিস্মিত হয়েছে অবন্তী। শ্যামলী তার বন্ধু হয়েও সমীহের পাত্র। ওর কাছে নিজের মনের আবেগ পুরোপুরি প্রকাশ করতে তাই তার বড় সংকোচ, বড় দ্বিধা।

সুধাংশু পদমর্যাদায় তার অনেক ওপরে। বয়োজ্যেষ্ঠ তো বটেই। সর্বোপরি সে পুরুষ। তার কাছে অনেক কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। তবু তুলনায় তার কাছে অনেক সহজ বোধ করে সে। সুধাংশুর মধ্যে একটা নরম অনুভূতিময় জায়গা আছে যেখানে প্রয়োজনে অনেকেরই আশ্রয় মিলবে।

অথচ তার ভাবতে অবাক লাগে পরিচয়ের প্রাথমিক পর্বে সুধাংশুকে সে সহ্যই করতে পারত না। সুধাংশুর অসুন্দর চেহারা এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল তাকে যে তার মধ্যে সুন্দর বিদগ্ধ অথচ সুকুমার একটি মনকে সে দেখতেই পায়নি।

শ্যামলীর মতামতের যথেষ্টই মূল্য আছে। সুধাংশু সম্পর্কে একাধিকবার সে মন্তব্য করেছে 'হি ইজ্ আ জেম অফ আ পারসন' বলে। অবন্তী খেয়াল করে দেখেছে সুধাংশুর সান্নিধ্যে জীবনের ধারণা কত পাল্‌টে যায়। জীবনের অন্ধকার দিককে সে অস্বীকার করে না। কিন্তু বিশ্বাস করে তার বাইরে জীবনের একটা ব্যাপ্তি আছে।

সুধাংশুই তাকে বলেছে 'থমকে দাঁড়ানো'-র কথা। চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্লেষণ করা, জীবনবিশ্লেষণ করার কথা সুধাংশুর মুখেই শুনেছে সে। যা ঘটছে যা হচ্ছে তার মধ্যেই যে মানুষের সব কিছু শেষ হয়ে যায় না তা বলেছে তাকে সুধাংশুই।

অবন্তী বলেছিল তার বাঁচতে ইচ্ছা করে না। জীবন তার কাছে বড় দুর্বহ বলে মনে হয়। সুধাংশু তখন বলেছিল মানুষ চাইলে এই দুর্বহ জীবন থেকেও অনেক কিছু নিংড়ে আনতে পারে। নিজের জন্য তো বটেই। আরও অনেকের জন্য অনেক আশ্চর্য সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে।

এসব কথার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে সে অক্ষম। তবু এসবের একটা প্রভাব থাকে। আজও হতাশার চরম মুহূর্তে তার মনে হোল এরকম বিশ্রী কথা বলছে কেন সে? সুধাংশু তাকে বলেছিল, 'মনে হলেও খারাপ সম্ভাবনার কথা মুখে আনবেন না। ওতে আত্মশক্তি খর্ব হতে থাকে একটু একটু করে। আমিও কখনও কখনও হতাশ বোধ করি। ভাবি যা ঘটতে পারত কিংবা যা ঘটলে সুখী হতাম তা কেন ঘটছে না? কিন্তু নিজেই আবার নিজেকে সংযত করি এই বলে যে এখনই কি সব কিছু বলা যায়? হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটবে যা আমার পরম কাম্য, পরম আকাঙ্ক্ষিত?

অবন্তীর কথার প্রত্যুত্তরে যোগমায়া দেবীর কথা শুনে তার মনে হোল সুধাংশুই যেন কথা বলছে যোগমায়া দেবীর মুখে।

—এমন কথা মুখেও আনিসনা বিন্তী। আমাকে দেখ। আমি তো এখনও মাথা ঠিক করে সব কিছু করে যাচ্ছি। স্বামী হারিয়ে সন্তান হারিয়েও মাথা খারাপ হয় নি। তোর জীবনের তো সবটাই বাকি। এখনই এত ভেঙ্গে পড়বি কেন? আমি তোকে আশীর্বাদ করছি বিন্তী। তুই সুখী হবি।

মায়ের কথা শুনে দুঃখে হাসি পেল তার। মা তো কিছুই জানেন না তার সম্পর্কে। আশা করে আছেন তাই এই সন্তানটি দুর্ভাগ্যের আঁচ থেকে রক্ষা পাবে। সে যে কিছুদিন ধরে কি অসহ্য দুঃখের মধ্যে কালাতিপাত করছে তা যদি জানতেন মা তাহলে এমন সরল বিশ্বাসে এতবড় আশা ব্যক্ত করতে পারতেন না। নিজের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে দিদির প্রসঙ্গ তুলল সে।

—ছোড়দা যদি আলাদা থাকতে চায় থাকুকনা মা। দেখছ তো দিদি ওদের সহ্য করতে পারে না। ওর পক্ষেও কিন্তু ভাল হচ্ছেনা এত উত্তেজনা। এতে দিদির ক্ষতই হবে।

—তুই তাহলে কি করতে চাস?

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন যোগমায়া দেবী।

একটু ভেবে নিয়ে আস্তে আস্তে জবাব দিল অবন্তী মায়ের প্রশ্নের।

—আমার মনে হয় আমাদের আলাদা বাসা করাই ভাল। আমি তো চাকরি করছি। আর মাইনেও একেবারে খারাপ পাইনা। চলে যাবে আমাদের।

—এ তুই কি বলছিস?

প্রায় আর্তনাদের সুরে প্রশ্ন করেন যোগমায়া দেবী।

—ঠিকই বলছি। ক্রমাগত এই অশান্তি আর ভালো লাগেনা মা। আর দিদি কেন আমিও ওদের সহ্য করতে পারিনা।

—না বিন্তী তা হয়না। তোর একটা ভবিষ্যৎ আছে। পাগল দিদি আর বুড়ো মায়ের ভার তুই নিবি কেন?

—দাদা থাকলে একথা বলতাম না মা। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্‌টে গেছে।

—তা হোক। খামখেয়ালের বশে এসব হতে দেবনা আমি। তার চেয়ে রণ যা বলছে তাই হোক। অরুকে সরকারপুলেই পাঠিয়ে দেব। খরচ খরচা নয় তোরা দুজনে মিলেই দিবি।

—আগে কিন্তু তুমি চাইতেনা মা দিদিকে সরকারপুলে পাঠাতে। ও একটু ভাল হয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনলে তাই। আর এখন সেই তুমিই চাইছ ওকে সেখানে পাঠাতে। কেন মা? ছোড়দাদের তুমি এত ভয় পাও?

—ভয়ের কথা নয় বিন্তী। সংসারে তোদের সবাইকে নিয়েই আমার সুখ। রণ যাই করুক ও আমার সন্তান। ইন্দ নেই। রণকে আমি হারাতে পারব না। তার চেয়ে যাকে নিয়ে এত অশান্তি সেই পাগল মেয়েকে বরং পাঠিয়ে দেব অন্যখানে। হয়ত চিকিৎসায় থাকলে আবার সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে ও একদিন।

মায়ের কথার প্রতিবাদ করল না অবন্তী। ওরও মনে হোল ওটাই সবচেয়ে ভাল সমাধান। দিদির সুস্থ হওয়া দরকার। অবন্তী আলাদা বাসা করলেই কি দিদি সুস্থ হয়ে যাবে? আর মা চিরদিন থাকবেন না। তখন তার পাগল দিদির ভার যে তার কাছে দুর্বহ মনে হবেনা তারই কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

অরণীরা নিমন্ত্রণ সেরে ফিরে এলে সেই রাতেই যোগমায়া দেবী তাদের জানিয়ে দিলেন তার সিদ্ধান্তের কথা। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে আশ্বস্ত করতে ভুললেন না তিনি।

—খরচ খরচা তোরা দুজনে ভাগ করে দিবি। তুই একা দিবি কেন? বিন্তী চাকরি করছে। দিদির জন্য সেও কিছু খরচ করুক।

নির্দ্বিধায় রাজী হয়ে গেল অরণী। পাশের ঘর থেকে সব শুনে অবন্তীর মনে হোল হয়ত মা এরকম প্রস্তাব না করলে ছোড়দা নিজেই বলত। ওর মনে হোল মা বুদ্ধি করে কথাটা বলে সকলের সম্মান বাঁচিয়ে দিলেন।

যাওয়ার দিন অরুন্ধতী যেন বুঝতে পারল বাড়ি থেকে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে তাকে বহুদিনের জন্য। কিছুতেই বাড়ির বাইরে যাবেনা সে। শেষ পর্যন্ত

ঠেলেঠুলে জোর জবরদস্তি করে ওঠানো হোল তাকে গাড়িতে। ইচ্ছা করেই সঙ্গে গেলেন যোগমায়া দেবী। কিন্তু সেখানে গিয়ে আবার সেই বিপত্তি। গাড়ি থেকে নামবে না কিছুতেই। সাধ্যসাধনা করে মিথ্যা কথা বলে ভুলিয়ে তবে তাকে নেওয়া হোল ভেতরে।

মেয়ের সঙ্গে ছলনার ঘটনাটা কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না যোগমায়া দেবী। উঠতে বসতে মেয়ের অসহায় ভীত মুখটা মনে পড়ে যায়। সংসারের কাজে মন বসে না। ফাঁক ফুরসত পেলেই ঠাকুরঘরে গিয়ে কাঁদেন অঝোরে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন—'ওকে ভাল করে দাও ঠাকুর। ওর যেন আবার ভাল ঘর বরে বিয়ে দিতে পারি আমি'।

অবন্তী ভেবেছিল দিদি এ বাড়িতে না থাকলে চিৎকার চেঁচামেচি কমে যাবে। আবার গতানুগতিক ধারায় সংসার চলতে থাকবে তার নিজস্ব নিয়মে। কিন্তু কোন ছিদ্রপথে অশান্তির সাপ এসে দংশন করবে তা আগের থেকে অনুমান করা যায়না।

পাগলের পাগলামি স্তব্ধ হয়ে গেল ঠিকই। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে শুরু হোল অশান্তি। এতদিন এত দুঃখকষ্ট সহ্য করে এসেছেন যোগমায়া দেবী। সেই দুঃখ মনের সংগোপন চেপে রেখে সংসারের চাহিদা মিটিয়ে এসেছেন। সারাদিন সংসারের জোয়ালে বাঁধা থেকে সংসাবের খাঁই মিটিয়েছেন। অবন্তী কতদিন অবাক হয়ে ভেবেছে তার এত ভীরু দুর্বল মা কি করে এত কষ্ট চাপা দিয়ে সংসারের কাজকর্ম ঠিকমত করে যান?

যারা গেছে তারা তার যত প্রিয়ই হোক তাদের জন্য শোক করে যারা তার কাছে আছে তাদের দাবি তিনি অবহেলা করেননি এতদিন। এমনকি তার একমাত্র ভরসার পাত্র ইন্দ চলে যাওয়ার পরও তার পাগল মেয়ের কথা ভেবে তার ছোট মেয়ের শুভাশুভের কথা চিন্তা করে শোক চাপা দিয়ে রেখেছেন।

মাকে রান্নাঘরে তাদের জন্য ভালমন্দ রান্না করতে দেখে অবন্তী কতদিন ভেবেছে তার মা কি স্বাভাবিক? কতদিন সে মনে মনে রুষ্ট হয়ে ভেবেছে তার মা ব্যক্তিত্বহীন ভীরু দুর্বল। দুর্দান্ত ছেলের ভয়ে কেঁচোটি হয়ে আছেন তিনি। কিন্তু এখন সে আশ্চর্য হয়ে দেখে আগের মত প্রত্যূষে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেননা তিনি। সংসারের কাজকর্মও যেন আগের মত ত্বরিত হাতে সারতে পারেননা। হঠাৎ যেন বয়সটা অনেকখানি বেড়ে গেছে তার।

এতদিন তারা টুকটাক সাহায্য করেছে মাত্র। আসল ঝক্কি সামলেছেন মা। এখন আগের মত নিপুণভাবে সেটি সমাধা করতে পারেননা বলে অসুবিধা হয়

সকলের। ঠিকমত খাওয়া হয়না তাদের। বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসে বৌদির মামা মেয়ের কাজকর্মের খুব তারিফ করেছিলেন। এতদিন তেমন করে দরকার পড়েনি বলে কাজকর্মে সে কতটা নিপুণ তা দেখা যায়নি। যোগমায়া দেবী ছেলেমেয়ের মতই তাকে ভাত বেড়ে খেতে দিয়েছেন সমান স্নেহে সমান যত্নে। অর্চনা তার গানবাজনা নিয়ে মেতে থাকত বেশির ভাগ সময়।

কিন্তু এখন প্রায়ই যোগমায়া দেবী দেরী করে ঘুম থেকে ওঠেন। তরিজুত করে রান্না সেরে টিফিন ইত্যাদি গুছিয়ে দিতে পারেননা। অরণী অসন্তুষ্ট হয়। সে চিরদিন নিজের দাবি নিজের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন সোচ্চার। দু'চারদিন একটু চুপ করে থাকার পর সে তার অসন্তোষ ব্যক্ত করতে লাগল।

সকালে ওঠার অভ্যাস নেই অর্চনার। তাছাড়া এতদিন সে অভ্যস্ত ছিলনা। অতএব স্বামীর জন্য রান্নাঘরে আসে ঠিকই। কিন্তু ঠিকমত গুছিয়ে সব কিছু করে উঠতে পারেনা। অবন্তীরও হলো মুশকিল। চক্ষুলজ্জার খাতিরে সেও রান্নাঘরে আসে। কিন্তু সমানে হাত চালিয়ে মায়ের মত পারেনা। অফিসে যেতে প্রায়ই দেরি হয়। কথা শুনতে হয় অফিসারের কাছে।

—আপনার আজকাল প্রায়ই লেট হচ্ছে মিস মিত্র। কি ব্যাপার বলুন তো?

আসল কারণটা বলা যায়না। এটাসেটা বলে এড়িয়ে যায় অবন্তী। কিন্তু লেট হওয়ার গ্লানি তাকে সারাদিন ধরে জ্বালায়।

সবচেয়ে চিন্তার কারণ দেখা দিল তার মায়ের শরীর নিয়ে। প্রায়ই জ্বর হয় মায়ের। তার সঙ্গে ঘুসঘুসে কাশি। অরণীর সেদিকে তত খেয়াল নেই।

বরং সে ব্যাপারে অর্চনা তবু কিছুটা খেয়াল রাখে। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করা সব কিছুই প্রায় একা হাতে সামলাতে হয় অবন্তীকে। শাশুড়ীর প্রতি বিরূপতা নেই অর্চনার। শাশুড়ী কোনদিন দুর্ব্যবহার করেননি তার সঙ্গে। সাধ্যমতো সেও সাহায্য করতে যায় অবন্তীকে।

অবন্তী অবশ্য তাকে সে সুযোগ দেয়না। এই মহিলাটির জন্যই যত অশান্তি তাদের সংসারে। এর সাহায্য সে নেবেনা পারতপক্ষে। অর্চনাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল মায়ের জন্য আর কারুর না ভাবলেও চলবে।

এরমধ্যে পট্টনায়ক আবার একদিন তার কাছ এসে ইনিয়ে বিনিয়ে সাফাই গাইতে এসেছিলেন। অবন্তী নরম হয়নি। এখন তার মনে পট্টনায়কের কোন স্থান নেই। তার স্মৃতি পর্যন্ত বিষবৎ বোধ হয় এখন তার কাছে। বরং অবাক হয় ভেবে যে একদিন এই যুবকটিকে দেখে সে এতটা উন্মত্ত হয়েছিল। কই এখন তো একে দারুণ কিছু সুন্দর বলে মনে হয়না?

পট্টনায়ককে মন থেকে ঝেড়ে ফেললে কি হবে? তার মনের মধ্যে যে শূন্যতাবোধ তৈরি হোল তা তাকে শান্তিতে থাকতে দিল না। হয়ত বাড়ির পরিবেশ ভাল থাকলে এতটা অসহায় বোধ করত না সে। কিন্তু মা একরকম শয্যাশায়ী। তার সঙ্গে আগের মত অন্তরঙ্গ বাক্যালাপ চলে না আর। বড় মেয়ের শোকে তিনি যেন পাথর হয়ে গেছেন। তার সঙ্গে অবন্তীদের সম্পর্কে চরম উদাসীন।

মায়ের এই আকস্মিক পরিবর্তন রহস্যময় মনে হয় অবন্তীর। বাবার মৃত্যু বিশেষ করে দাদার মৃত্যুর পরও যে মানুষ হেঁটে চলে বেড়িয়েছে, যত শোকই হোক তা চাপা দিয়ে সংসারের কাজকর্ম ঠিকমত করেছে সেই মানুষ তার পাগল মেয়ের বিচ্ছেদে এতখানি কাতর হয় কি করে?

অথচ মা তো নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবন্তীই বরং আপত্তি করেছিল। কিন্তু মা যেন তাদের ওপরে অভিমান করেই শরীর ছেড়ে দিয়েছেন। মুখে কিছু না বললে কি হবে? অবন্তী বুঝতে পারে মা ভাবছেন তার বড় মেয়েকে দূরে সরিয়ে তারা স্বস্তি পাচ্ছে। তাদের নিষ্ঠুর ভাবছেন তিনি। আর সেই নিষ্ঠুরতার শাস্তি দিচ্ছেন এভাবে।

মাকে বললেও তিনি এখন বিশ্বাস করবেন না যে দিদির জন্য কত কষ্ট হয় তার মনে। দিদি যখন বাড়িতে ছিল তখন বরং অতটা মমতা বোধ করেনি তার জন্য। এখন দিদির কথা যখন তখন মনে পড়ে আর তার বুকের মধ্যে কেমন ভারী হয়ে আসে। মনে হয় দিদিকে বুঝি নির্বাসনে পাঠিয়েছে তারা নিষ্ঠুরের মত। কিন্তু অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে মা নিজেকেও শাস্তি দিচ্ছেন, তাদেরও শাস্তি দিচ্ছেন। এই সংসারে মা ছাড়া আছেটা কে তার নিজের লোক? সেই মায়ের সঙ্গে পর্যন্ত সম্পর্কটা কেমন আলগা হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

অফিসে শ্যামলীর কাছে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়ে সে। শ্যামলী তাকে সাহসের সঙ্গে আত্মশক্তি বজায় রেখে চলতে বলে। সে বলে সুখ দুঃখ তো চক্রবৎ ঘোরে। এই দুঃখ যে চিরদিন থাকবে না তা তো জানা কথা। অবন্তী কেন এত ভেঙ্গে পড়ছে? পরিচিত অনেকের কথা শোনায় সে অবন্তীকে। সবশেষে বলে—'কতজনের জীবনে কত দুঃখ আছে তা তুই ধারণাই করতে পারবি না অবন্তী। দুঃখময় এই মানবজন্ম। জরা ব্যাধি মৃত্যু দেখে অধীর হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন বুদ্ধদেব সেসবের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য। ছোটবেলায় মনে হোত বড় বাড়াবাড়ি করেছিলেন তিনি। এখন বুঝি খুবই স্বাভাবিক ছিল সেই প্রতিক্রিয়া।'

মাঝে মাঝেই এধরনের কথা শোনে সে শ্যামলীর কাছে। মনে মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক অভিযোগ তার উচ্চকিত হয়। ইচ্ছা করেই তা ব্যক্ত করে না।

একদিন কিন্তু তার ধৈর্য্যচ্যুতি হোল। সেদিন ছোড়দার সঙ্গে তুমুল কলহ হয়েছিল। শ্যামলী তাকে দেখে অনুমান করেছিল কিছু একটা অশান্তি হয়েছে। ছুটির পর বাসস্টপে দাঁড়িয়ে শ্যামলী প্রশ্ন করল—'তোকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন আজ অবন্তী?'

অবন্তী ভেবেছিল শ্যামলীকে কিছু বলবে না। কারণ তার সমস্যাটা ঠিক যেন বুঝতে চায় না শ্যামলী। তার সেই এক কথা। এসব সব বাড়িতেই হয়। এত ভাবছে কেন অবন্তী তা নিয়ে? কোন কোন সময় অসহ্য লাগে এসব উপদেশ। ঠিক যেন কাছের লোকটি হয়ে শ্রোতা তার সমস্যাটা হৃদয়ে গ্রহণ করছে না। একটু আলগা আলগা ভাবে দূর থেকে দেখছে যেন।

কিন্তু বিশেষ মানসিক অবস্থায় আবেগ উত্তাপের নৈকট্য দরকার হয়। ইচ্ছা হয় শ্রোতা তার কথায় সায় দিক। তার অসুবিধাটা তার মত করে বুঝুক।

তবু মনের ভার লাঘব করতেই কারণটা ব্যক্ত করল সে শ্যামলীর কাছে। যথারীতি গুরুগম্ভীর ভঙ্গীতে শ্যামলী ওকে বোঝাতে চাইল। ওর কষ্ট দেখে সমবেদনা জানালনা।

—তুই ভাবছিস তোর মত দুঃখী কেউ নেই? কতটুকু জানিস তুই অন্যদের সম্পর্কে? কতজনের জীবনে কত কি ঘটে। কিন্তু আমরা তার খোঁজ রাখিনা বলে নিজেদের কষ্টটাই বড় করে দেখি।

অবন্তী বিরক্ত হলো।

—সেটা কি অস্বাভাবিক? কষ্টটা যদি আমাকেই সইতে হয় তাহলে আমি সেটাকে বড় করে দেখবনা? আমার মত যদি সইতে হোত তোকে তাহলে তুইও আমার মত ভেঙ্গে পড়তিস।

অদ্ভুত এক নিরাসক্ত হাসি হাসে শ্যামলী।

—তাই নাকি? কিন্তু আমি সুখের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে চলেছি বলে ধারণা হোল কেন তোর অবন্তী?

—আমি তা বলিনি। তোর দিদির কথা শুনেছি। খুবই দুঃখের ঘটনা। কিন্তু আর সব দিক দিয়ে তুই ভালই আছিস।

আবার হাসে শ্যামলী আগের মত ভঙ্গীতে।

—কে বলল ভাল আছি? তুই জানিসনা। আমার ভাল লাগেনা দুঃখকষ্টের পাঁচালী শোনাতে। আমাদের দুই বোনকে দেখেছিস তোরা। আমার ওপরে এক দিদি ছিল। আমার ছোড়দি। অল্প বয়সে আত্মহত্যা করেছিল ও। কারণ ব্যর্থ প্রেম।

—আশ্চর্য! তুই তো কোনদিন বলিসনি তোর ছোড়দির কথা? আমি জানতাম তোরা দুই বোন।

—অনেকেই জানেনা। কি করে জানবে? আমি তো বলিনি। বলে কি হবে? সে তো আর নেই?

—তবু—

অবাক বিস্ময়ে শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে প্রায় খাবি খায় যেন অবন্তী। হঠাৎ শ্যামলীর মুখটা করুণ দেখায়। অবন্তীর মনে হোল ওর চোখে যেন চিকচিক করছে জল।

—তবু কি? স্বাভাবিক মৃত্যু হলে একরকম। কিন্তু আত্মহত্যার ঘটনা কি ফলাও করে বলতে ইচ্ছা করে?

অবন্তী মেনে নেয়না। মনের ক্ষোভ ধরা পড়ে ওর কথায়।

—শ্যামলী তুই তো জানিস দাদা আত্মহত্যা করার পর আমার মনের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছিল। ওরকম অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কাছে মন খুলে কথা বলে। আমার সত্যিই খুব অবাক লাগছে ভেবে যে তখনও তুই কিছু বলিসনি সে ব্যাপারে।

একটু যেন অপ্রস্তুত হোল শ্যামলী।

—বিশ্বাস কর অবন্তী আমি কিন্তু গোপন রাখার জন্য চেপে যাইনি। তাহলে এখনও বলতাম না। দুঃখকষ্টের কথা বলতে আমার কোনদিনই ভালো লাগে না। দিদির কথা তো আগেই শুনেছিস। এখন যদি ছোড়দির কথা বলি বুঝতে পারবি কেন তোকে বলেছি অনেকের জীবনেই অনেক দুঃখের ঘটনা ঘটে। তবু সেগুলো চাপা দিয়ে চলতে হয়। উপায় নেই বলে।

অবন্তীকে অসহিষ্ণু দেখালো।

—তোর ছোড়দি আত্মহত্যা করেছিল কেন?

—বলছি। আমরা তখন ভবানীপুরে থাকতাম। পদ্মপুকুরের কাছে। ছোড়দি আত্মহত্যা করার পর ওবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি এখানে বেহালায়। ওখানে কারুর মন টিকছিল না। মা তো পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। খালি বলতেন আমি এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উদাস হয়ে কি যেন ভাবতে থাকে শ্যামলী।

পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার শুরু করে তার স্মৃতিচারণা।

—আমাদের পাড়ায় মোড়ের মাথায় ছিল ওদের বাড়িটা। পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে ধনী পরিবার ছিল ওরা। ও বাড়ির দেবযানীদির সঙ্গে ভাব ছিল

ছোড়দির। প্রায়ই যেত ওদের বাড়ি। সেই সূত্রে ভাব হয়েছিল দেবযানীদির ছোড়দার সঙ্গে। প্রথম দিকে আমরা কেউ জানতামনা ব্যাপারটা। ভাবতাম দেবযানীদির জন্যই যাচ্ছে ছোড়দি ও বাড়ি। পরে যখন মা জানতে পারলেন তখন খুব বকাবকি করলেন ছোড়দিকে। বললেন ওদের সঙ্গে ধনে মানে অনেক পার্থক্য আমাদের। ওরা কখনই মেনে নেবে না ছোড়দিকে। ছোড়দি মানতে চাইলনা। বলল ওদের বাড়ির সকলেই নাকি খুব ভালবাসে ওকে। ওরা কখনই আপত্তি করবে না। তাছাড়া শুভজ্যোতি যখন ওকে এত ভালবাসে তখন আর কিছু না হোক ওর সুখের জন্যও অন্ততঃ মেনে নেবে ওরা ওকে। আমাদেরও একটু ধোঁকা লাগত যখন দেখতাম ও বাড়ির সকলেই খুব সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করছে ওর সঙ্গে। উৎসবে অনুষ্ঠানে তো বটেই এমনিতেও অনেক সময়েই ডাক পড়ত ছোড়দির। তবু মায়ের ভয় দূর হতোনা। মাঝে মাঝেই ছোড়দিকে বোঝাতেন। বলতেন—'তোর অত ঘনঘন ও বাড়ি যাওয়ার কি আছে? এটা যে দৃষ্টিকটু দেখায় তা বুঝিসনা'? ছোড়দিকে কিন্তু বোঝানো যেত না। ও যে কি ভালবাসত শুভজ্যোতিকে কল্পনা করতে পারবি না। অনেক সময়েই আমাদের মনে হোত বাড়ির লোকের চেয়েও বেশি পছন্দ করছে ও ওবাড়ির লোককে। ছোড়দির হাবভাবে, কথাবার্তায় ধরা পড়ত সেটা। ওবাড়ির সবকিছুই ওর কাছে আদর্শ ছিল। আমাদের বাড়ির অনেক কিছুই পছন্দ হোত না। মাঝে মাঝে দিদির সঙ্গে লাগত তা নিয়ে। শুভজ্যোতিকে পছন্দ করত না দিদি। ছোড়দিকে বলত—'তুই ভুল করছিস কলী। শুভ তোকে কখনই বিয়ে করবে না। ও সেই জাতের ছেলেই নয়। ছোড়দি চটে যেত। বলত—'কতটুকু জানিস তুই ওর সম্পর্কে? আমি এতদিন ধরে মিশছি আর আমি বুঝিনা'? দিদি বলত—'তোর কি আর মাথা ঠিক আছে? তা না হলে সকলেই জানে শুভজ্যোতি ফ্লার্ট। কতজনের সঙ্গে ঘুরছে, ফিরছে, প্রেম করছে তা জানিস? তোর সঙ্গে ফ্লার্ট করছে। ও বড়লোকের বাড়ির ছেলে। চেহারাছবিও ভাল। দেখিস ও বিয়ে করবে বড়লোকের একমাত্র মেয়ে দেখে। আর তার চেহারাও হবে খুব সুন্দর।' ছোড়দি রেগে গিয়ে বলত—'করলে করবে। তুই মাথা ঘামাচ্ছিস কেন তা নিয়ে? দিদি বলত—'তুই এ বাড়ির মেয়ে না হলে মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু তোর জন্য চিন্তা হয় বলেই এসব বলছি।' ছোড়দি ততোধিক রাগতভাবে বলত—'আমার চিন্তা আমি করব। তোদের ভাবতে হবে না।' প্রায়ই এরকম ঝগড়া হতো। ছোড়দি যেন একেবারেই গ্রাহ্য করতনা কিছু। মাঝে মাঝে শুভজ্যোতির সঙ্গে সিনেমায় যেত। নাটক দেখতে যেত। শুভজ্যোতি অনেক সময়েই গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে যেত

ওকে। ছোড়দি খুব গান ভালবাসত। নিজেও খুব ভাল গান গাইতে পারত। সপ্তাহে একদিন গানের মাষ্টারমশায়ের বাড়ি গিয়ে তালিম নিত। শুভজ্যোতিদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই গানের জলসা টলসায় যেত। বাবা খুব বিরক্ত হতেন। মাকে বলতেন—'ও কি ভুলে যাচ্ছে কোন বাড়ির মেয়ে ও? সারাদিন ধরে পড়ে থাকছে ওবাড়ি। লোকেই বা বলে কি? এরকম বড় লোকের পা-চাটা মনোভাব তো ভাল নয়?'

এতক্ষণ এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে দম নেবার জন্য থামে শ্যামলী। একটু পরে আবার বলতে শুরু করে সে আগের কথার খেই ধরে।

—আসলে ছোড়দির টান ছিল শুভদার ওপর। শুভদার জন্যই তার বাড়ি, বাড়ির লোকজন সব কিছু ভাল লাগত ছোড়দির। দিদির সঙ্গে শুভদার সম্পর্কে আলোচনা করতনা। কিন্তু আমার সঙ্গে কিংবা মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝেই আলোচনা করত শুভদার কথা। শুভদার পছন্দ অপছন্দ মতামত ইত্যাদি অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার জানতাম আমরা সেই সূত্রেই। আমি বুঝতে পারতাম শুভদা ওর ধ্যান জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুভদার মতামতের পাল্লায় ওজন করত ও সব কিছু। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা পর্যন্ত ঢেলে সাজাচ্ছিল ও শুভদার মত করে। আমাদের দুশ্চিন্তা হোত। ভাবতাম শেষ পর্যন্ত মধুরেণ সমাপয়েৎ হবে তো? নাহলে ছোড়দি যে সহ্য করতে পারবে না। ওর চোখের সামনে শুভজ্যোতি ছাড়া অন্য কোন পুরুষের অস্বিস্ত ছিলনা। আমাদের তিন বোনের মধ্যে ছোড়দির চেহারা ছিল সবচেয়ে সুন্দর। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দু'এক জায়গা থেকে ওকে বউ করতে চেয়েছে। কিন্তু দিদির আগে ওর বিয়ে দেবেন না বলে মা সেগুলি ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। ছোড়দি কোন মাথাব্যথা ছিলনা সেসব নিয়ে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস শুভদাই ওর স্বামী হবে। আমি একদিন আমার মনের ভয় প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। ওকে বলেছিলাম, 'যদি তোকে শুভদা বিয়ে না করে? ছোড়দি হেসে আশ্বস্ত করেছিল তখন—'তোর ভয় নেই মলী। শুভদার সঙ্গে বিয়ে আমার হবেই। ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন তাহলে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কখনই মিথ্যে হবে না। ওকে আমি পাবই। তাছাড়া শুভদাও আমাকে খুব ভালবাসে। তুই আমার চেয়ে ছোট। তোকে তো সব কিছু বলতে পারিনা।'

শ্যামলী থামল। অবাক হয়ে শুনছিল অবন্তী। ওর মনে শুধু একটাই প্রশ্ন। শ্যামলীর জীবনে দু'দুটো এমন দুঃখের ঘটনা ঘটেছে। অথচ সব চেপে রেখে ও কি করে সহজ স্বাভাবিক ভাবে সব কিছু করে যাচ্ছে? অবন্তী তার নিজের ব্যক্তিগত দুঃখে এতটা অধীর হয়ে না পড়লে ও কি কোনদিন ব্যক্ত করত এসব?

মহাভারতে আছে কুন্তী তার প্রথম গর্ভজাত সন্তানের কথা চেপে গিয়েছিলেন বলে অর্জুনের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল সমস্ত নারীজাতির প্রতি। ইচ্ছা থাকলেও চেপে রাখতে পারবেনা মেয়েরা কোন গোপন কথা। কিন্তু শ্যামলীর মত মেয়েদের দেখে কি মনে হয়না মিথ্যা হয়েছে সেই অভিশাপ?

—শুভজ্যোতির কাছে কি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন তোর বাবা মা?

অবন্তী প্রশ্ন করে।

সজোরে অস্বীকার করে শ্যামলী।

—তখন দিদির বিয়ে হয়নি। দিদির আগে ছোড়দির বিয়ের প্রশ্নই ওঠেনা। তাছাড়া বাবা মায়ের মনে সব সময়েই ভয় ছিল শুভদাকে নিয়ে, তার বাড়ির লোকজনকে নিয়ে। সাধ করে অপমানিত হওয়ার কোন ইচ্ছে তাদের ছিলনা। তাদের এই ব্যাপারে কোন ভূমিকা নেই। বরং তারা ছোড়দিকে নিবৃত্ত করতেই চাইতেন।

—তাহলে?

ছোট্ট করে প্রশ্ন করে অবন্তী।

জবাব দিতে গিয়ে বিষণ্ণ হয়ে যায় শ্যামলী।

—শুভদার বিয়ে ঠিক হোল অন্যত্র। খবরটা আমাদের কানে এল। ছোড়দিও শুনল সেটা। ও যেন পাগলের মত হয়ে গেল। খালি বলতে লাগল 'এ কখনই হতে পারেনা। হয়ত শুভদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে ঠিক করেছে বাড়ির লোক। ও কখনই আমার সঙ্গে এরকম প্রতারণা করতে পারেনা।' বাবার সামনে পর্যন্ত মুখের লাগাম খুলে গেল ওর। মুখে খালি এক কথা 'শুভকে ছাড়া আমি বাঁচব কি করে? এ কখনই হতে পারে না?' শুভদার সঙ্গে দেখা করার কত চেষ্টা করল।

কিন্তু আশ্চর্য কিছুতেই আর দেখা হয়না। তবু শুভদার ওপর ওর যে কি আস্থা, সে কি বিশ্বাস! আমার কাছে বলেছিল—'বুঝলি মলী আমার মনে হয় ওর বাড়ির লোক ষড়যন্ত্র করে দূরে সরিয়ে রাখছে ওকে। হয়ত শুভও চাইছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ওরাই ছলছুতো করে দেখা করতে দিচ্ছেনা। ভাবছি ওকে চিঠি লিখব। ওর বাড়ির লোকে নিশ্চয় খুলে দেখবেনা ওর চিঠি। ওরা তো বুঝতে পারবেনা আমিই লিখেছি ওটা। অন্যখান থেকে পোস্ট করে চিঠিটা বুঝলি? তাহলে আর কেউ সন্দেহ করবে না।' ভাব একবার! একদিন যে ছোড়দি শুভদার বাড়ির সকলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল সে এখন তাদের ওপরেই দোষারোপ করছে। শুভদার প্রতি তখনও কি অবিচলিত বিশ্বাস। শুভদা

যে ওকে এড়িয়ে যেতে পারে সেরকম সম্ভাবনার কথা ভাবতেই পারছে না। ওর যত রাগ তখন ওর বাড়ির লোকদের ওপর। ও তাই শুভদাকে চিঠি লিখল। কিন্তু সে চিঠির জবাব আসলনা। তখন উপায়ন্তর না দেখে মরীয়া হয়ে ও শুভদার বাড়ির আশে পাশে ঘোরাফেরা করতে লাগল। পাড়ার অনেকের চোখেই পড়ল সেটা। তাদের দোষ দেওয়া যায়না। সময় অসময় নেই যখন তখন পাগলের মত কোন মেয়ে যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে বা পায়চারি করে তাহলে সেটা দৃষ্টিকটু লাগবারই কথা। আমাদের চোখেও কি আর ভাল ঠেকেছিল? কিন্তু ছোড়দির অস্থিরতার যেন শেষ ছিলনা। ভাল করে খেতনা, ঘুমাতনা। আমাদের সঙ্গেও আর আগের মত করে কথাবার্তা বলতনা। বাবা মা রীতিমত বিপদে পড়লেন। একদিন বাবার চোখে পড়ল একটা ঘটনা। শুভদার বিয়ের তখন কয়েকদিন মাত্র বাকি। পাড়ার বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিল ছোড়দি। হঠাৎ গাড়িতে শুভদাকে দেখতে পেয়ে একরকম ছুটতে ছুটতে গাড়ির কাছে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু শুভদা গাড়ি থেকে নামেনি বা ছোড়দির সঙ্গে কোন কথা বলেনি। ছোড়দিকে শুভদা দেখতে পেয়েছিল কিনা জানেননা বাবা। কিন্তু চোখের সামনে মেয়েকে এরকম উন্মত্তের মত গাড়ির পিছনে ছুটতে দেখে বাবার যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। মেয়ের পিছন পিছন বাড়ি ফিরে ফেটে পড়েছিলেন বাবা। 'তুই কি ভেবেছিস কলী? মান সম্মান কিছুই রাখবি না'? ছোড়দি কোন জবাব দেয়নি। থম করে বসেছিল। তারপরের দিনই দেবযানীদি এসে নিমন্ত্রণ চিঠি দিয়ে গেল ছোড়দিকে। খুব সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার দেবযানীদির। তাকে দেখে কিংবা তার কথাবার্তা শুনে বোঝাই গেল না যে ছোড়দির সঙ্গে তার ছোড়দার কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভদ্রতাবোধ নেহাৎ যে দু'চারটি কথা না বললে নয় বলে মুখরক্ষা করলাম আমরা। ছোড়দি কিন্তু একটাও কথা বলল না দেবযানীদির সঙ্গে। আমরা লজ্জা পাচ্ছিলাম ওর আচরণ দেখে। দেবযানীদি কিন্তু বুঝেও বুঝতে চাইল না। দু'চারটে কথা বলে বিদায় নিল সে। আমরা ভেবেছিলাম ফেটে পড়বে ছোড়দি। ওদের গালাগালি দেবে। কিন্তু সেসব কিছুই করলনা। বরং অন্যদিনের চেয়ে অনেক শান্ত হয়ে গেল ও। হঠাৎ ওর অস্থিরতা কমে গেল যেন। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল মনে মনে কোন একটা সঙ্কল্প করেছে ও। পরদিন ছোড়দিকে গান গাইতে শুনলাম। পরপর বেশ কয়েকটা গান গাইল ও। অপূর্ব লাগছিল ওর কণ্ঠস্বর। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা ও টেপ করল ওর গান। আমরা ভাবলাম নিজেকে হয়ত বুঝিয়েছে ছোড়দি। আশা নেই দেখে মনকে প্রবোধ দিয়েছে। মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম সকলে। তখন যদি আমরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতাম ছোড়দি মনে মনে এরকম একটা সাংঘাতিক

সঙ্কল্প করেছে তাহলে ওকে আরও বেশি সঙ্গ দিতাম। চোখে চোখে রাখতাম। এভাবে অকালে শেষ হয়ে যেতে দিতাম না কিছুতেই।

নিজেকে আর সামলাতে পারলনা শ্যামলী। হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল। অবন্তী চুপ করে রইল। সে নিজে অনেক দুঃখ পেয়েছে। তার অজানা নেই একথাটা যে দুঃখের স্মৃতিচারণা মানুষের মনের ভার একটু একটু করে হাল্কা করে দেয়। শ্যামলীকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেনা সে। চুপ করে শুনে গেল।

দ্রুত শোকগ্রস্ততা কাটিয়ে উঠে কাহিনীসূত্র টেনে ধরল.শ্যামলী।

—সত্যি হঠাৎ ভীষণ শান্ত হয়ে গিয়েছিল যেন ছোড়দি কিভাবে। দুই দিন ধরে যে ওর মাথায় কেবল আত্মহত্যার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। ও দিব্যি স্বাভাবিক ভাবে খেয়েছে ঘুমিয়েছে। আমাদের সঙ্গে গল্প করেছে। এমনকি পরে শুনেছি দু'একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেছে। এক বন্ধুর কাছে থেকে একটি বই এনেছিল। তাকে সেটি ফেরত দিয়ে এসেছে। আমরা নির্বোধের মত ভেবেছি নিজেকে সামলিযে নিয়েছে ও। আশ্চর্য হয়েছি ওর মনোবল দেখে। ভেবেছি ওর এতদিনের স্বপ্ন এভাবে ভেঙ্গে যেতে দেখেও ও কিভাবে পারছে তা শান্তভাবে সহ্য করতে? অবশ্য এখনও এতদিন পরেও আমরা নিশ্চিত হতে পারিনা আত্মহত্যার পরিকল্পনা কখন ঢুকেছিল ওর মাথায়। মাঝে মাঝে মনে হয় হয়ত একেবারে শেষ মুহূর্তে নিরুপায় হয়েই চরম পথ বেছে নিয়েছিল ও।

শ্যামলী যেন স্বগতোক্তি করছিল। অবন্তী বাধা দিচ্ছিল না। চুপ করে শুনে যাচ্ছিল একমনে।

—শেষের দিন কিন্তু আবার অস্থির হয়ে উঠেছিল ছোড়দি। বারবার মোড়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। আমরা সবাই বিরক্ত হচ্ছিলাম। ভয় পাচ্ছিলাম পাড়ার লোকেরা লক্ষ্য করবে। ঠিক পরদিনই শুভদার বিয়ে। বিশাল প্যাণ্ডেল তৈরী হয়েছিল। উৎসবের আমেজ এসে গিয়েছিল শুভদাদের বাড়িতে। রাত নটার সময় আবার বেড়িয়ে যাচ্ছিল ছোড়দি। মা বাধা দিলেন। 'এত রাতে কোথায় যাচ্ছিস'? ছোড়দি বলল, 'এক্ষুনি ফিরে আসব মা। চিন্তা করোনা। একটা জরুরী কাজ আছে'। কি কারণে যেন বাবা তখনও বাড়ি ফেরেননি। বাধা দিতে গিয়েও নরম হলেন মা। ছোড়দি বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এসেছিলেন বাবা। কিন্তু ছোড়দি আর ফিরলনা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকার পর আমাদের কেমন যেন ভয় করতে লাগল। মনে হোল কেন ছোড়দিকে বাধা দিলামনা। আশেপাশে সকলের বাড়ি খোঁজা হোল। বন্ধুবান্ধবদের বাড়িও বাদ গেলনা।

কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলনা ছোড়দিকে। থানায় খবর গেল। শেষে পাড়ার এক ভদ্রলোকের মুখে শোনা গেল পদ্মপুকুরের সামনে ছোড়দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন উনি রাত সাড়ে দশটা নাগাদ। শোনামাত্র পুকুর তোলপাড় করে খোঁজা হোল। আর ছোড়দিকে পাওয়া গেল সেখানেই জলের তলায়।

অবন্তী প্রশ্ন করল।

—তোর সেই শুভদার বিয়ে হয়েছিল পরদিন?

—বাঃ হবেনা? ধুমধাম করেই বিয়ে হয়েছিল। ছোড়দি মারা যাওয়ার কয়েকদিন পর শুভদাকে দেখেছিলাম আমি নতুন বৌয়ের সঙ্গে। খুব খুশিখুশি দেখাচ্ছিল। আমার মনে হয়েছিল বৌয়ের থেকে ছোড়দি অনেক বেশী সুন্দর ছিল। তবু শুভদা যেন খুশিতে আত্মহারা সেই বৌ পেয়ে। পরে শুনেছিলাম শুভদাদের চেয়েও অনেক বড়লোক বউয়ের বাপের বাড়ি। যৌতুক হিসাবে অনেক কিছুই পেয়েছিল শুভদারা। আমার বাবার সাধ্য ছিলনা ছোড়দির বিয়েতে অত যৌতুক দেয়।

অবন্তী কোনদিন শ্যামলীর ছোড়দিকে চোখে দেখেনি। তার কথাও শোনেনি। তবু তার বুকের মধ্যেটা ভারী হয়ে উঠেছিল। অনেকদিন ওর মনে হয়েছে বয়স আন্দাজে বড় বেশি গম্ভীর আর নিরাবেগ যেন শ্যামলী। আজ কিন্তু অন্য কথা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল অনেক দুঃখে পাথর হয়ে গেছে সে। আজ প্রবল আঘাতে সেই পাথর ফেটে বেরিয়ে পড়েছে দুঃখের জলস্রোত।

শ্যামলীকে যেন কথায় পেয়েছিল আজ। তার ছোড়দির কাহিনী শেষ করেও থামেনা। আগের মতই স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে বলে যেতে থাকে সে একভাবে।

—পরে টেবিলের ড্রয়ারে পাওয়া গিয়েছিল ছোড়দির হস্তাক্ষরে শুভদার নাম লেখা একটা খাম। বেশ ভারী। শুভদার কাছে শেষ চিঠি লিখে গিয়েছিল ও। মাকে উদ্দেশ্য করেও একটা চিঠি লিখেছিল ও। যার সারমর্ম হলো ও আর বাঁচতে চায় না। আর কয়েকটি গান টেপ করে গেছে ও। সেগুলি যেন শুভদার কাছে তার চিঠির সঙ্গেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের মনে কিন্তু দারুণ অভিমান হয়েছিল তার জন্য। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শুভদার কথাই ভেবেছে ও। আমাদের কথা নয়। এই নিদারুণ সত্যি কথাটা আমাদের যেন কাঁটার মত বিঁধেছিল। যে মারা গেছে তার প্রতি রাগ বা অভিমান করা সাজে না। তবু আমরা অনেকদিন পর্যন্ত ওর ওপর অভিমান করেছি। মনে মনে বলেছি শেষ পর্যন্ত সেই অপদার্থটার কথা ভেবে গেল ও। দিদি বলেছিল ঐ চিঠিটা আর

টেপটা না পাঠাতে। তাতে ছোড়দিরই অপমান। কিন্তু মা কিছুতেই শুনলেননা। মেয়ের শেষ অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। শুভদার চিঠির সঙ্গে গানের টেপটা পাঠিয়ে দিলেন।

স্তব্ধ হয়ে শুনছিল অবন্তী। এত ভালোবাসা যায় একজনকে। সেও তো পট্টনায়ককে ভালবাসত একদিন। কিন্তু এখন কই আগের সেই উত্তাপ তো এতটুকুও অবশিষ্ট নেই? পট্টনায়কের কথা মনে হলে বরং তীব্র এক ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা পাক দিয়ে ওঠে তার মনে। প্রথমে সেও কম ভেঙ্গে পড়েনি! তার মনেও মৃত্যুচিন্তা হানা দিয়েছিল। কিন্তু অসহায় দিদি আর মায়ের কথা ভেবেই চরম রাস্তা বেছে নিতে পারেনি।

অবন্তীর মনে হচ্ছিল বিষে বিষক্ষয়ের মত তার পরিবারের দুঃখ তাকে বাঁচিয়েছে চরম বিপদ থেকে। তা না হলে তারও কি পরিণাম হতে পারত ভেবে শিউরে ওঠে সে।

বার

লিফ্‌ই চলছিল না। লোডশেডিং ছিল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল অবন্তী। ও আজ অন্যদিনের চেয়ে বেশ কিছুটা আগে এসে গিয়েছে। আজকাল শ্যামলী তার সঙ্গে আসেনা। ওর বাবার শরীর ভাল চলছেনা। তার সবকিছু সামলে তবে ও অফিসে আসে। ওর দিদি একটা প্রভাতী স্কুলে পড়ায়। খুব ভোরবেলায় বেরিয়ে যায়। ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যায়। মায়ের সঙ্গে সংসারের কাজও অনেকটা হাতে নাতে সারে শ্যামলী। সম্প্রতি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাবার তত্ত্বাবধান করা।

রাতের অনেক হ্যাপা অবশ্য শ্যামলীর দিদি সোনালীই সামলায়। তবে সকালে কিছুই করতে পারেনা সে। আগের মত অবন্তীর সঙ্গে অনেক আগে অফিসে উপস্থিত হতে পারেনা তাই শ্যামলী। মাঝখানে অবন্তীর দেরী হচ্ছিল অফিস আসতে। কিন্তু এখন সতর্ক হয়ে চেষ্টা করে ঠিক সময়ে আসছে আবার।

যোগমায়া দেবীর শরীর আগের মতই। ওষুধ পথ্যে তেমন উন্নতি হচ্ছেনা। অবন্তী কেন যেন বুঝতে পারছে তার মায়ের শরীর আর আগের মত হবে না। এ ভাবেই নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল কাটিয়ে তাকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে চলে যাবেন একদিন।

মায়ের কথা চিন্তা করলেই তীব্র অভিমানে ছেয়ে যায় তার মন। তার কথাটা

বেমালুম ভুলে গেছেন মা। দিদির চিন্তা করেই শেষ হয়ে যাচ্ছেন। তিনি চলে গেলে তার ছোট মেয়েটির অবস্থা কি হবে তা একবারও ভাবছেন না। অথচ সে তার মায়ের চিন্তায় পাগলপ্রায় হয়ে উঠছে।

—এই যে ম্যাডাম আজ এত আগে যে?

চমকে ওঠে অবন্তী। তার সামনে প্রায় পথরোধ করে দাঁড়িয়ে দীপ্তিময় চ্যাটার্জী। অশরীরী প্রেতাত্মার মত ভুঁইফোড় হয়ে আবির্ভূত হলো যেন। এত চিন্তামগ্ন ছিল সে যে হঠাৎ কোনখান থেকে ওই মূর্তিমান শয়তান এসে উপস্থিত হলো তা বুঝতেই পারলনা। আশেপাশে কেউ নেই। ও যদি তার গায়ে হাত দিয়ে কোন রকম অসভ্যতা করে সে কোনমতেই ঠেকতে পারবে না।

দারুণ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল অবন্তীর শরীর। দীপ্তিময় এগিয়ে এল আর এটু কাছে। অবন্তী দেখল শয়তানের লোভের আগুন জ্বলছে ওর চোখে। তার শরীর পুড়ে যেতে লাগল সেই দাহ সহ্য না করতে পেরে।

—ভয় পেয়ে গেলেন নাকি?

দুই ধাপ আগের সিঁড়ি থেকেই হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল সে অবন্তীকে। দারুণ ত্রাসে এক ধাপ সিঁড়ি নেমে চিৎকার করে ওঠে অবন্তী। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাকে ধরে ফেলল পেছন থেকে তাকে সবল হাতে। অবন্তী তাকিয়ে দেখে তার পরিত্রাতা অপর কেউ নয়, স্বয়ং সুধাংশু বোস।

সপাটে চড় কষায় সুধাংশু দীপ্তিময়ের গালে।

—আবার শয়তানী শুরু করেছ? এত কাণ্ড করেও লজ্জা হয়নি? এই সেদিনই তো এয়ার কণ্ডিশন মার্কেটে মার খেয়ে এলে। মেয়েদের কাছে ঘুরঘর খালি। ঐ জন্যই সাত সকালে অফিসে এসে হাজির হয়েছ? লোফার বদমাশ কোথাকার!

সুধাংশু বোসকে এরকম মারমুখী ভঙ্গীতে আগে কোনদিন দেখিনি অবন্তী। গম্ভীর, স্বল্পভাষী এই মানুষটি কাজের কথা ছাড়া পারতপক্ষে অন্য কোন কথা বলতে চায়না। একমাত্র অবন্তীর সঙ্গেই তবু কিছুটা কথাটথা বলে। দাদার মৃত্যুর পর অবন্তী যখন ভীষণভাবে মুহ্যমান তখন সুধাংশু সহজভাবে তার সঙ্গে অনেক বিষয়েই আলোচনা করেছে। কিন্তু জীবন জগৎ মৃত্যু মানুষের চেতনা ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বিষয়ের বাইরে প্রসারিত হয়নি সেই আলোচনা।

তার মুখে গালিগালাজ যেন কল্পনাই করা যায়না। মুহূর্তের জন্য হলেও অবন্তী ভাবল সুধাংশুর এই অভূতপূর্ব উত্তেজনার কারণ কি সে? অন্য কেউ হলেও কি অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যেত?

সুধাংশুর তাড়া খেয়ে ত্রস্ত ভঙ্গীতে পিছু হটে গেল দীপ্তিময়। পেছন থেকে তাকে দেখে অবন্তীর মনে হচ্ছিল তাড়া খাওয়া পশুর মত পালিয়ে যাচ্ছে সে মানুষের সামনে থেকে।

এবার অবন্তীর দিকে ফেরে সুধাংশু। ঈষৎ পরুষ, রূঢ় স্বরে অবন্তীকে ধমকায় সে।

—আপনারই বা সাত সকালে অফিসে আসার দরকার কি? হাজিরা তো অনেক পরে। আজ যদি আমি উপস্থিত না থাকতাম কি হতো বলুন তো? ওর কথা জানেননা? কীর্তির শেষ নেই ওর।

সত্যিই দীপ্তিময়ের কথা অজানা নয় অবন্তীর। ওর সম্পর্কে অনেকের কাছে অনেক কিছু শুনেছে সে ইতিমধ্যে। ওদের অফিসের সিলভিয়া ডি সুজাকে একদিন সিঁড়িতে একা পেয়ে তার বুকের ওপর হাত দিয়েছিল। লম্বা চওড়া সবল মেয়ে সিলভিয়া। সে ছাড়বে কেন? সঙ্গে সঙ্গে চড় কষিয়েছিল ওর গালে। তার মধ্যে আরও দু'একজন এসে পড়েছিল। সিলভিয়ার হাতে ওর নাজেহাল অবস্থা চোখে পড়েছিল তাদের।

নতুন কোন অল্পবয়সী মেয়ে দেখলেই হোল। দীপ্তিময় তার কাছে ঘুরঘুর করবে। তার পাশে বসবে কিংবা অন্যভাবে তার সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ওসবে হয়ত কিছু হোতনা যদিনা তার একটি মারাত্মক মুদ্রাদোষ থাকত। মেয়ে দেখলে নিসপিস করে তার হাত। তাদের বুকে কোমরে হাত না দিয়ে পারেনা। তার এই দোষ শুধু অফিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অফিসের বাইরেও এই স্বভাব ছাড়তে পারেনা সে।

এরমধ্যে প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শোনা গেছে বেশ কয়েকটি ঘটনা। সব ঘটনারই প্রায় এক ইতিহাস। বাসস্টপে বাসে কিংবা কোন দোকানের মধ্যে মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে দীপ্তিময়। যখন ধরা পড়েছে গালাগালি কিংবা চড়চাপড় খেয়েছে। অল্প কিছুদিন আগে অনুরূপ ঘটনার জন্য অনেকের হাতে মারধর খেতে হয়েছে তাকে। বিদেশী মেয়েদের পর্যন্ত রেহাই দেয়না সে। শ্যামলীর কাছে, মিসেস চন্দের কাছে অনেক খবরই পেয়েছে অবন্তী।

এমনও শুনেছে যে নিয়মিতভাবে বিশেষ পল্লীতে গিয়ে বিশেষ মেয়েদের সঙ্গে সহবাস করে আসে ও। দীপ্তিময়কে দেখলে, তার চোখের চাহনী কিংবা মুখের ভাব দেখলে অবিশ্বাস হয়না এসব রটনায়। অদ্ভুত ক্লেদাক্ত একটা ছাপ পড়ে গেছে যেন দীপ্তিময়ের শরীরে। দেখলেই কেমন গা ঘিনঘিন করে অবন্তীর। হয়ত সেক্স-ম্যানিয়াক্ এই ছেলেটির বিকৃতির মূলে বিশেষ কোন ইতিহাস আছে। কিন্তু শ্যামলীদের জিজ্ঞাসা করে তার কোন সদুদত্তর পায়নি সে।

একে এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করে অবন্তী। দীপ্তিময় অবশ্য অনেকদিনই চেষ্টা করেছে তার সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু অবন্তী পাত্তা দেয়নি। পরে তার খারাপ লেগেছে একথা ভেবে। মনে হয়েছে 'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়'—এই নীতি উপদেশের কথা। তবু তার মনের ভয়, ত্রাস আর ঘৃণাকে সে জয় করতে পারেনি। আজ সুধাংশু না থাকলে কি হোত কে জানে?

তবু সুধাংশুর ওপর তার রাগ হলো। এরকম রূঢ়ভাবে তার সঙ্গে কথা বলবে? হতে পারে দীপ্তিময়ের অসভ্যতায় বাধা দিয়েছে। অবন্তী বেঁচে গিয়েছে তার জন্য। কিন্তু তাই বলে এভাবে কটু কথা বলার অধিকার নেই তার? তাছাড়া সে কি করে বুঝবে বাসটা এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেবে? আর দীপ্তিময়ের কথাটাই বা মাথায় আসবে কেন?

সে তো আর বুঝেসুঝে সাত সকালে আসেনি এখানে বেইজ্জত হবার জন্য? অথচ সুধাংশু এমনভাবে তাকে তিরস্কার করল যাতে মনে হয় সে খুব বেপরোয়া মেয়ে।

আশ্চর্য তার মনের কথাটাই প্রতিধ্বনিত হলো যেন সুধাংশুর মুখে।

—আপনি বড় বেপরোয়া। এটা ঠিক নয়। এখন আপনার বয়স কম। জীবনের অনেক কিছু দেখেননি শোনেননি। আমাদের এই সমাজ এখনও কম বিপজ্জনক নয় মেয়েদের পক্ষে। একটু সতর্ক হয়ে না চললে গুনগার দিতে হয় মেয়েদেরই।

নিজের ভিতরে চাগিয়ে ওঠা রাগের উত্তেজনা চেপে রেখে শান্তভাবে প্রতিবাদ করল অবন্তী।

—আপনি কেন ভাবছেন আমি বেপরোয়া? আমি বুঝতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছাব। আসলে বাসটা আজ খুব তাড়াতাড়ি চালিয়েছে। আর আমিও অবশ্য অন্য দিনের চেয়ে একটু আগেই বেরিয়েছি বাড়ি থেকে।

হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে গেল সুধাংশু। কেমন যেন আচ্ছন্ন দেখাল তাকে। অবন্তীর মনে পড়ল অনেকদিন আগে এরকম ভঙ্গীতে কথা বলেছিল সে অবন্তীর সঙ্গে।

—আমি শুধু এই ঘটনাটার জন্য বেপরোয়া বলিনি আপনাকে। অনেক কিছু দেখেই এই ধারণা হয়েছে আমার। আপনি যেন অনেকের থেকেই অপরিণত। আপনাকে দেখে আমার মনে হয় আপনার মধ্যে রয়েছে এক দুরন্ত ছটফটে শিশু। যে বুঝতে পারছে না সে কি চায়। তাই তার এত ছটফটানি, অস্থিরতা। আপনার চেহারায়—

হঠাৎ সচেতন হয়ে থেমে গেলে সুধাংশু। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবন্তীর মনে পড়ল পট্টনায়কের কথা। সুধাংশুর সঙ্গে তার চেহারায়, বাচনভঙ্গীতে, বক্তব্যে কোনই মিল নেই। কিন্তু সেই অমিলটাই আবার ধাক্কা দিয়ে সচেতন করল তাকে।

তার মনে আছে পরিচয় পরে পরেই তার চেহারায় স্তুতি করেছিল পট্টনায়ক সপ্রতিভভাবে। নিপুণ শব্দের জাল বিছিয়ে বন্দী করতে চেয়েছিল তাকে। সত্যি কথা বলতে কি অবন্তীর খারাপ লাগেনি। পট্টনায়কের স্তুতিময় বর্ণনা শুনে তীব্র রোমাঞ্চ অনুভব করত সে। সারা শরীরে ছোঁয়া লাগত কদম ফুলের।

অবন্তী মিত্র তখন দুটি সত্তায় ভাগ হয়ে যেত। একটি দর্শক হয়ে নিবিড় চোখে উপভোগ করত সুন্দরী অবন্তীর সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের স্তুতি শুনে সেই তীব্র শারীরিক উত্তেজনার কথা এখনও বিস্মৃত হয়নি সে।

সুধাংশু কিন্তু কোনদিন সেরকম স্তুতি করেনি। এমনকি সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে দেখেনি পর্যন্ত অবন্তীর দিকে। তবু অবন্তীকে সে যে পছন্দ করে তা বুঝতে অসুবিধা হয়না তার। আজ এই মুহূর্তে অসতর্ক ভাবে চেহারার উল্লেখ করে কি বলতে যাচ্ছিল তা জানতে ইচ্ছা করছিল তার। কিন্তু সুধাংশু একেবারে চাপা দিল সে প্রসঙ্গ। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে বলতে উঠতে লাগল সে ওপরে।

ভেতরে ভেতরে দারুণ হতাশ বোধ করতে লাগল অবন্তী। সে নিজেই অবাক হয়ে গেল দেখে যে তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছে এক বিচিত্র প্রত্যাশা। পট্টনায়কের মনে তার সৌন্দর্যের প্রতিক্রিয়া কেমন তা তার অজানা নেই। কিন্তু সুধাংশুর চেতনায় সেই সৌন্দর্যের প্রভাব কেমন তা জানার এক তীব্র বাসনা টের পেল সে নিজের মধ্যে।

অবন্তী বোঝে এটি তার দুর্বলতা। চেষ্টা করে কাটিয়ে ওঠা উচিত এই দুর্বলতা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পট্টনায়কের সাহচর্যে এমন একটি অভ্যাস তৈরি হয়েছে তার যে তা একেবারে মজ্জাগত হয়ে গেছে। নিজের সৌন্দর্য অন্যের চোখে না দেখলে নিজের মূল্য যেন কমে যায় নিজের কাছেই।

অফিসে ঢুকে ছোট্ট করে হাসল সুধাংশু অবন্তীর দিকে তাকিয়ে। তার কালো অসুন্দর গম্ভীর মুখে বড় সুন্দর লাগল সেই হাসি।

—কিছু মনে করবেননা। আপনাকে কড়া কথা বলেছি। তবে একটা কথা সব সময়েই মনে রাখবেন। এই অফিসে এমন অনেক 'এলিমেন্ট' আছে যারা যে কোন মেয়ের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। তাদের একটু তফাতে রাখবেন।

লাঞ্চের সময় শ্যামলীকে বিবৃত করল অবন্তী ঘটনাটা। শ্যামলী সব শুনে

বলল—'ভাগ্যিস সুধাংশুদা এসেছিলেন! না হলে কি হোত বলতো? লোকজন দেখলে ভাবত কি?

অবন্তী বলল—'আচ্ছা শ্যামলী দীপ্তিময়কে লোকে তো কম অপমান করে না? এত অপমান হেনস্থা সহ্য করেও ওর স্বভাব পাল্টায়না কেন?

শ্যামলী হাসে।

—ভাল লোককে জিজ্ঞাসা করেছিস। আমি কি করে বলব কেন? তবে মনে হয় এটা ওর নিশ্চয়ই একটা ব্যাধি। খুন করার ইচ্ছে, ধর্ষণ করার ইচ্ছে, নোংরা কথা বলার ইচ্ছে এগুলি সবই একেকটা ব্যাধি। অসীম গুহকে তো দেখেছিস। অকারণে নোংরা কথা বলতে ভালবাসে লোকটা। কারুর যদি নতুন বিয়ে হোল তো কথা নেই। মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে অশালীন বিশ্রী বিশ্রী প্রশ্ন করবে। মুখের কোন লাগাম তো নেইই। আবার পাত্রাপাত্রেরও ভেদজ্ঞান নেই। 'দু' একজন মেয়েও দেখবি এদের সঙ্গে কেমন তাল দিয়ে চলে? মিত্রাদি মানুষটা খারাপ না। মনটা বেশ ভাল। খুব ভাল রান্না করে। তুই বোধ হয় খাসনি এখনও। আমরা খেয়েছি। আগে প্রায়ই এটাসেটা রান্না করে খাওয়াত। মুখ ফুটে একবার বললেই হোল! সঙ্গে সঙ্গে মিত্রাদি প্রস্তুত। কিন্তু হলে কি হবে? বড় ভালগার। ছেলেদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কি ধরনের কথা বলে কল্পনা করতে পারবিনা। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে কোডের ভাষায় কথা বলে। অপরের কান ফাঁকি দিয়ে নিজেদের বিকৃত ইচ্ছা পূরণ করে।

অবন্তী বলল—'এই অফিসে কতদিনই বা এসেছি? কিন্তু এর মধ্যে কত রকমের চরিত্র দেখলাম। রামন ঠিকই বলেছিল। আমাদের এই অফিসটা একটা পাগলখানা। বেছে বেছে পাগলদের ধরে এনে পোরা হয়েছে এখানে।

সশব্দে হেসে ওঠে শ্যামলী।

—কে বলেছে? রামন? ও নিজেই তো পাগল। ও আবার অন্যদের পাগল ভাবছে? তুই জিজ্ঞাসা করলিনা কেন তুই কি? শুনতিস তোকে কি ভাবে ও? এর চেয়ে রগড় আর কি হয়? একজন পাগল অন্যদের বলছে পাগল!

অবন্তী বলল—'অনেক সময় ওর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে দিব্যি স্বাভাবিক মানুষ। আমি যদি না জানতাম ওর সম্বন্ধে তাহলে—অবন্তীকে বাধা দিয়ে শ্যামলী বলল—'একটা খবর রাখিস? ও সন্ধ্যাবেলায় অফিসের পর ভিক্টোরিয়া কিংবা ইডেনে চলে যায়। বেশ অনেক রাত পর্যন্ত থাকে সেখানে। প্রীতিশকে ও নিজের মুখে বলেছে সেকথা। আরও দু'একজনও নাকি দেখেছে ওকে ওসব জায়গায়। ও নাকি দেখতে যায় লোকেরা সেখানে কি করে? প্রীতিশ

একদিন সুমিতকে বলছিল সেকথা। আমি কাছেই ছিলাম। আমার কানে গিয়েছিল কথাটা। আর প্রীতিশ কিছু আস্তে বলেনি কথাটা। প্রীতিশের কাছে নাকি ও বলেছিল—আজকাল কি সব উল্টোপাল্টা ব্যাপার চলেছে বলুন তো! সেদিন ইডেনে চোখে পড়ল ঝোপের মধ্যে একজন মাঝবয়সী মহিলার সঙ্গে একটি অল্পবয়সী ছেলের কি কাণ্ডটাই না চলছে?

শেষের কথাটা গলা চেপে আস্তে আস্তে বলল শ্যামলী। শুনতে শুনতে লাল হয়ে যাচ্ছিল অবন্তী। এসব শুনতে বড় অস্বস্তি হয় তার। শ্যামলী অনেক পরিণত তার চেয়ে এ ব্যাপারে। ও কেমন নির্বিকার মুখে বলে যাচ্ছে কথাগুলো।

ঠিক সেই সময়ে অবন্তীদের সামনে এসে হাজির হলো উৎপল, প্রতীপ আর মনোজিৎ। আগামী ১৪ তারিখে ধর্মঘট হবে দুর্গাপুরের কর্মীদের দাবির সমর্থনে। সেজন্য সার্কুলার ছাপা হয়েছে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। তারই 'কপি' দিয়ে গেল তারা অবন্তীদের।

উৎপল বলল—'তোমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ চাই। সব সময়ে ছেলেরাই কেন সব কিছু করবে? আমরা চাই তোমরাও আমাদের সঙ্গে স্লোগান দাও, বিক্ষোভ জানাও, ঝাণ্ডা উঁচাও। কবি কি বলেছেন জাননা? 'কোনকালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী/শক্তি দিয়েছে সাধনা দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী'। সুবিধেটুকু ভোগ করবে তোমরা আর অসুবিধে, ঝামেলা সব পোহাব আমরা?

শ্যামলী বলল—'তোমার দেখছি ঝগড়ার জন্য তৈরী হয়েই এসেছ। আমরা তো এখনও পর্যন্ত একটি কথাও বলিনি।'

অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেল উৎপল। কিন্তু মনোজিৎ ছাড়ল না।

—উৎপল কিছু অন্যায় বলেনি। অনেক আন্দোলন. অনেক বিক্ষোভ হয়েছে আগে। মেয়েদের ভূমিকা তখন একেবারেই ছিল 'নীল'। আমরা চাই সেইসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়।

সুব্রত অবন্তীর দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসে।

—এবার অবন্তীকে সক্রিয় দেখতে চাই আমরা।

ত্রস্ত ভঙ্গীতে অসম্মতি জানাল অবন্তী।

—অসম্ভব। আমার এসব আসে না। আমাকে ছেড়ে দাও। উৎপল বোঝাতে চেষ্টা করল।

—আমরা ছেড়ে দিলেই কি ছাড়া পাচ্ছ তুমি? পরিস্থিতি এখন কেমন ঘোরালো হয়ে উঠছে দেখছনা? দুর্গাপুরের কর্মীরা যে ধর্মঘট করেছে তা কি শুধু শুধু? গত দুবছর ধরে কোন এগ্রিমেন্ট হচ্ছেনা। কি চাইছে ম্যানেজমেন্ট? কেন

এই কনফ্রনটেশানের চেষ্টা? ওরা তার প্রতিবাদ করবে না? ওখানে আমাদের টার্মিনাল। ওখানে ধর্মঘট চললে সকলেরই দেখি টনক নড়ে! আমরা এখানে কতবারই তো ধর্মঘট করেছি। কিন্তু কই এরকম তো প্রভাব পড়েনি? দুর্গাপুরের অফিসাররা পর্যন্ত চটাতে চাইছে না কর্মীদের। তারা স্পষ্ট বলে দিয়েছে এভাবে কাজ করা সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। তারা অনেকেরই ছুটি নিয়ে বসে আছে। ওদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ম্যানেজমেন্ট ঠিক করেছে যতদিন ধর্মঘট চলবে ততদিন আমাদের কলকাতার অফিস থেকে অফিসারদের পাঠানো হবে পালা করে। ওখানে গিয়ে কাজ করবে তারা। ভাল রকমের পুরস্কারও মিলবে তার জন্য। বেশ মোটা অঙ্কের দৈনিক ভাতা তো বটেই। তার সঙ্গে চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের ব্যবস্থা। কারা কারা যাবে তারও তালিকা তৈরি হয়ে গেছে বলে খবর পেয়েছি। শুধু তাই নয়। এরকম আশঙ্কারও কারণ ঘটেছে যে প্রয়োজন পড়লে মারধর করে বাধ্য করা হবে ওখানকার কর্মীদের কাজ করাতে। ইউনিয়ন ঠিক করেছে যে কর্মীদের মারধর করলে চুপ করে থাকবে না সে। তার ফল ভোগ করতে হবে কর্তৃপক্ষকে। এতো গেল দুর্গাপুরের কথা। এখন আমাদেরও কিছু করণীয় আছে। আমরাই বা চুপচাপ সব রকম গাফিলতি সহ্য করব কেন? কেন প্রতিবাদ করব না অন্যায়ের? এগ্রিমেন্টে আমাদের স্বার্থ আছে। মাসের পর মাস এটা ঠেকিয়ে রাখছে ম্যানেজমেন্ট কোন অভিপ্রায়ে? কর্তৃপক্ষের এই যে শ্রমস্বার্থবিরোধী কর্মচারীবিরোধী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা তুচ্ছ করাব বিষয় নয়!

মনোজিৎ যোগ দিল উৎপলের সঙ্গে।

—তাছাড়া আরেকটা জিনিস তোমরা লক্ষ করে দেখছ না? ক্যাজুয়াল কর্মী ছাঁটাই, বিশেষ বিশেষ বিভাগ তুলে দেওয়া, বাধ্যতামূলক অবসর, কোনরকম কারণ না দর্শিয়ে পদচ্যুতি—এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত কম্প্যুটার বসানোর কথা হচ্ছে অনেক বিভাগেই। কোন চরম বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এগুলি তা যদি এখনও না বুঝি আমরা তাহলে আর পরিত্রাণ নেই আমাদের! যে আগুন লাগানো হচ্ছে তা কি ছড়িয়ে পড়বে না চার দিকে?

অবন্তী বা শ্যামলী নিঃশব্দে শুনে যায়। মনোজিৎ থামলে আবার বলতে শুরু করে উৎপল।

—আমরা একটি বিশেষ জরুরী মিটিং ডাকছি আগামী বুধবার। তোমরা অবশ্যই উপস্থিত থাকবে। সেদিন আলোচনাক্রমে ঠিক করা হবে আমাদের কর্মপন্থা।

অবন্তী স্বস্তি পায় শুনে। লুকিয়ে রাখতে পারেনা তার মনোভাব।

—তাই বল। ধর্মঘট করা হবে কিনা এখনও ঠিক হয়নি? এতক্ষণ তাহলে ভয় দেখাচ্ছিলে আমাকে?

হেসে ফেলল সকলে। উৎপল সাহস দেয়।

—এত ভয়ের কি আছে অবন্তী? যা করব তা যখন একসঙ্গে করব তখন যা ফল ভোগ করার তাও একসঙ্গেই ভোগ করব।

—ঠিক সেরকম ভয়ের কথা ভাবছিনা। আসলে ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে বড় ভয় আমার। আমি রাজনীতি, ধর্মঘট, স্লোগান এসবে কোনদিনই আগ্রহ বোধ করিনা।

মনোজিৎ বলে—'কিন্তু এসব তো আমাদের জীবনযাত্রার বাইরে নয়? বাঁচার প্রয়োজনেই আছে এসব জিনিষ। আমরা আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ভিত্তি তৈরি করেছে এসব। আজ তুমি নিরাপদ আছ বলে ভাবছ এগুলো ঝুট ঝামেলা। যখন তোমার জীবন জীবিকা বিপন্ন হবে তখন কিন্তু মনে হবে খুবই প্রয়োজনীয় এসব জিনিস। অমূল্য হাতিয়ার মনে হবে তখন এগুলি।

কয়েকদিন পর মিটিং বসল তাদের ইউনিয়নের। নেতারা সম্মতিক্রমে ঠিক করলেন দুর্গাপুরের কর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে তারাও এখানে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে প্রতীক ধর্মঘট চালাবেন। অবন্তীদের অনেকেরই ইচ্ছা ছিল না সেই ধর্মঘটে সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়। কিন্তু মেয়েদেরও এবার বলা হলো ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে ধর্মঘটে সামিল হতে।

প্রতিদিন হাজিরা দিয়েই শুরু হোত স্লোগান। অবন্তীর ভালো লাগতনা। সবচেয়ে খারাপ লাগত যখন অফিসারদের দেখামাত্র তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে জোর স্লোগান শুরু করত ছেলেরা। অনেক নিন্দামন্দ, অপবাদ থাকত তার মধ্যে। শ্যামলী আর অবন্তীর অস্বস্তি হোত। অনেক অফিসারই হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। তাদের আচরণে গুরুতর কোন ত্রুটি খুঁজে পেতনা তারা। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা অফিসার। আর ম্যানেজমেন্ট ডিভাইড এ্যান্ড রুল নীতি প্রয়োগ করে তাদের কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা দিয়ে সাধারণ কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু সেসব বুঝতনা কিংবা বুঝতে চাইতনা ইউনিয়নের ছেলেরা। শ্যামলী একদিন ইচ্ছা করেই কথাটা তুলল।

—অফিসারদের শুনিয়ে শুনিয়ে গালমন্দ কর কেন তোমরা? আর সকলে কি সমান? অনেক ভাল অফিসারও তো আছে না কি?

গোবর্ধন মণ্ডল বলে একটি ছেলে সঙ্গে সঙ্গে অশিষ্ট দাবড়ানি দিল।

—দালালি করবেন না তো? দালালি করতে হয় ইউনিয়নের বাইরে গিয়ে

করবেন। ইউনিয়নের মধ্যে থেকে এসব চলবেনা।

এমনিতে নির্বিরোধী শ্যামলী। কিন্তু অকারণে অপমান হজম করেনা। সঙ্গে সঙ্গে সরোষে প্রতিবাদ জানাল।

—কি বলছেন বলুন তো? দালালি কাকে বলছেন? যখন কোন শব্দ ব্যবহার করবেন তখন তার অর্থ ভাল করে জেনে শুনে তবে করবেন।

নিজেদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা দেখে দু'চারজন এসে মধ্যস্থতা করে তখনকার মত থামিয়ে দিল তাদের। কিন্তু ইউনিয়নের কর্মপন্থার রদবদল হোল না এতটুকুও।

পালা করে পাঠানো হচ্ছে অফিসারদের। এর মধ্যে শোনা গেল সুধাংশু বোসকেও পাঠানো হবে। শ্যামলী অবন্তীকে বলল 'নির্বিরোধী মানুষটাকে কেন আবার ঝামেলার মধ্যে ঠেলছে বলত? শ্যামলীকে আশঙ্কা প্রকাশ করতে দেখে অবন্তীর মনে কেমন যেন খটকা লাগল। এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলেই ফেলল সে অনুমানের কথা।

—আচ্ছা শ্যামলী একটা কথা জিজ্ঞেস করব? ঠিক উত্তর দিবি? হয়ত আমার অনুমান ঠিক না। তবু মনে হচ্ছে বলে জিজ্ঞাসা করছি।

—বলে ফেল। এত দ্বিধা করছিস কেন?

—তুই কি সুধাংশু বোসকে ভালবাসিস?

—হঠাৎ এরকম প্রশ্ন? সুধাংশুদা নির্বিরোধী মানুষ কিনা বল? ওকে ঝামেলার মধ্যে পাঠাচ্ছে কেন ম্যানেজমেন্ট? উনি গম্ভীর মানুষ ঠিকই। কিন্তু কখনও স্টাফের সঙ্গে গলা তুলে কথা বলেননা। কোনদিন কোনরকম উল্টোপাল্টা কিছু করতে বা বলতেও শুনিনি। সুধাংশুদা সম্পর্কে এ পর্যন্ত কাউকেই আমি একটিও খারাপ কথা বলতে শুনিনি। এমন মানুষ সত্যিই হয়না।

অবন্তী রসিকতা করল।

—শুধু তো সুধাংশু বোসকেই পাঠাচ্ছে না। অন্যদেরও তো পাঠাচ্ছে। কিন্তু তোর চিন্তা শুধু সুধাংশু বোসের জন্য কেন? ব্যাপারটা কি শ্যামলী?

একটু আরক্ত দেখাল শ্যামলীকে। তার সঙ্গে কিছুটা বিষণ্ণও।

—জানিসই তো এসব একতরফা হয়না। আর সুধাংশুদার মত কি সকলে ভাল? দুর্নীতিপরায়ণ মেজাজী অহঙ্কারী আর দুশ্চরিত্র অফিসারদের ভালমন্দ নিয়ে ভাবতে বয়ে গেছে আমার।

এবার সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেল অবন্তী। সে জানে সুধাংশু বোসের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণা করে শ্যামলী। কিন্তু অন্যরকম দুর্বলতার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। সে

রসিকতা করেছিল বটে। কিন্তু মনে মনে জানত ব্যাপারটা তা নয়। শ্যামলীর জবাব শুনে হতবাক হয়ে গেল যেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল শ্যামলীর বিষণ্ণতা। তার মত শক্ত মেয়ের পক্ষে বড়ই যেন বেমানান সেটি। তাও যদি সুধাংশুর চেহারাটা ভাল হতো। অবন্তীতো কোন শ্রী দেখতে পায়না। ঐ কুদর্শন লোকটির মধ্যে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে কি খুঁজে পেয়েছে শ্যামলী?

পুরুষদের সম্পর্কে নির্মোহ বিতস্পৃহ শ্যামলী দুর্বল বোধ করল শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তিটির প্রতি? কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সেটুকু বোঝা যায়না তো? এ পর্যন্ত একদিনও অন্তরঙ্গভাবে দুজনকে আলাপ করতে দেখেনি সে যেটুকু কথা হয়েছে তা অফিসের প্রয়োজনে। বরং তার সঙ্গে অনেক বেশি অন্তরঙ্গভাবে কথা বলেছে সুধাংশু। মিসেস চন্দ আর আভাদিরা অবাক হয়ে গেছেন তা দেখে। শ্যামলীও তা নিয়ে সকৌতুক মন্তব্য করেছে একাধিকবার। কথাটা মনে করে খারাপ লাগল অবন্তীর। অনেকদিন সে সুধাংশুর চেহারা নিয়ে কটাক্ষ করেছে শ্যামলীর কাছে। বলেছে আয়নায় কি নিজের মুখ দেখে না ও? ও কি করে ভাবতে পারে অবন্তী ওর প্রেমে পড়বে?

পট্টনায়কের প্রতি প্রেম রাহুর মত গ্রাস করেছিল তার ন্যায়নীতি শোভন অশোভন বোধ। তার প্রতি সুধাংশুর মনোযোগ দেখে বিরক্ত হয়ে ভেবেছে স্পর্ধাতো কম নয় লোকটার? বামন হয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেতে চায়? শ্যামলীর কাছেও তো কতদিন তার বিরক্তি প্রকাশ করেছে নির্দ্বিধায়। শ্যামলীর নিশ্চয় খুব খারাপ লেগেছে। তবু সে তো কই অবন্তীর সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়নি। চরিত্রের এই সংযম কি করে অর্জন করল শ্যামলী? সব কিছু মনে করে নিজেকে বড় ছোট লাগছিল অবন্তীর।

তবু তার মানসিক প্রতিক্রিয়া একেবারেই ব্যক্ত করল না সে। শ্যামলীর ভঙ্গী অনুকরণ করেই পাল্টা প্রশ্ন করল।

—তা নয় বয়ে গেল! কিন্তু সুধাংশু বোস কি জানে তুই ওকে পছন্দ করিস?

ইচ্ছা করেই 'ভালবাসা' কথাটা উচ্চারণ করলনা সে। শ্যামলী তার বন্ধু হতে পারে। তবু গাম্ভীর্যে, সংযমে, অভিজ্ঞতায় তারও সমীহের পাত্র। সে জানে এই প্রশ্নের ঐ একটাই অর্থ হয়। আর শ্যামলীর মত বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে তা বোধগম্য না হওয়ার কথাই নয়।

একটু অন্যমনস্ক দেখাল শ্যামলীকে। অবন্তী ভেবেছিল হয়ত এড়িয়ে যাবে নয়ত অবন্তীকে তিরস্কার করবে বাজে কথায় কালক্ষেপের জন্য।

ওর জবাব শুনে তাই সত্যিই অবাক হয়ে গেল অবন্তী।

—হয়ত জানে। হয়ত জানেনা। তবে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা নয় সুধাংশুদার।

এক মুহূর্ত থেমে অবন্তীর দিকে রহস্যভরা চোখে তাকায় কেমন করে শ্যামলী।

—সৌন্দর্যের চুম্বক ক্ষমতা আছে জানিসনা। সকলকেই আকর্ষণ করে তা। চোখের সামনে সেই সুন্দরকে দেখে অসুন্দরকে ভাল লাগবে কেন?

অবন্তী আত্মবিস্মৃত হলো।

—তুই কি বলছিস শ্যামলী? তোর সুধাংশুদা আমাকে—

সশব্দে হেসে উঠল শ্যামলী।

—কি আশ্চর্য! নিজেকে এত সুন্দর মনে করিস? তুই ছাড়া আর কেউ সুন্দর থাকতে পারেনা?

অপ্রস্তুত হলো অবন্তী।

—তুই যে ভাবে বললি তাতে মনে হোল—

অবন্তীকে বাধা দিল শ্যামলী।

—আমি আবার কিভাবে বললাম? নার্সিশাসের মত নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ তুমি! তবে নার্সিশাসের পরিণতি জানত? রূপমুগ্ধতা—তা সে নিজের রূপের প্রতিই হোক কিংবা অপরের রূপের প্রতিই হোক মানুষকে বড় ভোগায়। যাদের রূপ নেই তাদের অত অগ্রাহ্য করোনা।

অবন্তী ঠিক বুঝতে পারলনা শ্যামলী তাকে এরকম তিরস্কার করল কেন? কিন্তু সমস্ত আলোচনার মধ্যে ধরা ছোঁওয়া না গেলেও কিভাবে যেন সুধাংশু বোসের সঙ্গে তাকে জড়ানো হয়েছে। সে কেমন বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল। শ্যামলীর জন্য বিচিত্র এক মায়ায় ভরে গেল তার মন। মনে হোল তার অজ্ঞাতসারেই তাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়ে চলেছে একটি ত্রিভুজ কাহিনী।

সে আরও বুঝল তার সৌন্দর্যের দায় বড় কম নয়। এই প্রথম মোহমুক্ত চোখ দিয়ে নিজের সৌন্দর্যের মূল্যায়ন করে লজ্জায় মরে গেল সে। মনে হোল যদি তার অনুমান ঠিক হয় তাহলে এটি তার সৌন্দর্যের জয় নয়—চরম পরাজয়।

সুধাংশুকে যেদিন দুর্গাপুর পাঠানো হোল ঠিক তার পরের দিনই দুর্ঘটনাটা ঘটল। কয়েকজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী একযোগে সুধাংশুর ওপর চড়াও হোল। বেদম প্রহারে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল সুধাংশু। তার মাথা ফেটে রক্ত পড়তে

লাগল। যথাসময়ে সে খবর কলকাতায় পৌছল। এই প্রথম দুই ইউনিয়নের লোকই একবাক্যে নিন্দা করল এই দুষ্কর্মের।

অফিসে সুধাংশুর ভাবমূর্তি কেমন তা জানতে পারতনা অবন্তী এই ঘটনা না ঘটলে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা পর্যন্ত দেখা গেল রীতিমত ক্ষুব্ধ। কেউ কেউ এমন কথাও বলল যে পাজী অফিসারগুলোর কিছু হোলনা। আর ভাল একজন অফিসারের কপালেই জুটল এই নির্যাতন?

ইউনিয়ন জরুরী মিটিং ডেকে ঠিক করল ম্যানেজমেন্টের উপর চাপ দেবে। যাতে দুর্গাপুরের ধর্মঘটীদের দাবি মেনে নিয়ে রফা করে। তা না হলে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে। সুধাংশু বোসের যদি ভালমন্দ কিছু হয় তাহলে তার পুরো দায় বর্তাবে ম্যানেজমেন্টের ওপর। তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল সেখানে। চাকরির নিয়ম রক্ষানুসারেই যেতে বাধ্য হয়েছিল সে সেখানে।

চিকিৎসার ত্রুটি হোলনা। অফিস থেকেই ভালো নার্সিংহোমে দেওয়া হোল সুধাংশুকে। সুস্থ হয়ে ছাড়া পাবার পরও বেশ কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলা হোল তাকে। অফিসের কেউ কেউ গিয়ে দেখা করল তার সঙ্গে। ফিরে এসে সকলেই এক রিপোর্ট দিল। 'সুধাংশু বোস অনেক রোগা হয়ে গেছে।'

শ্যামলীর সঙ্গে কয়েকটা দিন দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছে অবন্তী। সে নিজেই নিজেকে দেখে বিস্মিত হচ্ছিল। কিভাবে যেন জড়িয়ে পড়েছে সে সুধাংশু বোসের সঙ্গে।

যেনিদ সুধাংশু আবার এসে কাজে যোগ দিল সেদিন তার দিকে তাকিয়ে অবন্তী বুঝতে পারল কথাটা মিথ্যা শোনেনি তারা। সত্যিই অনেক ঝরে গেছে সুধাংশু। শ্যামলীর সঙ্গে অবন্তীও দেখা করতে গেল সুধাংশুর সঙ্গে।

স্মিত হাসি হেসে অভিবাদন জানায় সুধাংশু।

শ্যামলী বলে—'আপনার কি চেহারা হয়ে গেছে! খুব বড় চোট লেগেছিল তাই না? ম্যানেজমেন্টের উচিত ছিল সিকিউরিটি দেওয়া। ওরা বিপদের মধ্যে পাঠাতে পারল অথচ তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলনা?

সুধাংশু হাসল।

—এক হিসাবে ভালই হয়েছে। এ আমাব প্রায়শ্চিত্ত হলো। আমার মন সায় দিচ্ছিলনা ওখানে ওদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করতে। বিবেকে বড় বাধছিল। শুধু চাকরির খাতিরে আদেশ মানতে হয়েছে। বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা ভেতরে ভেতরে অনেক হাল্‌কা লাগছে আমার।

স্তম্ভিত হয়ে গেল শ্যামলী। গম্ভীর প্রকৃতি অফিসারের মুখে এরকম অপরিণত কথা শুনে হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছিলনা সে। বিস্মিত হয়েছিল অবন্তীও। এমনটা যেন সে কল্পনাও করেনি। তার সমস্ত চিন্তাভাবনার বাইরে যেন এসব।

সুধাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে কোনরকম ছলনা বা মিথ্যাচার খুঁজে পেলনা সে। তাকে দেখে দেখে বোঝা যাচ্ছিল আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে কথাটা বলছে। শ্যামলী সিকিউরুটির কথা না তুললে তার মনের এই চিন্তাটা এমনভাবে প্রকাশ পেতনা বুঝি।

অবন্তীর মনে হোল এই লোকটি পাগল না নির্বোধ সে সম্পর্কে এই মুহূর্তে সে রায় দিতে পারবেনা ঠিকই। কিন্তু সচরাচর যাদের সে দেখে তাদের চিন্তার সঙ্গে যেন এর চিন্তার ঘোরতর অমিল।

মুহূর্তের জন্য দাদার কথা স্মরণে এলো। অনুরূপ পরিস্থিতিতে দেখেনি সে দাদাকে। কিন্তু তার দাদার মতই এই লোকটিকে পাকে পাকে জড়িয়ে রেখেছে যেন বিবেক আত্মশাসন আর স্বার্থহীনতা।

আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করল সে। তাদের দুজনের সঙ্গেই সহজভাবে কথা বলছিল সুধাংশু। কিন্তু তবু যেন একটা প্রভেদ থেকে যাচ্ছিল। তার চোখে পড়েছে যতবারই তার দিকে তাকিয়েছে সুধাংশু তার চোখের দৃষ্টি কেমন নরম আচ্ছন্ন আর স্নেহসিক্ত দেখিয়েছে। কোন রূপপিপাসু পুরুষ এভাবে তাকাতে পারেনা। এই দৃষ্টি তাকে হৃদয়ের গভীরে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। এক অবিরাম 'টাগ্ অফ্ ওয়্যার' চলছিল অবন্তীর মধ্যে।

তার রূপপিপাসু চোখ সুধাংশুর অসুন্দর শ্রীহীন চেহারাকে সমানে প্রতিহত করতে চাইছিল। আবার রূপের সীমানা ছাড়িয়ে রূপাতীত এক মহৎ অনুভব জীবনে এই প্রথম যেন বপন হতে চলেছিল তার হৃদয়ে। সুধাংশু তার সস্নেহ, গভীরতা নিয়ে সমানে আকৃষ্ট করছিল সেখানে।

তের

যোগমায়া দেবীর শরীর আর ভাল হলোনা। অবন্তী বুঝতে পারছিল লক্ষণটা খুব ভাল না। এভাবে ভুগতে থাকলে বেশিদিন আর টিকিয়ে রাখা যাবেনা তাকে। তার মনে হোল মা যেন ইচ্ছামৃত্যুর সাধনা করছেন। এত বছর ধরে যিনি ধরিত্রীর মত সহিষ্ণুতা নিয়ে সব রকম ঝড় ঝঞ্ঝাটের মোকাবিলা করেছেন তার মধ্যে যেন চিড় ধরেছে। বাঁচবার ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়ে গেছে যেন।

এত বছর যাকে সব রকম অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে দেখেছে তাকে

দেখে এখন অবাক লাগে। জীবন জগৎ সংসারের প্রতি আর যেন কোন মায়া অবশিষ্ট নেই। মাঝে মাঝে তার এমন কথাও মনে হয় যে দিদির ব্যাপারটা হয়ত উপলক্ষ মাত্র। ঘটনাময় জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের ধাক্কা সয়ে তার জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তাই এভাবে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে আছেন।

তবু তার রাগ হয়। মৃত বাবা, দাদা তো বটেই এমনকি মায়ের ওপরও অভিমান হয়। ছোড়দা বা বউদির ওপরে তার আস্থা নেই। মা চলে গেলে এদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই। কিন্তু ইদানীং ছোড়দাকে দেখেও কম অবাক হয়না সে। দাদার মৃত্যুর পরও ছোড়দার তেজের কমতি ছিলনা।

কিন্তু কিছুদিন হলো তার মধ্যেও এক বড় রকমের পরিবর্তন দেখছে। বহুদিন ধরেই ছোড়দার সঙ্গে সরাসরি কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল সে। রাগে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায়। প্রয়োজনে ভাববাচ্যে দুটো একটা কথা চলত। তার মত তার ছোড়দার মধ্যেও সমঝোতার কোন ইচ্ছা দেখা যায়নি। সেও এড়িয়ে গেছে বোনের সান্নিধ্য।

কিন্তু এখন যেন তার মধ্যে কেমন একটা ভাবান্তর দেখা যাচ্ছে। ছোড়দাকে অনেক দুর্বল, নরম বলে মনে হচ্ছে আজকাল। মায়ের কাছে মাঝে মাঝে এসে চুপচাপ বসে থাকে। শরীর কেমন জিজ্ঞাসা করে। এটা সেটা কথা বলে। অবন্তীর দিকেও যেভাবে তাকায় তাতে তার মনে হয় সে যেন সব কিছু ভুলে অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি করতে চাইছে। অবন্তীই বরং পাত্তা দেয়না।

অপর পক্ষে বৌদির সঙ্গে সম্পর্কের সূতোয় কেমন যেন চিড় ধরেছে। মাঝে মাঝে সে টের পায় দুজনের মধ্যে চটাচটি হচ্ছে। হাসি ঠাট্টা, সিনেমা থিয়েটার দেখা ইত্যাদি অনেক কমে গেছে। শুধু তাই নায়। মাঝে মাঝে অবন্তীর চোখে পড়ে দুজনের বাক্যালাপও বন্ধ থাকছে। কারণ অনুমান করতে পারেনা সে।

ছোড়দার এত পরিবর্তন যেন ভাবাই যায়না। ছোড়দার সঙ্গে আবাল্য বিরোধ তার। কোনদিনই বনিবনা নেই। দাদার মৃত্যুর পর সেই সম্পর্ক চরম খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। অবন্তীই কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে।

অর্চনার সঙ্গেও পারতপক্ষে কথা বলেনা সে। তবে অর্চনা নিজেই এসে কথা বলে বলে তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হয়নি। কিন্তু ইদানীং তার ছোড়দাকে দেখে মনে হয় সে যেন অতীত মুছে ফেলে নতুন করে শুরু করতে চাইছে জীবন।

কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝে উঠতে পারেনা। বৌদির সঙ্গে কেন আগের মত মিল নেই ছোড়দার? বৌদিকে প্রথম থেকেই পছন্দ করেছে তার ছোড়দা। তার চরম পরিণতি দেখেছে তার দাদা মারা যাওয়ার পর। দিদি যখন এখানে ছিল

তখন তাকে নিয়ে অশান্তি হয়েছে কিন্তু ছোড়দার সঙ্গে বউদির সম্পর্ক খারাপ হয়নি। বউদিকে আগলে রাখত যেন তার ছোড়দা।

এখন নিরঙ্কুশ সুখভোগের কথা তাদের। তবু তাদের মধ্যে ঘনীভূত হচ্ছে তীব্র বিরোধ। অবন্তী তার ছোড়দা আর বউদির দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে সেটা। হয়ত বাড়িতে একটা বাচ্চা থাকলে অন্যরকম হোত সবকিছু। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা।

যোগমায়া দেবীরও তা নিয়ে কম দুঃখ না। অবন্তীর মাঝে মাঝেই মনে হয় বাড়িতে নাতি বা নাতনী একটি থাকলে তার দৌরাত্ম্য সামলাতে হয়ত আবার উঠে বসতেন তিনি। একটি শিশুকে কেন্দ্র করে তাদের মরা সংসার আবার বেঁচে উঠত।

নিজের মনের গতিপ্রকৃতি দেখে নিজেই অবাক হয়ে যায় অবন্তী। আগে ছোড়দার সঙ্গে অর্চনার মিল দেখে বিরক্ত হতো সে। দুজনের অন্তরঙ্গতার দৃশ্য অসহ্য ঠেকত চোখে। তার কানে গরম সীসা ঢালত দুজনের প্রণয়বিগলিত আলাপ।

কিন্তু আশ্চর্য দুজনের বিরোধ দেখে এখন তার মন খারাপ হয়ে যায়। একদিন সে তার মায়ের মত অনায়াসে মেনে নিতে পারেনি দুজনের সম্পর্ক। কিন্তু সময়ের সাথে এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে এখন সেই সর্ম্পকের ফাটলও ধরছে দেখেই বরং অস্বস্তি হচ্ছে তার মনে।

তার ছোড়দার চেহারায় ধরা পড়ছিল সেই জিনিষ। আগের সেই লাবণ্য আর দেখা যাচ্ছিলনা। কেমন এক রুক্ষতা আর কাঠিন্য গ্রাস করে নিচ্ছিল তার সেই সুকুমার লাবণ্য। তবু রাগ আর অভিমান জয় করতে পারছিলনা অবন্তী। ছোড়দার সঙ্গে সহজ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা।

সরকারপুলে গিয়ে দিদিকে দেখে আসত মাঝে মাঝে অবন্তী। ইদানীং অরণীও গিয়ে দেখে আসছে। কিন্তু যোগমায়া দেবী নিজের থেকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। অবন্তীরা বললে শুনে যান এই পর্যন্ত। এসব দেখে শুনে মনে হয় তার বুঝি চিন্তাভাবনার ক্ষমতাটুকু নষ্ট হয়ে গেছে।

ইচ্ছা করেই অফিস যাওয়ার আগে মাকে স্নানটান করিয়ে যায় অবন্তী। তার বিছানাপত্র পাল্টে দেওয়া, কাপড় চোপড় রোদে দেওয়া ইত্যাদি কাজও যথাসম্ভব নিজেই সারে। অর্চনা অবশ্য অসহযোগিতা করেনা। আর তার ওপর কিছুটা নির্ভর করতেই হয়। দুপুরে বিকালে খাওয়ার ব্যাপারটা দেখতে হয় তাকেই।

বাড়িতে রাত দিনের কোন কাজের লোক পেলে হয়ত সে সমস্যা থাকতনা। কিন্তু পছন্দমত ভাল লোক পাওয়া যায়না। ঠিকে লোকটি অবশ্য খুব বিশ্বাসী।

বহুদিন ধরে এ বাড়িতে কাজে করছে। আগে প্রয়োজনে তাকে কিছুক্ষণ বাড়িতে থাকতে বলে বেরিয়ে গেছে অর্চনা। কিন্তু এখন শাশুড়ির শরীরের যেরকম অবস্থা তাতে তার ওপর বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়না। গান বাজনার চর্চা এক রকম শিকেয় উঠেছে। অরণীও আজকাল সে ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখায়না।

অবন্তীর ভালো লাগেনা এটা। সে চায় তার মায়ের জন্য যা করার সে করবে। ছোড়দা বা বউদিকে জড়াবেনা তার মধ্যে। অর্চনা তা নিয়ে অভিযোগ করেনি কোনদিন। তবু অবন্তী শ্যামলীর সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে ফেলল শ্যামলীদের পরিচিত এক মহিলাকে মায়ের দেখা শোনার জন্য নিযুক্ত করবে। আগে হলে হয়ত সে ছোড়দার সম্মতি অসম্মতি নিয়ে ভাবত। কিন্তু এখন আর তার সে চিন্তা নেই। ছোড়দা যে এখন আপত্তি করবেনা তা সে বোঝে।

কিন্তু যোগমায়া দেবীই তাকে সে সুযোগ দিলেননা। শ্যামলীর সঙ্গে কথা বলে আসার ঠিক পারের দিন একটা দুর্ঘটনা ঘটল। সকালেই বাথরুমে গিয়ে পড়ে গেলেন যোগমায়া দেবী। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে আবিষ্কার করল অবন্তী ঘুম থেকে উঠে। মায়ের শরীর খারাপ হওয়ার পর তাকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিল সে যে বাথরুম ইত্যাদিতে যাওয়ার আগে তিনি যেন জানিয়ে যান। এতদিন তার অন্যথা হয়নি। অবন্তীরা সজাগ থাকত সে ব্যাপারে। একটু দেরি দেখলে খোঁজ নিত মায়ের।

অর্চনাও কিন্তু দেখাশোনায় গাফিলতি করেনা। অরণীর সঙ্গে অর্চনার সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পর দুজনের মধ্যে একই প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। পরিবারের অন্যসব ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া। দুজনেরই আত্মকেন্দ্রিকতা আর স্বার্থপরতা অনেকখানি কমে গিয়েছিল।

ঘুম ভাঙ্গার পর মাকে বিছানায় না দেখে অবাক হয়েছিল অবন্তী। আশঙ্কা করেছিল কিছু একটা অনর্থ ঘটেছে। বাথরুমের ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে গিয়েই দেখতে পেল সংজ্ঞাহীন মাকে। কতক্ষণ এভাবে পড়ে আছেন কে জানে?

অবন্তী আর কালবিলম্ব না করে ছোড়দাদের ঘরে ধাক্কা দিল। অরণী দরজা খুলে বেড়োলে একরকম কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল, 'মা বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।'

সকলে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে এল যোগমায়া দেবীকে তার শোওয়ার ঘরে। অর্চনা আর অবন্তী মিলে জামাকাপড় ছাড়িয়ে অন্য জামাকাপড় পড়িয়ে দিল। পাড়ার ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনল অরণী। তিনি দেখে রায় দিলেন স্ট্রোক হয়েছে। এই মুহূর্তে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

পাশের বাড়ি গিয়ে শ্যামলীকে টেলিফোন করে জানাল অবন্তী তার বিপদের কথা। অনুরোধ করল সম্ভব হলে একবার যেন আসে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে আসল শ্যামলী। ট্যাক্সিতে অরণী আর অবন্তীর সঙ্গে শ্যামলীও চলল। পি.জি.তে তার এক জ্যাঠতুতো দাদা ডাক্তার। তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ভর্তি করা হোল যোগমায়া দেবীকে। ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হোল রোগিণীকে।

অবন্তীরা পড়ে রইল হাসপাতালেই। বাড়ি গেলনা। অরণী বোস জ্যাঠাবাবুর বাড়ি টেলিফোন করে অনুরোধ করল অর্চনাকে যেন খবরটা জানিয়ে দেওয়া হয়। মাঝখানে শ্যামলীই জোর করে দুজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে আনল। নিজেও খেল তাদের সঙ্গে। বিকাল পাঁচটা পঞ্চান্ন মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন যোগমায়া দেবী। এত তাড়াতাড়ি মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার জীবনীশক্তি শেষ হয়ে যাবে তা ভাবতেই পারেনি অবন্তীরা। বজ্রাহত হয়ে গেল তারা। অর্চনাকে খবর দেওয়া হোল।

বোস জ্যাঠামশায়ের বাড়ির লোককে বাড়ি পাহারায় রেখে অর্চনা চলে এল হাসপাতালে। শাশুড়ীকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে। অবন্তী বা অরণী কিন্তু তার মত কাঁদতে পারলনা। অভাবিত এই আঘাতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল তারা। নিজেদের শোকের পরিমাপও যেন করতে পারছিলনা ভাল করে।

অবন্তীর সঙ্গে অরণীরও মনে হোল মা কত্তখানি নিঃস্ব করে গেলেন তাদের। এই একটি লোকের স্নেহছায়ায় আবাল্য বড় হয়ে উঠেছে তারা। সংসারের তাপ উত্তাপ সহ্য করেও ধৈর্য্যচ্যুত হননি! অসীম স্নেহমমতায় ছেলে মেয়েদের আগলে রেখেছেন। কোনদিন কাউকে কড়া কথা বলেননি। শ্বশুর শাশুড়ী ছেলে, মেয়ে, ছেলের বউ সকলের প্রতি এরকম সমান সহনশীলতা কয়জনের মধ্যে দেখা যায়?

অরণীর মনে হোল জীবদ্দশায় মায়ের প্রতি কোনদিন তেমন করে মনোযোগ দেয়নি। সে ভেবেছিল তার যত ঘাটতি সে এখন পূরণ করবে। দুর্ভাগ্য তার সেই মর্মযাতনা মনস্তাপ মায়ের কাছে ধরা পড়লনা। মা তো ইদানীং জীবন্মৃত হয়েই ছিলেন। তিনি কি আর লক্ষ্য করেছেন তার এই পরিবর্তন?

অবন্তীর মনের চিন্তাটা কিছুটা অন্য খাতেও বইছিল। কিছুদিন ধরে তার মনে যে অভিমান আর ক্ষোভ জমা হচ্ছিল তা এখন তোড়ের মত গ্রাস করতে আসছিল তাকে। তার কি হবে একবারও ভাবলেননা মা? বিশাল পৃথিবীতে এভাবে তাকে একা অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে গেলেন?

অর্চনা ভাবছিল অতি ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে মাতৃস্নেহের স্বাদ ভুলে গিয়েছিল সে। মামিমা তাকে অযত্ন করেননি ঠিকই। কিন্তু কন্যাস্নেহে প্রতিপালন

করেননি তাকে তা বলে। শাশুড়ী তাকে পেয়ে কত খুশী হয়েছিলেন। সে এই সংসারে এসেছে বলে রীতিমত কৃতজ্ঞ ছিলেন যেন। পরে ছেলে আত্মঘাতী হওয়ায় খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। আগের সেই আন্তরিকতার উত্তাপ ধরে রাখতে পারেননি। তবু অন্যদের মত ঘৃণা বিদ্বেষে একঘরে করে রাখেননি তাকে।

পরে অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিলেন আবার। তার সঙ্গে এমন আচরণ করেছেন যেন কিছুই ঘটেনি। কিন্তু তার মনে যে গভীর দুঃখ তোলা ছিল তা কি আর বোঝা যেতনা? এখন এই সংসারে তার স্থান কোথায়? অবন্তী তো দীর্ঘদিন ধরে তাকে এড়িয়েই চলে। অরণীও আজকাল তাকে সহ্য করতে পারছেনা। সে বুঝতে পারে কেমন করে যেন কেটে গেছে তাদের সম্পর্কের তার। বেসুরো বাজছে তাদের দাম্পত্য জীবন।

অরণী আর আগের মত তার শরীরের লোভে আকৃষ্ট হয়না। রাতের পর রাত পাশাপাশি শুয়ে থাকে তারা নিষ্প্রাণ কাঠের পুতুলের মত। মাঝে মাঝে হঠাৎ জেগে ওঠা তাগিদে উত্তেজিত হয়ে তার শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অরণী। কিন্তু তার স্থায়িত্ব কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয়না। একটু পরেই গভীর বিতৃষ্ণায় ছিটকে সরে যায় সে। অর্চনায় দিকে পিছন ফিরে শুয়ে থাকে।

নিঃশব্দে শুয়ে থেকে অর্চনা টের পায় তার সেই বিতৃষ্ণা বিরাগ আর ঘৃণা। প্রথম প্রথম সে ধরতে পারতনা। অরণীর কাছে সরে এসে তাকে জড়িয়ে ধরত। তার বুকে গালে মুখ ঘষে তাকে আদর করত। অরণী ঠেলে সরিয়ে দিত। কর্কশ গলায় তার বিরক্তি জানাত 'কি ন্যাকামি করছ? ভাল লাগেনা। সরো।'

প্রথম প্রথম সেটা তার সাময়িক বিরক্তি বলে মনে করত অর্চনা। অরণীর মধ্যে যে ধৈর্য কিংবা সহ্যশক্তি একেবারেই নেই তা এতদিনে জানা হয়ে গিয়েছিল তার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনে পড়ে যেত অরণীর দাদার কথা। মনে পড়ত তার সহ্য, ধৈর্যশক্তি আর অসীম সেবাপরায়ণতার কথা। একদিন অরিন্দম তার সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিল। অর্চনার ইচ্ছা ছিল না। তার অনিচ্ছা দেখে নিবৃত্ত হয়েছিল অরিন্দম। লজ্জিত মুখে বলেছিল, 'তোমার শরীর খারাপ অর্চনা? কি হয়েছে?' অর্চনা কোন জবাব না দিয়ে বিরক্তির সঙ্গে মাথা চেপে ধরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দম তার কাছে সরে এসে তার মাথা টিপতে চেয়েছিল।

সেই মানুষটা যে কত ভাল তা কি আর বুঝতনা সে? প্রথমে তো সুখীই ছিল তারা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অরণীর প্রতি প্রলুব্ধ হলো। সেই প্রলোভনের জাল বিছিয়েছিল অরণীই। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের মেয়ে। সে কি কল্পনা করতে পারত দেওরের সঙ্গে এরকম সহবাসের কথা?

কিন্তু সৌন্দর্যের যেমন নেশা আছে। নেশা আছে বুঝি সকাম আবেগেও। নীতি নৈতিকতার ধার ধারতনা অরণী। সে আপত্তি করলেও শুনতনা। তাকে স্পর্শ করত। তার বুকে কোমরে হাত রাখত। নিজের শরীরের স্পর্শ দিয়ে তাকে উত্তেজিত করতে চাইত। মাঝে মাঝে সামনে এসে পড়ত বড় ননদ। তার চোখে পড়ত। অর্চনার অস্বস্তি হোত। অরণী পাত্তা দিতনা।

প্রথম প্রথম আন্তরিকভাবে প্রতিহত করত অর্চনা অরণীর প্রয়াস। অরণীকে বলত এসব অন্যায়। সে বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী হতে চায়না। এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিত অরণী সেসব কথা। সে বলত 'তোমার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি আমাকে তুমি চাইছ। তোমার শরীরও আমার শরীরকেই চাইছে। তোমার মুখের কথা বিশ্বাস করিনা।'

দুপুরবেলা থেকে অনেক সময়েই দোকান থেকে চলে আসত সে। দাদাকে যা হোক কোন ওজুহাত দেখিয়ে। অরুন্ধতীর সঙ্গে তার শাশুড়ী ঘুমোতেন। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইত অরুণী। চরম মিলনে রাজী হত না অর্চনা। অরিন্দমের মৃত্যুর আগে আরণীর ইচ্ছা সত্ত্বেও সেরকম কোন সর্ম্পক সত্যিসত্যিই গড়ে উঠতে দেয়নি অর্চনা।

তবে অস্বীকার করতে পারবে না অরণীর সুন্দর সবল চেহারা তার বলিষ্ঠ কামনিপুণ পৌরুষ তাকে পথভ্রষ্ট নীতিভ্রষ্ট করেছিল। তাবা পাশাপাশি শুয়ে থেকেছে, পরস্পরেরর শরীরে হাত রেখে স্পর্শসুখ পেতে চেয়েছে। কতদিন দারুন উত্তেজিত হয়ে চরম কিছু করতে এগিয়ে এসেছে অরণী। ক্ষুধার্ত সেই পুরুষকে কত কষ্টে নিবৃত্ত করেছে সে।

দাদার মৃত্যুর পর অরণী আর কিছু মানতে চাইলনা। স্বামী স্ত্রীর মতো সহবাস শুরু হলো তাদের। অবশ্য দু'একদিন মাত্র বাধা দিয়েছে আর্চনা। পরে সেও পূর্ণ সহযোগিতা করেছে সে ব্যাপারে। সেও আর পারছিল না। নিপুণ কৌশলে তাকেও উত্তেজিত করেছিল অরণী। সেও পাগলের মতো প্রত্যাশা করে থাকত কখন অরণী আসবে। তারা দুজনে মিলে মেতে উঠবে এক নির্লজ্জ মহোৎসবে। একে অপরের শরীরের স্বাদ পেতে বিহার করবে কামস্বর্গে।

কয়েকদিন পরে ধরা পড়ে গেল তারা। শাশুড়ী স্বয়ং এগিয়ে এসে তাদের অবৈধ সম্পর্কে বৈধ স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবলেন। তারা বিয়ে করল। বিয়ের পরে বেশ কিছুদিন সুখেই ছিল তারা। দুজনে দুজনের সান্নিধ্যে মাতালের মত বিভোর হয়ে কাটিয়েছে। অর্চনা নিজেও তখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। তার মনে হয়েছিল গ্রাহ্য করেনা সে লোককে। ধার ধারেনা সে লোকলজ্জার। একটি

সুন্দর পুরুষ তার শরীর চাইছে। তার শরীর দেখে কামার্ত বিহ্বলতায় অভিভূত হচ্ছে এ কি তার কম গৌরবের কথা?

অন্য সকলকে অগ্রাহ্য করে অরণীকে নিয়ে মেতে উঠেছিল অর্চনা। কিন্তু শাশুড়ীকে তবু যেন সে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। শাশুড়ীর ব্যবহারে অপরের মত বিদ্বেষ বা ঘৃণা ছিল না। তিনি তাকে একঘরে করে রাখেননি বলে সেও তাকে অস্বীকার করতে পারেনি। বিনা যুদ্ধে, কোন রকম সোচ্চার আত্মঘোষণা ছাড়াই নিজের স্থানটি অধিকার করে রাখলেন তিনি।

মৃত শাশুড়ীকে দেখতে দেখতে পুরনো অনেক কথা মনে আসছিল অর্চনার। তার কান্না শুকিয়ে এসেছিল। সামনে গভীর খাদের মত যে অনিশ্চয়তা এসে পড়েছিল তাকে কিভাবে এড়িয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছিলনা। অবন্তী তাকে স্বীকার করেনা। অরণীও তাকে কতদিন স্ত্রীর মর্যদা দিয়ে স্বীকার করবে জানেনা। অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে বেপরোয়া হয়ে যদি সে অর্চনাকে বিতাড়িত করে তাহলে তাকে আশ্রয় দেওয়ার মত দ্বিতীয় কেউ নেই।

দাদা বা বাবার সঙ্গে কোনদিন তার তেমন সম্পর্ক নেই। মামা মামী তার দ্বিতীয় বিয়ের পর অত্যন্ত রুষ্ট। সেই বাড়িতে যে অন্তঃপর তার স্থান হবে না তা সে বোঝে। এতদিন এসব প্রশ্ন মনে আসেনি। আজ শাশুড়ীর মৃত্যুতে তার অসহায় অবস্থার সঠিক পরিমাপ করতে পারল যেন। অবন্তী আর অরণীর মতো সেও বুঝতে পারল যোগমায়া দেবী তাকে কতখানি নিঃস্ব করে গেলেন।

পাশে পাশে থেকে আত্মীয় স্বজনকে খবর দেওয়া ইত্যাদিতে সাহায্য করল শ্যামলী। মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী করণীয় সব কিছু সুসম্পন্ন হোল তারই সাহায্যে আর পরামর্শে। মাঝখানে একবার বাড়ি গেল সে অল্প সময়ের জন্য। সেদিন রাতটা এবং পরদিন সকালেও কিছুটা সময় সে থাকল অবন্তীদের সঙ্গে তাদের বাড়িতেই।

সকলেরই মনে পড়ল অরুন্ধতীর কথা। কিন্তু তাকে জানিয়ে কোন লাভ নেই। অপ্রয়োজন বোধে সেখানে কোন খবর দেওয়া হল না। শ্যামলীর পরামর্শমতো তার পারিবারিক পরিস্থিতির কথা জানিয়ে অফিসের কাছে ছুটির দরখাস্ত দিল অবন্তী। শ্যামলীই সেটি সঙ্গে নিল অফিসে পৌঁছে দেবে বলে।

ঠিক পরের দিনই শ্যামলীর সঙ্গে সুধাংশু এল অবন্তীদের বাড়িতে। অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় হতচকিত হয়ে গেল অবন্তী। সে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিলনা। পরিস্থিতি সামলে দিল শ্যামলী আর অর্চনা মিলে। অরণীর বাড়ি ছিলনা। মায়ের শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থার কাজে বিধান নিতে দেখল সে। দেখবামাত্র

অবন্তীদের বিস্ময়বিমূঢ় করে বিচিত্র একটি প্রশ্ন করল।

—আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

মুহূর্তের মধ্যে দ্বিতীয় প্রশ্নটি উচ্চারণ করল সে সমান বিস্ময়ে সকলকে চমকে দিয়ে।

—আপনার মামার নাম কি ভবানীপ্রসাদ গুহ?

একটুক্ষণ চুপ করে কি ভেবে দ্বিধান্বিত কণ্ঠে অরণী বলে—'আপনার মামা আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

আগের মত সহজ অবিচলিত ভঙ্গীতেই সায় দিল সুধাংশু।

—আমি জানি।

আর কি আশ্চর্য চকিতে স্মৃতির সুতোয় টান লেগে মনে পড়ে গেল অবন্তীর অনেক দিন আগের কথা। ভবানীপ্রসাদ গুহ নামে এক ব্যাক্তি ভাগনের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে উচযাচক হয়েই এসেছিলেন তাদের বাড়ি। পাত্রের ফটো সঙ্গে এনেছিলেন তিনি। চেহারা পছন্দ না হওয়ায় বাতিল করে দিয়েছিল তারা সেই সম্বন্ধ। ভদ্রলোক ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। বলেছিলেন তার ভাগনে হীরের টুকরো ছেলে। চেহারা সুন্দর না হতে পারে। কিন্তু স্বভাবে চরিত্র আচারে ব্যবহার অতুলনীয়। পড়াশোনায় ভাল। ভাল চাকরি করে। এরকম ছেলের ভাল পাত্রীর অভাব হয়না। আর ইতিমধ্যে অনেক মেয়ের বাবাই আগ্রহ দেখিয়েছেন তার ভাগনেকে জামাই হিসাবে পেতে।

তবু তিনি যে এখানে উপযাচক হয়ে এসেছেন তার কারণ স্বয়ং ছেলের পছন্দ এই মেয়েকে। কোন এক বিয়েবাড়িতে এই মেয়েকে দেখে ছেলের খুব মনে ধরেছে।

পাত্রের হোৎকা চেহারা দেখে তাদের কারুর পছন্দ হয়নি। নাক মুখ চোখ ভাল লাগেনি। পাত্র যে পড়াশোনায় ভাল তার কোন রকম ছাপ ছিলনা তার চেহারায়। একমাত্র তার ছোড়দা কিন্তু অপছন্দ করেনি। তার ছোড়দা যেমন নিজে সুন্দর তেমন সৌন্দর্য সম্পর্কে দারুণ সজাগ। তা সত্ত্বেও পাত্র বা পাত্রী হিসাবে যাদের পছন্দ করেছিল তারা কেউই সুন্দর না। তার বউদির চেহারা তবু সুশ্রীর পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু সুধাংশুর চেহারা সম্পর্কে সেরকম আখ্যাও দেওয়া চলেনা। হঠাৎই এই কথাটা মনে হোল অবন্তীর।

সঙ্গে সঙ্গে চকিতে আর একটি কথাও মনে হোল তার। পাত্রী হিসাবে যাকে ছোড়দা পছন্দ করেছিল দাদার জন্য সে অনেক অশান্তি বয়ে এনেছে তাদের সংসারে। কে জানে সুধাংশুর জন্য হয়ত আবার ফিরে পাবে তারা শান্তি, সুখ,

আনন্দ? ঈশ্বরের বিধান কে বোঝে? হয়ত বা সেইজন্যই সুধাংশুর সঙ্গে দেখা হয়েছে তার আবার। তাদের সম্পর্ক ছিঁড়তে গিয়েও ছেঁড়েনি।

অথচ সুধাংশুকে দেখে মনেও হয়নি একে সে আগে কোনদিন দেখেছিল। নামটা পর্যন্ত মনে ছিলনা। এখন স্মৃতির অনুষঙ্গ হয়ে অনেক কিছুর যোগসূত্র স্পষ্ট হয়ে এল তার চিন্তায়।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কথা মনে পড়ল। সুধাংশুকে সকলেই গম্ভীর, স্বল্পভাষী আর নারীসঙ্গবিমুখ বলে জানে। তবু তার সান্নিধ্যে এলে সুধাংশু যেন পরে নেয় অন্য একটি পোষাক। সে কি তাহলে প্রথম দিন থেকেই চিনতে পেরেছিল অবন্তীকে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকল অবন্তী সুধাংশুকে। সুধাংশুও তাকাল তার দিকে। অবন্তীর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নয়। স্নিগ্ধ নরম মমতাভরা দৃষ্টিতে। অবন্তী হঠাৎ সংবিত ফিরে পেয়ে অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল। সে দেখল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শ্যামলী তার দিকে। অবন্তী বুঝতে পারল কোন একটা সূত্র খুঁজছে সে তাদের দিকে তাকিয়ে। তাদের কথাবার্তা অনুসরণ করে কিছু একটা বুঝতে চাইছে।

শ্যামলীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সে তাকাল তার ছোড়দার দিকে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সে তখনও সুধাংশুর দিকে। সুধাংশুর এমন আবির্ভাবে সে যে বেশ বিস্মিত হয়েছে তা তাকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিলনা কারুর। সুধাংশুরও না। কিন্তু দুজনের কেউই মুখ ফুটে ব্যক্ত করলনা কোন্ উপলক্ষে এ বাড়িতে আগমন হয়েছিল তার মামার।

আবার তাকাল অবন্তী সুধাংশুর দিকে। ভাবতে চেষ্টা করল ভাগ্যের খেলায় এই লোকটির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে তার। সুধাংশুর সঙ্গে বিবাহিত জীবনযাপন করছে সে। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনের বিরাগ চাপা দিতে পারলনা। এক রকম তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল সে তার মনের মধ্যে এরকম সম্ভাবনার কথা। মনে মনে বারবার জোরে সঙ্গে বলতে লাগল 'অসম্ভব। এরকম চেহারার লোককে কিছুতেই বিয়ে করতে পারবনা আমি। আমার স্বামী এত কুৎসিত হবেনা। সুন্দর না হোক্ অন্ততঃ সুশ্রী তো হবে'?

সুধাংশু যেন অনুমান করল অবন্তীর মানসিক অসুবিধা। তার মুখে ফুটে উঠল এক ক্লান্ত বিষণ্ণতা। অপরাধীর ভঙ্গীতে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল সে তার কথাগুলো।

—মিস গুপ্তর কাছে খবরটা পেয়ে খারাপ লাগল। মাতৃহারা হওয়া বড়

দুঃখের। এতবড় ক্ষতি কমই আছে মানুষের জীবনে। তাই ভাবলাম একবার গিয়ে দেখা করি।

অবন্তী কোন জবাব খুঁজে পেল না। জবাব দিল অরুণী।

—বুঝতে পেরেছি আপনি বিন্তীর সঙ্গে এক অফিসে কাজ করেন। ভাল করেছেন এসেছেন। লোকজন আসলেই ভাল লাগে এসময়। তবু কিছুটা ভুলে থাকা যায়।

অবন্তীর কানে 'বিন্তী' শব্দটা কেমন অনভ্যস্ত শোনাল। অনেক দিন পর তার সামনে এই নাম উচ্চারণ করল ছোড়দা। মনে মনে সে কিন্তু গুটিয়েই রইল। অবন্তী বুঝতে পারছিল সময় অনেক কিছু নিয়ে নেয়। তা আর পরে ফিরিয়ে দেয়না। তাদের ভাইবোনের সহজ সম্পর্কটাও সময়ের আর্বতে পরিস্থিতির পাকে পড়ে হারিয়ে গেছে। শত বিরোধের মধ্যে অসদ্ভাবের মধ্যেও যে সম্পর্ক একদিন দিনরাতের মত জলবাতাসের মত সত্য ছিল তা আর ফিরে আসবেনা আগের মত অবস্থায়। অথচ বাধা আসবে বাইরে থেকে নয়, তাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই।

চোদ্দ

অবন্তী ভেবেছিল আবার আসবে সুধাংশু। সন্ধ্যাবেলায় শ্যামলী আসে। আরও দু'একজন বন্ধু আসে। অফিসের সহকর্মীরাও কেউ কেউ এসে দেখা করে গেল। বোস জ্যাঠামশায়ের বাড়ি থেকে তা প্রায় নিয়মিতভাবেই কেউ না কেউ এসে খোঁজ খবর নিয়ে যায়। অর্চনার মামা মামীও খবর পেয়ে দেখা করে গেলেন। দু' একজন আত্মীয় পরিজনও এসে দেখা করলেন।

তবু সারাটা সকাল দুপুর অবন্তীর প্রাণ যেন আইঢাই করে। একমাত্র শ্যামলীর কাছেই নিজের অনেক সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারে সে। তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক টের পাচ্ছিল। শত হলেও শ্যামলী তার সমবয়সী বন্ধু। তার কাছে বয়োজ্যেষ্ঠের স্নেহ মমতা আশা করা যায়না। আত্মীয়স্বজনের মুখে স্নেহসিক্ত বুলি শোনা যায়। তার সঙ্গে উপদেশ অনুরোধও। কিন্তু সব কেমন মেকী, কৃত্রিম শোনায়। মনে হয় তারা কতগুলো বিশেষ বুলি মুখস্ত করে রেখেছেন এরকম পরিস্থিতির জন্য।

অবন্তীর মন সেসব শুনে আরও বেশি করে হাঁপিয়ে ওঠে। কেবলি মনে হয় সুধাংশু এলে ভাল হতো। তার দাদার মৃত্যুর পর স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সুধাংশু তার কাছে এগিয়ে এসেছিল। তার সান্নিধ্যে দুঃসহ মুহূর্তগুলো সহনীয় হয়েছিল অনেকটা। চেহারা সুধাংশুর যেমনই হোক—তার সান্নিধ্যে কেমন এক শান্তি

পাওয়া যায় যেন।

বয়স যাই হোক সুধাংশু তার কাছে স্নেহশীল একজন পুরুষ অভিভাবকের মত। বাবার স্মৃতি এখন অনেক ঝাপসা হয়ে এসেছে। সুধাংশুর কাছে বাবার মতো ছত্রছায়া পায় যেন। স্নেহে, মমতায়, কর্তৃত্বে। দীপ্তিময়ের ঘটনাটা না ঘটলে সুধাংশুর ব্যক্তিত্বের একটা দিক অজানা থাকত তার কাছে।

সেদিন অবশ্য খুব রাগ আর অভিমান হয়েছিল তার। সুধাংশুর পুরুষ ব্যবহার মেনে নিতে পারেনি সে। পরে রাগ সরে গেলে সমস্ত ঘটনাটা খোলা মনে আবার খুঁটিয়ে দেখেছে। বুঝতে পেরেছে তার হিতাহিতের কথা ভেবেই বিরক্ত হয়েছিল সুধাংশু। তার অসাবধানতা দেখে মনে মনে দুশ্চিন্তা বোধ করেছিল। তিরস্কার আসলে তার স্নেহেরই প্রকাশ। পট্টনায়কের সঙ্গে তার মেলামেশাও সেই একই কারণে পছন্দ করেনি। তখন সে সব কিছু তলিয়ে ভাবেনি বলে তার অপব্যাখ্যাই করেছিল। স্বামী হিসাবে তার মনে যে রূপবান স্মার্ট চেহারার একটি পুরুষের স্বপ্ন আছে তার সঙ্গে কোথায়ও খাপ খায়না সুধাংশু। কিন্তু স্নেহময় দাদা বা বাবার ভাবমূর্তির সঙ্গে সুন্দর খাপ খায় তার চরিত্র।

অবন্তী বুঝতে পারছিলনা সুধাংশু কেন আসছেনা। তার জীবনের দুঃখের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে সুধাংশু যে দুঃখের মুহূর্তে তার কথা মনে আসবেই। পট্টনায়কের মত ছেলেরা সুখের মুহূর্তেই কেবলমাত্র সঙ্গী হতে পারে।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে পর অফিসে আসল অবন্তী। অনেকেই তাকে সমবেদনা জানিয়ে গেল। পট্টনায়কও বাদ গেল না। ইতিমধ্যে একটি কন্যাসন্তান লাভ হয়েছে তার। কিন্তু খবরটা ইচ্ছা করেই চেপে গেল সে। অবন্তীও তুললনা সেই প্রসঙ্গ।

কিন্তু পট্টনায়ককে দেখে নতুন করে অবাক হয়ে গেল সে। এর মধ্যে তাদের দুজনের জীবনেই কতনা পরিবর্তন ঘটে গেছে! কিন্তু পট্টনায়কের নির্লজ্জতা প্রায় একই পর্যায়ে আছে। প্রাথমিক কুশল সংবাদ নেওয়ার পরই ইনিয়ে বিনিয়ে সে জানাতে লাগল অবন্তীর অনুপস্থিতি তার কাছে কি বিরাট শূন্যতা নিয়ে এসেছে।

তার অবাধ বিচরণতর দৃষ্টির দাহ পোড়াতে লাগল অবন্তীর শরীর। তখনকার মত দায়সারা গোছের জবাব দিয়ে রেহাই পেল বটে সে, কিন্তু ছুটির আগে আগে যখন ধারে কাছে কেউ নেই তখন আবার এসে উপস্থিত হল পট্টনায়ক। তার কাছে সরে এসে ফিসফিস করে বলল—'চলুন আজ একটু বেড়িয়ে আসবেন। শরীর মন ভাল হবে তাতে।'

সে কি ইঙ্গিত দিল বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মাত্রাছাড়া

নির্লজ্জতা আর স্পর্ধার কি সমুচিত জবাব দেওয়া যায় ভেবে পেলনা অবন্তী।

মৌনং সম্মতি লক্ষণম ভেবে পট্টনায়ক বলল—'আমি দাঁড়িয়ে থাকব এলিটের সামনে। ঠিক ৬টায়। আপনি দেরি করবেননা।

অবরুদ্ধ রাগ ফেটে পড়ল অবন্তীর—'নির্লজ্জ শয়তান কোথাকার! কি ভেবেছেন আপনি আমাকে? আপনার এত সাহস—

উদগত অশ্রুরোধের জন্য বাধ্য হয়ে থেমে গেল সে। উত্তেজনায় চিরে যাওয়া গলা দিয়ে আর্তনাদের মত তীক্ষ্ণ স্বর ধ্বনিত হলো।

কি কাজে যেন সুধাংশু বেরিয়ে আসছিল। অবন্তীর কথা কানে যেতে থমকে দাঁড়াল। অবন্তীর সামনে পট্টনায়ককে দেখে ব্যাপারটা অনুমান করতে পারল হয়ত। পট্টনায়ক মাথা নীচু করে চলে যেতে সামনে এগিয়ে এল সে। তার মুখে কোন প্রশ্ন উচ্চারিত হওয়ার আগেই ফেটে পড়ল অবন্তী।

—আপনারা আমাদের কি মনে করেন? অফিসে চাকরি করছি বলে কি আমরা আপনাদের খেলার পুতুল হয়ে গেছি? যখন যা ইচ্ছে বলবেন, যা ইচ্ছে করবেন!

সীমাহীন উদ্বেগ ঝরে পড়ল সুধাংশুর গলায়।

—আপনি উত্তেজিত হবেননা। আমি জানিনা কি হয়েছে। কিন্তু যাই ঘটুক আমি মাপ চাইছি তার জন্য। আপনি নিজেকে অপমানিত ভাববেননা। যে আপনার অসন্মান করেছে সে নিজেই অসন্মানিত হয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যেই উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে এসেছিল। অবন্তীর লজ্জা করছিল। সুধাংশুকে আত্মবিস্মৃত হয়ে এসব বলেছে বলে। সুধাংশু আর সে প্রসঙ্গ তুললনা। আগের মতই স্নেহসিক্ত কণ্ঠে তার উদ্বেগ প্রকাশ করল।

—আপনি এত উত্তেজিত হবেননা। সুযোগসন্ধানী পুরুষের অভাব নেই। মেয়েদের তারা শান্তিতে থাকতে দেয়না। কিন্তু তার প্রতিকার এভাবে হয়না।

অবন্তী তার অসহায়তা গোপন করেনা।

—কিন্তু কি করব? এরকম উৎপাত ঘটলে কি শান্ত থাকা যায়? সুধাংশু হাসল।

—তা ঠিক। কিন্তু এই উৎপাত ঘটেছে কেন? এ সমস্ত লোককে সুযোগ না দিলে কিন্তু এতটা ঘটেনা।

আবার উত্তেজিত হলো অবন্তী।

—আপনি বলছেন সব আমার দোষ? কিন্তু দীপ্তিময়ের ঘটনাটা কি ভুলে গেছেন? দীপ্তিময়ের সঙ্গে কি কথা বলি আমি?

—দীপ্তিময়ের ব্যাপারটা একটু আলাদা। ওতো সেক্স-ম্যানিয়াক। কিন্তু সব

পুরুষ তো আর ওর মত বিকৃতিসম্পন্ন নয়। দীপ্তিময়রা কোন কিছুর ধার ধারেনা। কিন্তু অন্যরাও কি তাই?

অভাবিত এই মন্তব্য শুনে ভীষণ বিরক্ত হলো অবন্তী।

—ঠিক আছে। সবই আমার দোষ।

অবন্তী আর কোন কথা না বলে টেবিল থেকে তার ব্যাগ উঠিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। পট্টনায়কের অপমানকর প্রস্তাব, তদুপরি সুধাংশুর রূঢ় মন্তব্য তার আত্মসংবরণের বাঁধ ভেঙে দিল যেন। সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল গাল বেয়ে।

হতচকিত হয়ে গেল সুধাংশু। পরিস্থিতি মোড় যে হঠাৎ এভাবে ঘুরতে পারে তা সে কল্পনাই করতে পারেনি। অপরাধীর ভঙ্গীতে অবন্তীর কাছে এসে দোষস্খলনের চেষ্টা করে সে।

—আমাকে মাপ করুন। হয়ত আমি পুরো ঠিক কথা বলিনি। হয়ত আমার ধারণায় অনেক ভুল আছে।

অবন্তী কিছু বলার আগেই শ্যামলী চলে এল সেখানে। একটু যেন অপ্রস্তুত হোল সুধাংশু তাকে দেখে। চকিতে পরিস্থিতি রক্ষা করল শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে।

—আপনাদের দুই বন্ধুকে পুরস্কার দেওয়া উচিত ম্যানেজমেন্টের।

বিস্মিত হয় শ্যামলী।

—কেন সুধাংশুদা? আমরা তো বরাবরই ঠিক সময়েই বাড়ি যাই। আজ হঠাৎ পুরস্কারের প্রস্তাব কেন?

—আরে অর্থটর্থ খুঁজবেন না। আমি একটা কথার কথা বলেছি।

বাড়ি যাওয়ার পথে শ্যামলী বলল—'সুধাংশুদা এখন একটু একটু পাল্টাচ্ছেন। একটা কথা ভাবলে অবাক লাগে। তোকে বিয়ে বাড়িতে দেখে ভাল লেগেছিল সুধাংশুদার। তোদের বাড়ির বিয়ের প্রস্তাব করে মামাকে পাঠালেন সেজন্য। তোরা ফটো দেখে পছন্দ করলিনা। সাধারণতঃ এখানেই চুকে যায় ব্যাপারটা। কিন্তু তোর জন্য আজ পর্যন্ত রয়ে গেলেন উনি কুমার।

অবন্তী লজ্জা পেল।

—তুই কিন্তু বাড়িয়ে বলছিস শ্যামলী।

—আমি যে ঝপ করে কোন কথা বলিনা তা তো তুই জানিস। তবে তোর কেন যে ওকে ভাল লাগেনা বুঝতে পারিনা। চেহারাটা কি মানুষের সব? আর ওকে দেখতে কি খুব খারাপ?

—আগে যত খারাপ লাগত স্বীকার করছি এখন তত লাগেনা। তবে অন্য

ভাবে ওকে ভাবতে পারিনা। আর তোর কি ভাল লাগবে যদি তোর সুধাংশুদার সঙ্গে অন্য কারুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে?

শ্যামলী হাসল ছোট্ট করে।

—এই কথা? জানিস তো এসব একতরফা হয়না। সুধাংশুদাকে আমি পছন্দ করি। উনি অনেকের থেকেই আলাদা বলে। কিন্তু তোর সঙ্গে যদি সুধাংশুদার কোন সম্পর্ক তৈরী হয় তাহলে আমি খুশিই হবো।

—তোর কষ্ট হবে না?

—দেখ অবন্তী আমাদের সমস্ত অনুভূতি অঙ্কের হিসাবে তৈরি হয়না। উনি যদি আমাকে সেরকম চোখে না দেখে থাকেন তাহলে সেটা ওর কোন অপরাধ নয়। সত্যি বলছি আমি খুশি হবো যদি উনি ওর পছন্দমত কোন মেয়েকে বিয়ে করেন।

অবন্তীর কাছে তার বাড়ি আজকাল অসহ্য হয়ে উঠেছে। তিনটি মাত্র প্রাণী বাড়িতে। কিন্তু কেউ কারুর সঙ্গে সহজ নয়। অরণী আর অর্চনার সম্পর্ক পূর্ববৎ রয়ে গেছে। অসুস্থ অবস্থায়ও তাদের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন যোগমায়া দেবী। তার অভাব সকলকেই বড় বাজছিল।

ছোড়দার সঙ্গে বউদির সম্পর্কের উত্তরোত্তর অবনতি ভাল লাগছিলনা অবন্তীর! নিজে সে কিছুতেই সহজ হতে পারে না তাদের সঙ্গে। অর্চনা তার সঙ্গে কথা বন্ধ করেনি। নেহাৎ না বললে নয় গোছের জবাব দিয়ে এড়িয়ে যায় তার সান্নিধ্য। আপাতদৃষ্টিতে তার সঙ্গে কোনদিন দুর্ব্যবহার করেনি অর্চনা। বরং সম্মানে বা বয়সে বড় হয়েও অবন্তীর প্রতি তাব আচরণ যথেষ্ট সমীহাপূর্ণ। তবু অর্চনাকে সহ্য করতে পারেনা সে।

তাদের পরিবারে অর্চনা আসার পর একে একে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার জন্য অর্চনাকে দায়ী না করে পারে না। এই রমণীটির জন্যই তার দেবতুল্য দাদা আত্মঘাতী হয়েছে। ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে তার ছোড়দা! কোনদিন সে একথা বিস্মৃত হতে পারবেন না। তীব্র ঘৃণায় ভাসিয়ে দিয়ে যায় তাকে। তার মনে হয় আর কিসের বাধা? এখন তো সে স্বাধীন? ইচ্ছা করলে এদের সঙ্গে সর্ম্পক ছিন্ন করে অন্যত্র থাকতে পারে।

কিন্তু সম্পূর্ণ একা থাকার কথা ভাবলেও খুব ভরসা পায়না যেন। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার যতটুকু পরিচয় তা অফিসের সূত্রে। মেয়েদের কি চোখে দেখে অনেকে তা বুঝেছে এখানে এসে। সকলে নিশ্চয়ই সমান নয়। পারিবারিক অনুভূতি নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় এমন লোক আছে ঠিকই। কিন্তু এর পাশাপাশি এমন অনেক লোক আছে যারা বিচিত্র সব ধারণা

পোষণ করে চাকুরিরতা মেয়েদের সম্পর্কে।

মেয়েরা এদের কাছে শরীরসর্বস্ব জীব। তাদের আসল মূল্য তাদের শরীরে। তারা চাকরি করতে আসে কখনও প্রয়োজন কখনও বা শখের তাগিদে। কিন্তু মনে মনে তারা কৃপাপ্রত্যাশী পুরুষের অনুগ্রহের। পুরুষ যতটুকু কৃপা বিতরণ করবে ততটুকু দিয়েই বিচার হবে তাদের অস্তিত্বের সার্থকতা।

ছেলেরা পরস্পরের সঙ্গে যেসব আলাপ আলোচনা করে তার কিছু টুকরো টুকরো হঠাৎ হঠাৎ কানে এসেছে তার। নিজেদের উদ্ভাবিত বিশেষ সাঙ্কেতিক শব্দ প্রয়োগ করে উল্লেখ করে তারা অনেক মেয়ের। মেয়েদের শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের নামকরণ হয়। এসবের মধ্যে শুধু যে অশ্লীলতা আর রুচিহীনতা আছে তা নয়। একটি মেয়েকে তারা কোন মানদণ্ডে বিচার করে তারও পরিচয় মেলে এসবের মধ্যে।

অবন্তীর মনে আছে একবার একটি ধর্ষণের খবর বেরিয়েছিল কাগজে। জনৈক কিশোর তার পাশের ফ্লাটে বৌদিকে ধর্ষণ করেছিল। পরে যথারীতি খুন হয়েছিল সেই মহিলা। পালাতক হয়েছিল সেই কিশোর।

কয়েকটি ছেলের মধ্যে আলোচনা চলছিল সেটি নিয়ে। একটি ছেলে বলেছিল সুযোগ পেলেও সেও ছেড়ে দেবে না কোন মেয়েকে।

এরমধ্যে অবন্তীও কমজনকে দেখলনা। সুযোগ পেলে মেয়ে নিয়ে স্ফূর্তি করতে অনেকেরই কোন আপত্তি নেই। তবে লোকলজ্জা মানসম্মান ইত্যাদি ব্যাপারগুলো আছে বলে অনেকেরই সেই ইচ্ছা পূরণ হয়না এই মাত্র।

অবন্তী বোঝে সে যদি আলাদা বাসা করে থাকে তাহলে অনেকের চোখেই তার কি অর্থ দাঁড়াবে। তার স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারের ইচ্ছা বলে ঠাওরাবে অনেকেই। সম্ভব হলে সুযোগ নিতে দ্বিধা করবেনা।

এইসব দূরদর্শী চিন্তার কারণেই সে তার ইচ্ছাকে দমিয়ে রেখে ছোড়দা বউদির সঙ্গে এক ছাদের তলায় আছে। কিন্তু ঘর মানুষকে যে শান্তি দেয় তা সে পায়না। তার মনে হয় তারা তিনজন একটি আশ্রয় শিবিরে রয়েছে। এক পরিবারভুক্ত নয় যেন তারা। রান্নাবান্নার কাজ আজকাল আর্চনাই করে। অবন্তী কোন উৎসাহ পায়না ঘরকন্নার কাজে। সারাক্ষণ হুহু করে তার মন। আগের কথা মনে করে নিজেকে নিঃসঙ্গতম দুঃখীতম মানুষ বলে মনে হয়। ছন্ন-ছাড়ার মত মন নিয়ে অফিস ছুটির পর কখনও এই বন্ধুর বাড়ি, কখনও ঐ বন্ধুর বাড়ি করে।

—তুই বিয়ে কর অবন্তী।

অবন্তীও ভাবে বিয়ের কথা। বিয়েতে তার কোনদিন অনিচ্ছাও নেই। সে

মনে করে বিয়ে না করলে মানুষের জীবনে পূর্ণতা আসেনা। সুন্দর স্বাস্থ্যবান স্বামীর সান্নিধ্যে সুখী সংসারজীবন যাপনের কথা সে বরাবরই ভাবে। কিন্তু চোখের সামনে মনোমত তেমন কাউকে পাচ্ছে কই? অনেকবার সে ভাবছে সুধাংশুর কথা। শ্যামলী বলেছিল তার জন্যই অবিবাহিত রয়ে গেছে সুধাংশু।

আবাল্য একটি সুন্দরদর্শন পুরুষকে স্বামী হিসাবে পেতে চেয়েছে সে। সুধাংশুকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে পারেনা কিছুতেই। বিদ্বান, চরিত্রবান সুধাংশু স্বামী হিসাবে অনাকাঙ্খিত হতে পারেনা। তার সান্নিধ্যে স্নেহকোমল আশ্রয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে কি করবে? সুধাংশুর স্থূল শরীর, তার গাত্রবর্ণ, তার অসুন্দর মুখচোখ তাকে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা দেয়।

মায়ের মৃত্যুর পর একদিন এসে তারপর আর আসেনি সুধাংশু। অবন্তী কিন্তু উদগ্রীব হয়ে থেকেছে তার আগমনের জন্য। কিন্তু তাকে বিয়ে করার কথা সে কিছুতেই ভাবতে পারেনা।

এর মধ্যে তার সঙ্গে আলাপ হোল অমিত রায় বলে একটি ছেলের। তাদের ইউনিয়ন থেকে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। যথারীতি বিখাত জনপ্রিয় গায়ক গায়িকারা আমন্ত্রিত হলেন। কিন্তু ইউনিয়ন থেকে ঠিক হোল প্রথমদিকে গান গাইবে কিংবা কবিতা আবৃত্তি করবে অফিসেরই কর্মীরা। এভাবে প্রতিভা অন্বেষণের দায়িত্ব পালন করবে ইউনিয়ন। উদ্বোধন সঙ্গীতের জন্য প্রয়োজন হোল বেশ কয়েকজন ছেলেমেয়ের।

শ্যামলীর গানের গলাও ভাল। গানবাজনার চর্চাও আছে তার। তার সঙ্গে তার বন্ধু অবন্তীকেও অনুরোধ করা হল উদ্বোধন সঙ্গীতে কণ্ঠ মেলাতে। সেই সূত্রে আলাপ হয়ে গেল তার অমিতের সঙ্গে।

অমিতকে ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী বলা চলে না। অবন্তীর মতই একজন সদস্য মাত্র সে। মুখচেনা ছিল বটে কিন্তু আলাপ ছিলনা। কর্মীদের তরফ থেকে সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিচালনার ভার নিল সে। গান বাজনার সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক আছে তার। ডিগ্রী আছে। পাড়ার জলসায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে।

অফিসে আগেও সে সঙ্গীত পরিবেশন করেছে, সঙ্গীত পরিচালনা করেছে। অবন্তীর মত আরও কয়েকজন অংশগ্রহণকারী ছিল যারা গান বাজনা শেখেনি। শুধু তাদের গলা ভাল বলে এবং গানে অনুরাগ আছে বলে নির্বাচিত করা হয়েছিল। গীতিকার ছিল দেবীদাসবসাক নামে একটি ছেলে। সুরকার হিসাবে সুরোপণের ভার পড়েছিল অমিতের ওপর।

বারজন ছেলে মেয়েকে সেই গান শেখাবার দায়িত্বগ্রহণের সূত্রে আলাপ হয়ে

গেল তার অবন্তীর সঙ্গে। কথায় সুরে গানে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল সেই গান। সকলেই খুশি হয়েছিল শুনে। অমিত তার সুরারোপিত একটি গান স্বকণ্ঠে পরিবেশন করেছিল সেই অনুষ্ঠানে। শুনে রীতিমত মুগ্ধ হয়ে গেল অবন্তী।

অমিতের চেহারাটিও রীতিমত সুশ্রী। অবন্তীর ভাল লেগে গেল তাকে। কয়েক দিন অন্যদের সঙ্গে তাকে গানের মহড়া দিতে হয়েছিল। একটু কাছে থেকে অমিতকে দেখবার সুযোগ হোল অবন্তীর। কথাবার্তার ভঙ্গীটিও খুব মনোরম মনে হোল তার। সর্বোপরি অনেকের মত গায়েপড়া ছ্যাবলা নয় সে। মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে যথেষ্টই সংযম ও গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলে।

অমিতেরও যে তাকে ভাল লেগেছে তা বুঝেছিল অবন্তী। কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত না হলে ভরসা হয়না। অনিশ্চয়তার যন্ত্রণার মধ্যে কয়েকটা দিন কাটাবার পর একদিন সুযোগ হয়ে গেল তার।

ফুলেশ্বরে পিকনিকের আয়োজন করা হোল অফিস থেকে। শ্যামলীর পছন্দ নয় এসব। সে সরাসরি জানিয়ে দিল যেতে পারবে না। বন্ধু যাচ্ছে না দেখে প্রথমে দ্বিধা করেছিল অবন্তী। পরে মত পালটাল সে।

তাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে ধমক লাগালেন নিভাদি।

—এসব পাকামী ছাড় তো? বাচ্চ বাচ্চা ছেলেমেয়ে সব। এখন কোথায় উৎসাহে টগবগ করবে তা না হাড়িমুখ করে বুড়ো সেজে বসে আছ। যে বয়সের যা। আমি বলছি অত কিন্তু কিন্তু করার কিছু নেই। যাও সবার সঙ্গে একটা দিন হৈহৈ করে এস। মনটা তাজা থাকবে।

অবন্তী ভাবল সত্যিই তো! বাড়ীতে তার কিই বা আকর্ষণ আছে? একমাত্র আকর্ষণ ছিল মা। তিনিও চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল দিদির কথা। দুঃখে ভরে গেল তার মন। দিদির কথা মাঝে মাঝেই ভুলে যায় সে স্বার্থপরের মত। বাড়ীতে কাছে কাছে থাকলে সেটা হোতনা। তার সব বন্ধন চলে গেছে কোথায়? দিদির দায়িত্ব তো চলে যায়নি?

নানা কারণে দিদিকে দেখে আসতে পারেনি সে অনেকদিন। মায়ের মৃত্যুসংবাদ অবশ্য ইচ্ছা করেই দেওয়া হয়নি। দিদির পক্ষে সেটা ক্ষতি করই হতো। তবু দিদির খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। বাবা মা কিংবা দাদা বেঁচে থাকলেও এভাবে চিন্তা করতে হোতনা তাকে। কিন্তু ভাগ্য তাকে সবদিক দিয়েই যেন বেঁধে মারছে।

অবন্তী ভেবে দেখল আনন্দ উৎসব বর্জন করার অর্থ হয়না। তাকেও বেঁচে থাকতে হবে। আনন্দ বাদ দিয়ে উৎসব বাদ দিয়ে একঘেয়ে জীবন কতদিন বইবে

সে? পরিশেষে অমিতের কথা ভাবল। অমিতও যাচ্ছে তাদের সঙ্গে। তার গান শোনা যাবে। তার সঙ্গে অফিসের বাইরেও কিছু কথা বলা যাবে। দিনটা ভালো কাটবে।

যে জীপে করে অবন্তীরা গিয়েছিল সেই জীপে অমিতও ছিল। এটা সেটা অনেক কথা হলো। ফুলেশ্বরে গিয়ে গান হলো, হাসি তামাসা হোল। অফিসাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল। তবে সুধাংশু সঙ্গে ছিলনা। যারা ছিল তারা অন্তরায় হলোনা আনন্দ স্ফূর্তির। সমস্ত দিনটা চমৎকার কাটল সেখানে।

ফেরার পথে আবার গান ধরল অমিত জিপে বসে। সেই গান শুনতে শুনতে অবন্তীর বুকের মধ্যে একটা মাদকতাময় সুখ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তার মনে হোল সঙ্গে তার জীবন জড়াতে পারলে সে সুখীই হবে।

পরবর্তীকালে যথারীতি ঘটতে লাগল সব ঘটনা। ছুটির পর অনেক দিনই একসঙ্গে দেখা যেতে লাগল তাদের। দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল তারা। অমিতদের বাড়ির অবস্থা খুব ভাল। দুই ভায়ের মধ্যে সে বড়। তাদের বিশাল পৈত্রিক বাড়ি গড়িয়াহাটায়। জবরদস্ত ব্যবসায়ী তার বাবা। নিজস্ব বাড়ি আছে তাদের।

অবন্তীকে তার বাড়ি নিয়ে গেল একদিন অমিত। আলাপ করিয়ে দিল বাড়ির সকলের সাঙ্গে। অবন্তীর অনুপম চেহারা দেখে তার কথাবর্তা শুনে খুশি হোল সকলে। অমিতের মায়ের চেহারা খুবই সাধারণ। ছেলের পছন্দ দেখে অবন্তীকে মনোনীত করে ফেললেন তিনি বাড়ির বউ হিসাবে। যথাসময়ে অমিতের কাছে অবন্তী সেরকম আভাস পেয়ে গেল। বাকি শুধু অবন্তীদের বাড়ি গিয়ে কথা পাড়া।

অবন্তী চেয়েছিল রেজিস্ট্রি বিয়ে। কিন্তু অমিতের তাতে মত নেই। সে বাড়ির বড় ছেলে। তার বাবা মায়ের সখ আহ্লাদ আছে। তাদের একটা মানমর্যাদা আছে। এরকম বিয়েতে রাজি হবে কেন তারা? সুখের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে 'মানমর্যাদা' কথাটা খট করে লাগল যেন অবন্তীর কানে।

সে ভাবল এরকম কথা বলছে কেন অমিত? অবন্তীদের পরিবার সম্পর্কে তবে কি সে কোনরকম অশ্রদ্ধা পোষণ করে? অবশ্য অমিতের পরবর্তী আচরণে তার সেই সংশয় দূর হোল আবার। তার মনে হোল সত্যিই তো অমিত তো কোন অন্যায় কথা বলেছেনা? তার বাবা মা বেঁচে থাকলে কি রাজী হতেন রেজিস্ট্রি বিয়েতে?

অতঃপর দুজনে মিলে ঠিক করল অবন্তী প্রথমে তার ছোড়দাকে জানাবে অমিতের কথা। পরে অমিত তার ছোড়দার কাছে এসে তাকে বিয়ে করার বাসনা ব্যক্ত করবে। পরে অবন্তীর ছোড়দা অমিতদের বাড়ি এসে তার বাবা

মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাড়বে। বলাবাহুল্য আসল মনোনয়ন তো হয়েই গেছে। শুধু নিয়মমাফিক করার জন্যেই এসবের পারম্পর্য লক্ষ্য করা।

সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে পরপর দুদিনের দুটি ঘটনায় অবন্তীর মন কেমন যেন বেসুরো বাজতে লাগল। প্রথমদিন অমিতের মা গাড়ি পাঠিয়েছিলেন অবন্তীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শাড়ি পছন্দ করে কিনবে সে। অমিত নিজে ট্রামে বাসে করেই অফিসে আসে। তাদের গাড়ি ব্যবহার করেন বেশির ভাগ সময়েই তার বাবা। মাঝে মধ্যে প্রয়োজনে মাও অবশ্য গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন। এখন অবন্তীর দৌলতে মাঝে মাঝেই গাড়িটা পাচ্ছে সে।

অমিতের সঙ্গে গাড়িতে উঠতেই অবন্তীর চোখে পড়ল সুধাংশু এগিয়ে যাচ্ছে বাস স্টপের দিকে। কেমন ক্লান্ত মন্থর গতিতে হাঁটছে যেন সে। এক ঝলক দেখে অবন্তীর মনে হোল গায়ের মেদ যেন কিছুটা ঝরেছে সুধাংশুর। হঠাৎ এক বিচিত্র মায়া বোধ করল সে সুধাংশুর জন্য। ভাবল পথেই তো পড়বে ওর বাড়ি? তাকে যদি একদিন লিফ্‌ট দেওয়া যায় ক্ষতি কি? দেখে মনে হচ্ছে শরীর ভাল যাচ্ছে না।

অমিতকে বলতে আপত্তি জানাল সে।

—না না এসব বাড়াবাড়ি করোনা। সুধাংশু বোস বড় অফিসার। তাকে আবার এত হরিভজা কেন?

অবাক হয়ে গেল অবন্তী।

—কেন কি হয়েছে? অফিসার হওয়াটা কি দোষের?

বিরক্ত হলো অমিত।

—তা বলছি না। কিন্তু এটা ভাল দেখায়না। লোকে এ নিয়ে নানা কথা বলবে।

অবন্তী তাকে বোঝাল।

—ভদ্রলোক সত্যিকাবেব ভালমানুষ। ওর সঙ্গে কি সকলের তুলনা হয়?

অমিত গোপন করেনা তার অপ্রসন্নতা।

—অফিসের লোকজনদের সঙ্গে আদিখ্যেতা ভাল লাগেনা আমার অবন্তী। আমি চাইনা বিয়ের পরও অফিসের লোকজনদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি কর।

হতবাক হয়ে যাচ্ছিল অবন্তী অমিতের কথা শুনে। তার স্বভাবের এই দিকটা মনে হয়নি একটুও। অফিসের লোকজনের প্রতি তার এই বিরূপতা তো কই চোখে পড়েনি আগে?

অবন্তী ভাবল তাহলে কি অমিতের এই আপত্তি তার বেলাতেই? অমিত কি চায়না তার বউ অপরের সাথে কথা বলে কিংবা মেলামেশা করে? ভবিষ্যতে

এসব আপত্তি কোথায় নিয়ে যাবে তাকে? শেষে তার চাকরি করাও অপছন্দের চোখে দেখবে নাতো অমিত? অবন্তীর মনটা খারাপ হয়ে গেল।

পরের দিনের ঘটনাও অনুরূপ। অবন্তী তখন কাজ করছিল। সুধাংশু তার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে হাসল। ইচ্ছা করেই কথা বলে অবন্তী। সুধাংশু অনেক রোগা হয়ে গেছে। মাঝখানে কিছুদিন সুধাংশুকে লক্ষ্য করে দেখেনি সে। সুধাংশু তাকে কিছু বলেনি। সে কিছুই জানে না। তবু হঠাৎ কেমন একটা কষ্ট বোধ করল সে সুধাংশুর জন্য।

সুধাংশুর নিরানন্দ নিস্তেজ মুখচোখ দেখে কেমন যেন সংশয় জাগে মনে। তার সঙ্গে অমিতের ঘনিষ্ঠতা দেখে কষ্ট পাচ্ছে নাতো সুধাংশু? সে নিজে সুখী হতে চলেছে। পরিচিত কাউকে এখন চোখের সামনে দুঃখী দেখতে চায়না।

—আপনার কি শরীর খারাপ?

—না তো!

একটু যেন চমকে গেল সুধাংশু অবন্তীর প্রশ্ন শুনে।

—তাহলে এমন দেখাচ্ছে কেন আপনাকে?

—কেমন দেখাচ্ছে?

সুধাংশুর গম্ভীর মুখে লজ্জিত হাসিটি অবন্তীর চোখে খুব সুন্দর লাগল। আগেও সে লক্ষ্য করেছে সুধাংশুর হাসিটি তার চেহারাছাড়া। অসুন্দর নাক মুখ চোখের পরিসরে এমন একটি ভুবনমোহন হাসি কি করে ফুটে ওঠে ভেবে পায়না সে।

—মনে হচ্ছে শরীর ভাল যাচ্ছেনা?

—আপনার মনে হচ্ছে একথা?

ঈষৎ উৎফুল্ল শোনাল সুধাংশুর গলা। কি জবাব দেবে ভেবে পেলনা অবন্তী। সে চুপ করে রইল। সুধাংশু আর কথা বাড়ালনা। যাবার জন্য পা বাড়িয়ে পরক্ষণে মুখ ফিরিয়ে অভিনন্দন জানাল।

—আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সুখবর কানে এসেছে আমার। অবন্তী বলল—'ধন্যবাদ'।

সুধাংশু কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে রইল। তাকে দেখে মনে হোল কিছু একটা বলতে চাইছে। কেন জানি অবন্তীর মনে হোল অমিত সর্ম্পকে কিছু বলবে সে। পট্টনায়কের প্রতি সুধাংশুর বিরূপতা লক্ষ্য করেছে সে বহুদিন। অমিতকেও কি সহ্য করতে পারছেনা সে?

মনে মনে শক্ত হয়ে উঠল অবন্তী। তার সম্পর্কে সুধাংশুর এই অধিকারবোধের উৎস কি? কবে একদিন তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তাদের

বাড়ি এসেছিলেন তার মামা। নাকচ হয়ে গিয়েছিল সেই প্রস্তাব। পরে এখানে এসে নানা কারণে ঘনীভূত হয়েছে তাদের পরিচয়। কিন্তু তাহলে সীমারেখা মানবেনা সে? অবন্তী কি বাধ্য তাকে বাধিত করতে?

মনে মনে প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়ে প্রশ্ন করে সে।

—আপনি কি কিছু বলবেন?

কেমন একটা আচ্ছন্ন বেদনার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকাল সুধাংশু তার দিকে। এই দৃষ্টির সঙ্গে এর আগেও পরিচয় হয়েছে অবন্তীর। তার অস্বস্তি হতে থাকে। সুধাংশুর বেদনা যেন তাকে স্পর্শ করে যায়। সুধাংশু বলল—'একটা কথা বলছি। কিছু মনে করবেন না। যা করবেন ভেবেচিন্তে করবেন। আপনি খুব ছেলেমানুষ। ঝোঁকের মাথায় জীবনের কোন বড় সিদ্ধান্ত নেবেননা।

মনে মনে রুষ্ট হল অবন্তী। তবু স্পষ্ট করে শুনতে চাইল সে।

—অমিত সম্পর্কে আপনি কি কিছু বলতে চাইছেন?

দারুণ অপ্রস্তুত হোল সুধাংশু। জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে—'না না আপনি ভুল বুঝছেন। অমিত ভাল ছেলে। ওর সম্পর্কে কোনদিন খারাপ কিছু শুনিনি। কিন্তু জীবনসঙ্গী নির্বাচনের জন্য মানুষকে ভেবে দেখতে হয় অনেক কিছু।

অবন্তীর মনে পড়ে গেল গতকাল সন্ধ্যার ঘটনা। এখনও তার মনে খচখচ করছে সেটা। কিন্তু সুধাংশুকে বলা যায়না সেকথা।

খানিকটা জেদের সঙ্গেই জবাব দিল অবন্তী।

—আমার কোন অসুবিধা হবেনা বলেই মনে করি।

—তাহলে তো ভালই।

আর দাঁড়ালনা সুধাংশু। দ্রুত সেই প্রসঙ্গে ইতি টেনে চলে গেল অন্যত্র। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো অমিত। তার মুখের বিরক্তি চোখ এড়ালনা অবন্তীর।

—সুধাংশু বোসের সঙ্গে এত ঘনিষ্টতা হলো কি করে তোমার অবন্তী? উনি অফিসার মানুষ। ওর সঙ্গে এত কথা বলার দরকারই বা কি?

অবন্তীও বিরক্ত হলো কম না।

—কেন কি হয়েছে তাতে? ভদ্রলোক খুব ভালো লোক।

অধৈর্য প্রকাশ করে অমিত।

—কথাটা অনেকবার শুনেছি তোমার কাছে। লোক ভাল কি খারাপ তা নিয়ে কথা হচ্ছেনা। আমি বলছি দরকার কি এসবের? লোকে ছেড়ে কথা কয়না জানই তো! পট্টনায়কের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতার কথা অনেকেই জানে। তাদের কেউ কেউ একথাও বলেছে মাঝখানে তুমি সুধাংশু বোসের দিকে ঝুঁকেছিলে।

—কি বললে? তোমার লজ্জা করলনা আমাকে এসব বলতে?

তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠল অবন্তী।

—আস্তে। তুমি ভাল করেই জান কথাগুলো মিথ্যে নয়। কিন্তু আমি মেনে নিয়েছি। বিয়ের আগে এরকম একটু আধটু হয়। তা নিয়ে রাগ করলে চলে না। কিন্তু এখন আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক। এখন অন্ততঃ নিজেকে শুধরে নেওয়া উচিত তোমার।

স্তম্ভিত হয়ে গেল অবন্তী। এতদূর? এখনও বিয়ে হয়নি তাদের। এরমধ্যে এত অধিকারবোধ জন্মে গেছে অমিতের? এরপর কি উঠতে বসতে তাকে লগুড়াঘাত করবেনা?

অবন্তী জানতনা অমিত তাকে এরকম চোখে দেখে। তার চরিত্র সম্পর্কে অমিত কেমন ধারণা পোষণ করে তা আজ প্রথম বুঝতে পারল সে। অবন্তী ভেবে পাচ্ছিলনা তাকে স্খলিতচরিত্রের মেয়ে ভেবেও কেন তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়েছিল অমিত? সে কি তার সৌন্দর্য আছে বলে? কিন্তু অবন্তী এখন কি করে? সে যে মনের দিক থেকে অনেকখানি এগিয়েছে।

অফিসেও জানাজানি হয়ে গেছে। কিন্তু যেরকম খবরদারী শুরু করেছে অমিত তাতে ভবিষ্যতের কথা ভাবলে রীতিমত দুশ্চিন্তা হয়। আগের ঘটনা এখন মনে পড়ে যায় তার। বুঝতে পারে সেগুলিকে যথার্থ গুরুত্ব দেয়নি সে তখন। অমিতের মানসিক চেহারা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে যেতে এখন সেগুলি অর্থবহ হয়ে ওঠে তার কাছে।

একদিন বাসে করে যাবার সময় একটি ছেলেকে অবন্তীর দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিরক্ত হয়েছিল অমিত। অনেক আগেই নেমে পড়েছিল বাস থেকে। লাল সিল্কের শাড়ী পরেছিল সেদিন অবন্তী। বাসে অনেকেরই মুগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করেছিল সে। কিন্তু সেই ছেলেটি ফিরে ফিরে বারবার তাকাচ্ছিল তার দিকে। কিছুতেই তার দিক থেকে সরিয়ে নিতে পারছিল না তার দুই মুগ্ধ চোখ।

অমিত সহ্য করতে পারছিলনা সেটা। অবন্তীর ওপর নিজের অধিকার দেখাতে চেয়েছিল সে ছেলেটির কাছে। বাসের অন্য সকলের কাছে। নির্দিষ্ট স্টপ আসার আগেই অবন্তীর হাত ধরে টেনেছিল সে।

—ওঠ এখানে নামব।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল তখন অবন্তী।

—এখানে নামব কেন?

জেদী গলায় জোর দেখিয়ে জবাব দিয়েছিল অমিত।

—দরকার আছে।

আর আপত্তি না করে নেমে পড়েছিল অবন্তী সঙ্গে সঙ্গে। বাস থেকে নেমে বিরক্তিতে ফেটে পড়েছিল অমিত।

—অসভ্যের মত তাকাচ্ছিল ছেলেটা তোমার দিকে।

পরিস্থিতি হালকা করতে চেয়েছিল অবন্তী রসিকতা করে।

—ওর সুন্দর লাগছিল আমাকে। তাই দেখছিল। শুধু তো দেখছিল। তাতে অত লাগছিল কেন তোমার?

রসিকতা ফিরিয়ে দেয়নি অমিত। বিরক্ত চোখে অবন্তীর দিকে তাকিয়ে প্রকাশ করেছিল তার উষ্মা।

—অতই যদি উপভোগ করেছিলে তাহলে না নামতেই পারতে। পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে দেখে কথা ঘুরিয়ে নিয়েছিল অবন্তী। সেদিন অবন্তী সেটা অমিতের সাময়িক একটা অনুভূতির ব্যাপার বলে ভেবেছিল। এখন তার মনে হচ্ছে অমিতের এটা স্থায়ী মানসিক কোন অসুবিধার ব্যাপার। মনে পড়ল সেই মুহূর্তে অমিতের চোখে মুগ্ধতা ছিল না। অদ্ভুত এক বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তার শরীর জরীপ করছিল অমিত। সে যেন সহ্য করতে পারছিলনা অবন্তীর সৌন্দর্য। লাল শাড়ীতে আগুনে জ্বলে ওঠা অবন্তীর শরীর দেখে তার চোখে ফুটে উঠেছিল হিংস্র এক বিদ্বেষ।

চোখের সামনে সব কিছু যেন অন্ধকার দেখতে লাগল অবন্তী। সীমাহীন অসহায়তার অনুভূতি নিয়ে প্রায় আর্তনাদের সুরেই জানতে চাইল সে অমিতের বক্তব্যটুকু।

—কি শুধরে নেব?

সরাসরি তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঘুরিয়ে তার বক্তব্য ব্যক্ত করে অমিত।

—আমার মনে হয় অবন্তী তোমাকে স্পষ্ট করে কয়েকটা কথা বলা দরকার। আমি চাই আমার যে স্ত্রী হবে তার কাছে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য থাকবে। বাইরের পুরুষদের সঙ্গে আমার স্ত্রী মেলামেশা করে এ আমি চাইনা। সত্যি কথা বলতে কি চাকরি করাও পছন্দ নয় আমার।

—কি বলছ তুমি? এতদিন তো এসব শুনিনি? চাকরি ছাড়ার প্রশ্নই ওঠেনা। আমার দিদির কথা তোমায় বলেছি। তুমি জান ছোড়দাদের ওপর ভরসা নেই আমার। চাকরি ছাড়লে দিদির কি হবে? বিরক্তি গোপন করেনা অবন্তী।

—আমিও তো এতদিন শুনিনি বিয়ের পর তোমার দিদির ভার থাকবে তোমার ওপর? যাকে বিয়ে করব তার দায়িত্ব নিশ্চয় আমার। কিন্তু তার বাড়ির

লোকের দায়িত্ব বহনের প্রশ্নই ওঠেনা। না অবন্তী। অতখানি উদারতা দেখাতে পারবনা আমি।

বজ্রাহত হয়ে গেল অবন্তী। অমিতের অভিযোগ পুরো সত্য নয়। একাধিকবার বাড়ির প্রসঙ্গ উঠলে সে তার দিদির কথা বলেছে। তার পারিবারিক অসহায়তার কথা এতটুকু গোপন করেনি। তার ছোড়দা বা বউদির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভাল করেই জানে অমিত।

কিন্তু অমিতকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ তার নিজের। নিজের অসহায়তার পুরো ছবিটা চোখের সামনে মেলে দিয়েছে সে। সুযোগ নেবেনা কেন অমিত?

অবন্তী শক্ত হলো।

—আমি সত্যিই লোক চিনিনা। তাই হীরে ফেলে কাঁচ কুড়িয়ে নিই বারবার। কিন্তু তোমাকে উদারতা দেখাতে হবেনা। আর আমার দায়ও বইতে হবেনা তোমাকে।

কথাটা বলে চলে যাচ্ছিল অবন্তী। অমিতই পথরোধ করে।

—তার মানে? কোন হীরে দেখলে চোখের সামনে? সুধাংশু বোস না অন্য কেউ?

সুধাংশুর সঙ্গে তুলনার কথা মাথায়ই আসেনি অবন্তীর। লোকচরিত্র সম্বন্ধে নিজের অনভিজ্ঞতার কথাই চলিত প্রবাদ বাক্যটির সাহায্যে বলতে চেয়েছিল সে। অমিতের কথা শুনেই বুকে ধাক্কা লাগে যেন। কথাটা কি সে নিজে বলল না অন্য কেউ বলল তার মুখ দিয়ে?

আর কথা বাড়ালনা অবন্তী। প্রসঙ্গে ইতি টানল সে ছোট্ট করে।

—আমার জন্য অপেক্ষা করোনা। গাড়ি আসলে চলে যেও। আবার সেই একই প্রশ্ন করে অমিত।

—তার মানে? তুমি জাননা আজ মা আসবেন? তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে যাবেন? তুমি না গেলে চলবে কি করে?

ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায় সব কিছু উড়িয়ে দিল অবন্তী।

—মানে খুব পরিষ্কার। তোমাদের সঙ্গে মানিয়ে চলা সম্ভব হবেনা আমার। মাসিমাকে বলে দিও তুমি। আমার শরীর ভাল লাগছেনা। বাড়ি চলে যাচ্ছি।

অমিতের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে দ্রুত নীচে নেমে এল অবন্তী। মুখে অমিতকে সে যাই বলুক ভেতরে ভেতরে ভাঙ্গচুরের অসহ্য এক কষ্ট টের পাচ্ছিল। লজ্জা, অপমান, দুঃখ সব যেন তালগোল পাকিয়ে তার গলার কাছে এসে ঠেলে বেরোতে চাইছিল।

অমিতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা এখনও ভাবতে পারছেনা সে। কিন্তু তার সম্পর্কে অমিতের মনোভাব জানার পর সেই সম্পর্ক টিকিয়েই বা রাখে কি করে? তবু তার অবুঝ মন প্রত্যাশা ছাড়ছিলনা। সে ভাবছিল অমিত অনুতপ্ত হয়ে নিশ্চয় ক্ষমা চাইবে তার কাছে। বলবে—'আমি অন্যায়ভাবে আঘাত দিয়েছি তোমায়। আমাকে ক্ষমা করে দাও অবন্তী।'

কিন্তু পরপর কয়েকদিন কেটে গেল। তার প্রত্যাশা পূরণের কোন সম্ভাবনাই দেখা গেলনা। অমিত এগিয়ে এলোনা সন্ধি করতে। গম্ভীর মুখে এড়িয়ে গেল সে অবন্তীকে। অবন্তী ভেবেছিল অমিতের বাড়ির লোক অন্ততঃ এগিয়ে আসবে। তাদের কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছিল। অমিতের বাবা মা সাগ্রহে মনোনীত করেছিলেন তাকে। তারা নিশ্চয় চাইবেননা এভাবে হঠাৎ সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়।

ঐ অপ্রীতিকর ঘটনার সপ্তাহখানিক পর একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তার অমিতের মায়ের সঙ্গে। শ্যামলীর সঙ্গে নিউ মার্কেটে গিয়েছিল সে। শ্যামলীরই কিছু কেনাকাটা ছিল। ভদ্রমহিলা কেনাকাটা সেরে যখন বেরিয়ে আসছিলেন দোকান থেকে তখন শ্যামলীরা সেখানে ঢুকেছিল। আরেকজন মহিলা সঙ্গে ছিলেন। একজন পরিচিত লোককে দেখে মানুষ যে সাধারণ সৌজন্যমূলক হাসি হাসে বা কুশল প্রশ্ন করে তা করার প্রয়োজনও বোধ করলেননা তিনি।

অবন্তী লক্ষ্য করল ইচ্ছাকৃতভাবে অবন্তীকে অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে গেলেন দোকান থেকে। তার সঙ্গে পূর্বপরিচয়ের বন্ধনটুকুও স্বীকার করলেন না। দোকান থেকে বেরিয়ে শ্যামলী মন্তব্য করল—'আশ্চর্য। একজন ভদ্রমহিলা এরকম আচরণ করতে পারেন? বিয়ের কথা বাদ দিলেও আগের পরিচয়টা তো আর মিথ্যা নয়? ওর কি উচিত ছিল না একটু হাসা? একটা দুটো কথা বলা?'

অবন্তীর ভাল লাগছিলনা এসব আলোচনা। তার মনের মধ্যে যে ক্ষীণ আশাটুকু বাঁচিয়ে রেখেছিল সে তা যেন দপ করে নিভে গেল আজকের ঘটনায়। এই কয়দিন মোটামুটি নিজের মধ্যে বহন করেছে সে তার দুঃখ। অফিসে অনেকেই তাকে প্রশ্ন করেছে। সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে সে তার জবাবে। কিন্তু নিজেকে সে এড়িয়ে যাবে কি করে? অবন্তী ভাবছিল লোকে বলে সৌন্দর্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ কিন্তু তার সৌন্দর্য খালি অভিশাপই নিয়ে এসেছে।

তার আর মুখ দেখাবারও উপায় রইলনা। অতঃপর তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে অফিসের লোকেরা নিজেদের মধ্যে মাত্রাছাড়া, লাগাম ছাড়া অসভ্য রসিকতায় মেতে উঠবে।

তার মনে হচ্ছিল কি লাভ এভাবে বেঁচে থেকে? বাবা নেই, মা নেই। দিদি

উন্মাদাশ্রমে। তার বাড়িতে শান্তি নেই। শেষে সেও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাবে না তো?

তার অফিসে এরকম লোকের তো এমনিতেই অভাব নেই। সেও তাদের দলভারী করবে না তো? ভীষণ ভয় করতে লাগল অবন্তীর। মনে হোল শিগগিরই কিছু করা দরকার। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই। তা না হলে সে সুস্থ থাকতে পারবে না। কিন্তু কি করবে সে? কি করতে পারে সে? তার আছে কে? কে তাকে রক্ষা করবে?

পনের

মাঝখানে অনেকদিন দিদির সঙ্গে দেখা হয়নি অবন্তীর। হঠাৎ তার মনে হোল দিদিকে দেখে আশা উচিত। মনে হওয়া মাত্র সরকারপুলে চলে গেল সে। ডাক্তার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আশা দিলেন শিগগীরই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে অরুন্ধতী মিত্র। সে এখন অনেক স্বাভাবিক। দিদিকে দেখে দিদির সঙ্গে কথা বলে অবন্তীরও সেরকম ধারণাই হোল। বাড়ির কথা বলতে খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল তার দিদি।

—কতদিন যাইনি বাড়ি। সকলে ভাল আছে তো?

ইচ্ছে করেই দিদিকে খারাপ খবরটা দিলনা অবন্তী। বলা যায়না কি ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনে হোল একটি সম্ভাবনার কথা এমনও তো হতে পারে দিদি সুস্থ হয়ে উঠল, আর সে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল?

ছোড়দার সঙ্গে ছোট বউদির সম্পর্ক ক্রমশঃ ঢিলে হয়ে আসছিল। খুব কম সময় বাড়িতে থাকত আজকাল তার ছোড়দা। বউদির সঙ্গে বেড়াতে যেতেও দেখতনা তাকে।

কিন্তু অবন্তী বুঝত যে ছোড়দা তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। সুযোগ দিলেই সম্ভব হতো সেটা। কিন্তু দাদা মারা যাওয়ার পর সে সম্পর্কে পুরোপুরি চিড় ধরেছিল তা কি করে জোড়া দেয় সে? মা মারা যাওয়ার পর ছোড়দা চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অবন্তীই পারেনি। এখনও তাদের মধ্যে সরাসরি বাক্যালাপ নেই।

ছোড়দার সম্পর্কে অবন্তীর মনে এখন মিশ্র অনুভূতি কাজ করে। দাদার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আর বৌদির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তীব্র ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক করুণার অনুভূতি। অবন্তী বুঝতে পারে তার ছোড়দাও এখন খুব নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। হয়ত এক হিসাবে তার নিঃসঙ্গতা আরও অতলস্পর্শী। কারণ নিজের মধ্যেই নিজের জন্য আশ্রয়টুকু হারিয়ে

ফেলেছে সে। তার অনুতপ্ত বিবেক এখন লেলিহান অগ্নিদাহের তেজে জ্বলে উঠেছে। ছাই হয়ে গেছে তার সুখ শান্তি আনন্দ।

এসব নিয়ে যখনি ভাবে তখনি তার রাগ গিয়ে পড়ে অর্চনার ওপর। মনে হয় ঐ অলুক্ষণে স্ত্রীলোকটি না এলে তাদের সংসারে এত অশান্তি আসতনা।

এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে এক বাড়িতে এক ছাদের তলায় যে সে আছে সেটা ভাবলেও বিতৃষ্ণা বোধ করে। মাঝে মাঝে মনে হয় কেন সে পড়ে আছে সেখানে? কিসের সুখে? এরা তার কে? কিন্তু কোথায় যাবে সে? আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে অনেকদিন ধরেই তাদের সম্পর্ক ঢিলে পড়ে গেছে। এখন কোন ছুতোয় সেই সম্পর্ক মজবুত করতে যাবে? বাড়ি ভাড়া করে একা থাকার কথাও ভাবতে পারেনা।

অফিসেও ভালো লাগেনা আজকাল। সে বোঝে তাকে নিয়ে আলোচনা। করে সকলে ফিসফিস করে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। সবচেয়ে খারাপ লাগে তার পট্টনায়ককে দেখলে। অদ্ভুত ধৃষ্টতা নিয়ে তাকায় সে তার দিকে। যেভাবে সে আপাদমস্তক লক্ষ করে অবন্তীকে তাতে মনে হয় অবন্তী যেন এক সস্তা রদ্দি মাল। অনেকেরই আচরণেই টের পাওয়া গেছে সেই অশ্রদ্ধা।

নীরবে হজম করে অবন্তী সেই জ্বালা। তার মনে হয় যদি মুখ ফুটে তাকে কিছু বলত ওরা তাহলেও বুঝি ভাল হতো। তাদের জবাব দেওয়া যেত। আজকাল সুধাংশু বোসও গাম্ভীর্য নিয়ে থাকে। কাজের বাইরে একটিও বাড়তি কথা বলেনা। এই জিনিসটাও খুব পীড়া দেয় তাকে। সুধাংশুকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অবন্তীই তাকে পাত্তা দেয়নি। তারও তো মান মর্যাদা আছে।

তবু অবন্তীর মনে হয় সুধাংশু আবার যদি আগের মত সহজ সম্পর্ক বজায় রেখে তার সঙ্গে একটু কথাটথা বলত তাহলেও বুঝি হাল্কা হতো তার মন। শ্যামলীও যেন দূরে সরে গেছে। অবন্তী বোঝে তার এই দুর্ভাগ্যের জন্য মনে মনে তাকে কিছুটা দায়ী করে সে। মাঝে মাঝে দু'একটি মন্তব্য শুনে বুঝতে পারে সেটা।

আজকাল অবন্তীর প্রায়ই মনে হয় দাদার কথামত যদি সে বিয়ে করত তাহলে ভালই হতো। এভাবে বদনাম কুড়োতে হোতনা।

এর মধ্যে একদিন একটা সাংঘাতিক অভব্য মন্তব্য কানে গেল অবন্তীর। অর্থপূর্ণ সেই কুৎসিত মন্তব্যটি কাকে উদ্দেশ্য করে তা বুঝতে দেরি হোল না তার বা শ্যামলীর কারুরই। চারতলা থেকে তিনতলা নামছিল তারা দুজনে। তাদের ঠিক পেছনে ছিল জনা চারেক ছেলে। ছেলেগুলি তাদের সেকশানের

নয়। তবে তাদের দু'একজনের সঙ্গে মুখচেনামত আছে।

একটি ছেলে জোরে জোরে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল—'পোকা খাওয়া ফল খেতে মিষ্টি না রে?'

আরেকজন হিহি করে হেসে বলল—'কেন তুই খাবি?'

যে ছেলেটি প্রথমে ঐ মন্তব্য করেছিল সে বলল—'তা দোষ কি? তুইও খেতে পারিস। কোন অসুবিধে নেই।'

শ্যামলীর মুখ রক্তাভ হয়ে উঠল। অবন্তীর দিকে ফিরে শক্ত গলায় বলল—'আপদের দল! ঘেন্না হয় এদের কথা শুনলে। চল তাড়াতাড়ি নামি।'

কিন্তু তারা নেমে যাওয়ার আগেই চিৎকার করে তাদের শুনিয়ে চুকচুক আওয়াজ করে ছেলেরা—'আহারে!' বললেই যত দোষ।'

সেই ঘটনার পর শ্যামলীর যেন কিছুটা বিরক্তি অবন্তীর প্রতি। কিন্তু মিসেস চন্দদের সহানুভূতি ভরা দৃষ্টি তার সবচেয়ে খারাপ লাগে। গায়ে যেন জলবিছুটির ছোঁয়া লাগে। সকলেই কিন্তু একরকম নয়। অনেকের ব্যবহারেই কোন ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

তবু হাঁপিয়ে ওঠে অবন্তী। তার মনে হয় শত্রুপুরীতে রয়েছে সে। প্রথম যখন সে এখানে কাজে যোগ দিয়েছিল তখনকার কথা মনে পড়ে যায়। একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিল তার মন। একটি মিনি ভারতবর্ষকে দেখতে পেয়েছিল তার অফিসের চৌহদ্দিতে। পরে অনেক বিচিত্র সান্নিধ্যে এসে মনে হয়েছিল মানবচরিত্রের অতল সমুদ্রে ডুব দিয়ে চলেছে। এখন তার মনে হয় অন্য কথা। মনে হয় দেশকালের ব্যবধান কোন কথা নয়। নিষ্ঠুরতায় মানবচরিত্রের অতল সমুদ্রে ডুব দিয়ে চলেছে। এখন তার মনে হয় অন্য কথা। মনে হয় দেশকালের ব্যবধান কোন কথা নয়। নিষ্ঠুরতায়, ঈর্ষায়, পরশ্রীকাতরতায় বুঝি কোন হেবফের নেই।

এরমধ্যে একদিন রজব আলীর কথাটা খুব ভাল লাগল তার। এই অপ্রকৃতিস্থ লোকটি যে এরকম বিবেচকের মত কথা বলতে পারে তা যেন কল্পনাতীত তার কাছে। সেদিনও যথারীতি অন্য দিনের মত গম্ভীরভাবে কাজ সারছিল অবন্তী। নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়াল রজব আলী। মনে মনে বিরক্ত হয়েই মুখ তুলে তাকাল অবন্তী।

অপরাধীর ভঙ্গীতে অল্প একটু হেসে রজব আলী বলে—'গুস্তাকি মাফ করবেন মিস মিত্র। আপনার তবিয়ৎ কি ঠিক নেই? বড় যেন দুবলি দেখাচ্ছে?'

অবন্তী ভেবে পেলনা কি জবাব দেবে। চুপচাপ থেকে তাই একটু হাসল।

একটু যেন সাহস পেল রজব আলী।

—নানা সচ বলছি। আপনি ছুটি নিয়ে নিন। কদিন আরাম করলে ঠিক হয়ে যাবে তবিয়ৎ।

রজব আলী চলে যাওয়ার পর কথাটা নিয়ে ভাবল অবন্তী। বাড়িতে শান্তি না থাকুক। তবু সে নিজের মত বইপত্র পড়ে কিংবা ট্রানজিস্টার চালিয়ে গান শুনে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে পারবে। তার উত্তপ্ত স্নায়ু কিছুটা শীতল হতে পারে।

ছুটির সময় শ্যামলীর সঙ্গে আলোচনা করল সে। সব শুনে ও কম অবাক হলোনা।

—আশ্চর্য! লোকটা কাজকর্ম করেন না। চুপচাপ বসে থাকে টেবিলে। সকলেই জানে ও স্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই লোক তোর কাছে নিজের থেকে এসে এসব উপদেশ দিয়ে গেল? তার মানে লোকটাকে যেরকম ভাবি আমরাও ঠিক সেরকম না?

অপ্রয়োজন বোধে সেকথার কোন জবাব দিলনা অবন্তী। শুধু বলল 'তুই কি বলিস শ্যামলী? নিয়ে নেব একমাসের ছুটি?' শ্যামলী দেখা গেল একমত সে ব্যাপারে।

আমিও বলব ভাবছিলাম। মনমেজাজ ভাল নেই তোর। মেডিকেল গ্রাউণ্ডে কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাক। হয়ত খারাপ লাগবে না।

পরদিনই পাড়ার ডাক্তারের কাছে মেডিকেল সার্টিফিকেট নিয়ে ছুটির দরখাস্ত পেশ করল অবন্তী। আগামী সোমবার থেকে নেবে সে ছুটি।

আর মাত্র তিনদিন বাকি। শনিবার তার অফিস থাকে না। অতএব সে হিসাবে আর মাত্র একদিন করবে সে অফিস। বিকালের দিকে দেখা হোল তার সুধাংশু বোসের সঙ্গে। অবন্তী ভেবেছিল সুধাংশু তাকে কোন প্রশ্ন করবে ছুটির ব্যাপারে। কিন্তু সুধাংশু শুধু আবছা চোখে একপলক চেয়ে দেখল তাকে। মুখে কোন কথা বলল না।

গভীর অভিমানে ছেয়ে গেল তার মন। মন হোল সব লোকই সমান। অফিসের আর দশজন লোকের থেকে কোথায় আলাদা সুধাংশু? আবার তার মনে হোল সেই এক কথা। 'আমার কেউ নেই। আমি বড় একা এই পৃথিবীতে'।

শনিবার সকালে অরণী খেয়ে দেয়ে দোকানে চলে গেলে পর অর্চনা এর তার কাছে।

—আমি একটু বেরোচ্ছি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসব। যদি কোন কারণে ফিরতে দেরি হয় তাহলে তুমি খেয়ে নিও। এ বেলার সব টেবিলেই আছে।

অনেকদিন ধরে এভাবেই কথাবার্তা চলে তাদের মধ্যে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু প্রয়োজনের বাইরে কোন কথা হয়না। তার বৌদি নিজের থেকে কিছু বলল না দেখে সেও জিজ্ঞাসা করলনা। দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে এসে ট্রানজিস্টারটা চালিয়ে দিল অবন্তী। তার মনের শূন্যতা ভরাবার জন্য।

আজকাল তাদের বাড়িটা বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মনটা কেবল খাঁ খাঁ করে। একা একা থাকা যায়না। যদি কখনও একা থাকতে হয় তাকে কিছুক্ষণ তাহলে যেন হাঁপিয়ে ওঠে সে। পুরনো স্মৃতি ভিড় করে আসে মাথায়।

মাঝে মাঝে হঠাৎ কেমন যেন একটা গা ছমছম করা অনুভূতি টের পায়। মনে হয় তার বাবা মা দাদা যেন হাত বাড়িয়ে তাকে টানতে আসছে। জীবিতদের কাছে তাব অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে গেছে দেখে মৃতরা কাছে টানতে চাইছে সস্নেহ আলিঙ্গনে। হঠাৎ মনে হয় তার পাশে একটা ছায়া এসে দাঁড়িয়েছে। কিংবা ঠিক তার পেছনে। কখনও বা মনে হয় কিছুটা দূর থেকে লক্ষ করছে তাকে কোন অশরীরী।

বিবিধ ভারতীর গানের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ধাবমান অপচিন্তা হঠাৎ যেন ধাক্কা খেল। অবন্তীর কানে এল কলিং বেলের আওয়াজ। একটু দীর্ঘস্থায়ী আর উচ্চকিত লাগল সেই আওয়াজ। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে গভীর বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে ওঠে অবন্তী।

—আপনি?

লাজুক হাসি হাসে সুধাংশু।

—হাঁ আমি। কাল সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। তাই আজ এলাম। আপনি ছুটি নিলেন কেন? কি হয়েছে আপনার?

সুধাংশুর সেই হাসি অপূর্ব ঠেকল অবন্তীর কাছে। তাব আশ্চর্য সুন্দর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মমতা ঝরে পড়ছিল বৃষ্টিধারার মতো। অবন্তীর শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছিল। সুধাংশুকে তার পরিত্রাতা মনে হচ্ছিল। দুঃসহ নির্জনতা আর শ্বাসরোধী নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা থেকে তাকে বাঁচাতে এসেছে যেন সে।

আগের থেকে অনেক কৃশ হয়ে গেছে সুধাংশু। এখনও তাকে স্বাস্থ্যবানই দেখায়। তবে মেদের প্রাবল্য ঝরে গেছে বলে আগের থেকে অনেক অন্যরকম দেখাচ্ছে। অবন্তী নিজেই অবাক হয়ে গেল যে তার এখন খারাপ লাগছে না সুধাংশুর চেহারা। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল কেন এত কুশ্রী মনে হয়েছে এই চেহারা? এই মানুষের মনে যে পবিত্রতা আছে তা কেন দেখতে পায়নি সে? সেকি মোহঘোরে আচ্ছন্ন ছিল বলে?

চকিতে সংবিত ফিরে পেয়ে নিজেকে সামলে নিল অবন্তী। সুধংশু দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

—আসুন ভিতরে আসুন। আপনি খুব ভাল সময়ে এসেছেন। আমার খুব খারাপ লাগছিল একা একা।

ভেতরে ঢুকে সুধাংশু বলে—'একা একা কেন? বাড়িতে কেউ নেই? একটু আরক্ত দেখায় তাকে। ছোট্ট করে হাসে অবন্তী।

—ছোড়দা দোকানে। আর বউদি একটু বেরিয়েছে কি দরকারে যেন। সুধাংশুকে বসিয়ে ভিতরে চলে গেল অবন্তী চায়ের ব্যবস্থা করতে। দ্বিতীয় কেউ নেই যে মিষ্টি আনতে পাঠাবে। একটু পরে একটা ট্রেতে চায়ের সঙ্গে লুচি আর বেগুন ভাজা এনে হাজির করল সে। সপ্রশংস বিস্ময়ে সুধাংশু বলে—'আপনি একা হাতে সব করলেন?

লজ্জা পায় অবন্তী।

—এটুকু করতে আবার কতজন লাগে? তাছাড়া আমার অভ্যাস আছে। নিম্ন মিধ্যবিত্ত বাড়ি আমাদের। ছোটবেলা থেকেই মায়ের সঙ্গে হাতে হাতে এসব করেছি।

—তা হয়ত ঠিক। তবু অপনাকে দেখে বিশ্বাস হতে চায়না যে আপনি এসব কাজ করতে পারেন?

চুপ করে শোনে অবন্তী। প্রতিবাদ করেনা। এরকম কথা সে এই প্রথম শুনছে না। নতুন করে কোন প্রতিক্রিয়া হয়না তাই কথাটা শুনে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুধাংশু আবর সেই আগের প্রশ্নে ফিরে আসে।

—আপনার কি হয়েছে? হঠাৎ ছুটি নিলেন যে?

একমূর্হুত দ্বিধা করল অবন্তী। অমিতের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছেদের কথা অজানা থাকার কথা নয় সুধাংশুর। তবু সে যে যোগসূত্র খুঁজে পায়নি সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। জেনে বুঝে অবন্তীকে আঘাত দেওয়ার জন্য এমন প্রশ্ন সে কখনই করবে না।

—আপনি তো জানেন আমাদের অফিসের পরিবেশ? কিছুদিন ধরে আমার মনের ওপর বড় চাপ যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বুঝে ফেলল সুধাংশু। তার প্রশ্নেই ধরা পড়ল সেটি।

—কিছু যদি মনে না করেন একটা প্রশ্ন করতে পারি? অমিতের সঙ্গে আপনাকে দেখি না। আমি শুনেছি আপনাদের মধ্যে মনান্তর হয়েছে। কারণটা কি খুবই গুরুতর? মিটিয়ে ফেলা যায় না?

একটু অনমনস্ক হলো অবন্তী। সে নিজেও তো সেরকমই আশা করেছিল। কিন্তু অপর পক্ষেরই তো গরজ নেই।

একটু ভেবে নিয়ে আস্তে আস্তে জবাব দিল সে।

—সম্ভবতঃ না। এই মুহুর্তে আপনাকে সব কিছু খুলে বলতে পারছিনা। মাপ করবেন।

সুধাংশু আর পীড়াপীড়ি করলনা। শুধু আগের মত বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে লজ্জিত গলায় বলল—'বিশ্বাস করুন অবন্তী আমি ভাল নেই। আমি চাই আপনি সুখী হন। ঈশ্বরের কাছে সব সময়ে অপনার মঙ্গল কামনা করি।

এর আগে অবন্তীকে তার স্বনামে ডাকেনি সুধাংশু। আর এমন অকপটে প্রকাশ করেনি তার মনোভাব। অন্যসময়ে এরকম কথা শুনলে হাসি পেত অবন্তীর। নিছক ঋগাড়ম্বর বলে মনে হোত। কিন্তু তা মনে হোলনা।

সুধাংশুর চোখে চোখ রেখে অকম্পিত গলায় সে তার উপলদ্ধি ব্যক্ত করে।

—আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি আপনি আমার প্রকৃত হিতাকাঙ্খী।

—আপনি জানেন? আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন?

—হ্যাঁ। গতকালও হয়ত এতটা নিঃসন্দেহ ছিলাম না। কিন্তু আজ আপনাকে দেখামাত্র বুঝেছি আপনি আমার ভাল চান। আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। আপনি আসার আগের মুহূর্তেও খুব অস্থির লাগছিল। মনে হচ্ছিল আমার কেউ নেই। আমি বড় একা।

—অবন্তী আমিও বড় একা। খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছি। তখন থেকে মামার কাছে মানুষ। আমার মা আর আমাকে দেখাশোনার জন্য বিয়ে পর্যন্ত করেনি মামা। মাকেও হারিয়েছি পরে। কিন্তু মামা আমাকে বুকে করে আগলে রেখেছেন। সংসারে আমাব একটিমাত্র বাঁধন ঐ মামা। তারও বয়স কম হলোনা। প্রায়ই অসুখে ভোগেন। হয়ত আমার টানেই এখনও পড়ে আছেন মাটি কামড়ে।

অবন্তীর মনে পড়ল সুধাংশুর মামা উপযাচক হয়ে এসেছিলেন তাদের বাড়ি। তারা সুধাংশুকে মনোনীত করেনি বলে খুব মর্মাহত হয়েছিলেন। হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলেছে তারা এমন কথাও বলেছিলেন তিনি রাগ করে। সুধাংশু আবার তাদের বাড়ি এসেছে শুনলে কি বলবেন সেই বৃদ্ধ?

হঠাৎ সুধাংশুর কথা শুনে চমকে গেল সে।

—আমি যদি মাঝে মাঝে আসি আপনি কি কিছু মনে করবেন?

—সে কি? মনে করব কেন? বরং খুব ভাল লাগবে।

—সত্যি বলছেন?

—আপনি কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না বলুন তো? সত্যি বলছি ভীষণ খুশি হবো।

হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হলো সুধাংশু। অবন্তীর হাতদুটো টেনে নিজের কপালে ছোঁয়াল সে।

—অবন্তী আমি সত্যিই কি এত ভাগ্যবান? তুমি সত্যিই আর আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেনা?

অবন্তীকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে সুধাংশু যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল। শ্বাসরুদ্ধ হবার অবস্থা অবন্তীর। করুণ স্বরে প্রায় মিনতি করে তবে সে বন্ধনমুক্ত হতে পারল।

সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পেয়ে তাকে ছেড়ে দিল সুধাংশু।

—সত্যি কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত কাজ করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও অবন্তী। আমার মত দুর্ভাগার কপালে হঠাৎ এত সুখ! আমার মাথা ঠিক ছিলনা।

অবন্তীকে একদৃষ্টে দেখতে থাকে সে।

—তোমার মত এত সুন্দর আর কাউকে লাগেনি অবন্তী। সেই কবে একটা বিয়ে বাড়িতে তোমাকে দেখেছিলাম। তুমি সেদিন বেগুনী রঙের সিল্কের শাড়ী পড়েছিলে। তার সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ব্লাউজ। কপালে ছিল খয়েরী টিপ। বেলফুলের কুড়ি জড়িয়েছিলে চুলের বিনুনীতে। দুচোখ ভরে শুধু তোমায় দেখেছি। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, কনে সম্পর্কে তোমার দূর সম্পর্কে মামাতো বোন হয়। সেই যে তোমার সৌন্দর্য আমার চোখে লেগে রইল তার আর ছাড়াতে পারলাম না। মামা কত জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ দেখলেন। আমার কাউকে ভাল লাগেনা। তোমাদের বাড়ি থেকে আমাকে পছন্দ করল না। তবু আমার কেন যেন মনে হোত সব কিছু মিথ্যে নয়। আমি নিশ্চয় একদিন তোমাকে পাব। হয়ত তার জন্য মূল্য দিতে হবে। তোমাকে অফিসে দেখে চমকে উঠে ছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল ভাগ্যই হয়ত তোমাকে টেনে নিয়ে এসেছে আমার কাছে। তারপর কতদিন কেটে গেল। আমি বুঝলাম আমাকে তোমার ভাল লাগেনি। তোমার মত এত সুন্দর একটি মেয়ের কি করেই বা ভাল লাগবে আমার এমন অসুন্দর চেহারা? তবু আমি কোনদিন ভাগ্যকে দোষ দিইনি। আজ দেখ তারই পুরস্কার পেলাম।

স্তব্ধ হয়ে শুনছিল অবন্তী। আনন্দের সঙ্গে অপরাধ বোধের অনুভূতিও টের পাচ্ছিল সে। একটি মানুষ তার বুকের মধ্যে তার জন্য অগাধ ভালবাসার পুঁজি

জমিয়ে আনন্দহীন প্রত্যাশাহীন জীবন কাটিয়ে যাচ্ছিল আর সে কি না চোখের সামনে প্রেম করে চলেছিল প্রথমে পট্টনায়ক পরে অমিতের সঙ্গে। এই মানুষটিরতো অজানা থাকার কথা নয় সে কিভাবে মিশেছে তাদের সঙ্গে?

মনে পড়ল কতদিন সে দেখেছে আচ্ছন্ন বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে এই মানুষটি তার আর পট্টনায়কের দিকে। অমিতের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রায় পাকা হয়ে যাওয়ার পরও নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেনি। এই মানুষটি সংযম, ভালবাসা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা আর ক্ষমতাশীলতার কি তুলনা আছে? রূপের কথা বাদ দিলেই আর কোনদিকে খাটো সুধাংশু?

তৃষিত চোখে চেয়ে আছে তখনও তার দিকে সুধাংশু। ভিতরে ভেতরে কেঁপে উঠেছিল অবন্তী। অলৌকিক কারণে সুধাংশুকে তার একটুও কুদর্শন মনে হচ্ছিলনা আজ। চোখের সামনে থেকে মোহের আবরণ সরে গিয়েছিল। উদ্ভাসিত হচ্ছিল সুধাংশুর অন্তর সৌন্দর্য।

সুধাংশুর দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে অবন্তী বলল—'আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবনা। ছোটবেলা থেকে একের পর এক আঘাত পাচ্ছি। আজকাল প্রায়ই মনে হয় আমি বোধ হয় বেশিদিন সুস্থ থাকবনা। এখন মনে হচ্ছে আপনি আমার পরিত্রাতা হয়ে এলেন। শুধু দুঃখ হয় মা দেখে গেলেন না। মা আপনাকে দেখলে খুশি হতেন।'

সুধাংশু বলল—'তুমি সাহস দিচ্ছ বলেই একটা আর্জি পেশ করছি। বিয়েটা আর বেশিদিন পিছিয়ে রাখতে চাইনা।

লজ্জিত মুখে চুপ করে শুনে গেল অবন্তী। কোন জবাব দিলনা। শঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করে সুধাংশু।

—তুমি কিছু মনে করছ না তো অবন্তী?

অবন্তী হাসে।

—আপনি যেমন চাইবেন তেমন হবে। শুধু আমার একটা অনুরোধ ছিল আপনার কাছে। ব্যাপারটা এখন জানাজানি হোক্ তা আমি চাই না। অফিসে আমরা আগের মতই থাকব! আমি চাইনা এখন কেউ জানে। আর—

কথা শেষ না করে থেমে গেল অবন্তী দ্বিধাগ্রস্তভাবে।

—আর কি? তোমার কোন শর্ত আমি অপূর্ণ রাখবনা।

তবু দ্বিধা করে অবন্তী।

—অফিসে 'আপনি-ই ভাল। হঠাৎ তুমি শুনলে কিছু ভেবে বসতে পারে লোকে।

হো হো করে হেসে ওঠে সুধাংশু। তাকে এরকমভাবে এর আগে হাসতে দেখেনি অবন্তী। এই মানুষটির মনে যে অনাবিল আনন্দের ফোয়ারা সৃষ্টি হয়েছে তার জলধারা অবন্তীকেও স্পর্শ করে যাচ্ছিল।

—এই কথা? ঠিক আছে। তোমার কোন ভয় নেই। আপনি বলতে এখন আমার একটু অসুবিধা হবে ঠিকই। তবে ভাববাচ্যে সব সময়েই কথা বলা যায়।

—সেই ভাল। আরেকটি অনুরোধ ছিল। কিন্তু লজ্জা করছে বলতে। হয়ত বিরক্ত হবেন আপনি।

অবন্তীর হাতটা ধরে নিজের কপালে ছোঁয়ায় সুধাংশু।

—না বিন্তী। নিজেকে এখন শাহানশাহ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে অনেকেই অনেক কিছু চাইতে আসলে হয়ত নিরাশ হবেনা।

তবু কুণ্ঠিত দেখায় অবন্তীকে।

—আপনি অনুমান করতে পারছেননা। তাই একথা বলছেন।

—অনুমানের দরকার কি? বলে ফেল। আমার তো মনে হয় কোন কিছুতেই আমার অসুবিধে হবে না।

—আমার দিদির কথা আপনি জানেন। দিদি এখন অনেক ভাল। দিদির জন্য মনে বড় কষ্ট নিয়ে মা চলে গেছেন। মায়ের ইচ্ছা ছিল ভাল হলেই বাড়িতে নিয়ে আসি দিদিকে।

চুপ করে অবন্তীর দিকে তাকিয়ে তার কথা শোনে সুধাংশু। তার ভাবলেশহীনমুখ দেখে অবন্তীর মন আশঙ্কায় ভরে উঠল। সুধাংশু কি তার অনুরোধ শুনে বিরক্ত হবে?

অকৃত্রিম উদ্বেগ নিয়ে প্রশ্ন করে সুধাংশু।

—তুমি কি তোমার দিদির জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে চাইছ?

—আপনি আমার বাড়ির কথা অনেকটাই জানেন। ছোড়দাদের ওপর আমার ভরসা নেই। দিদিকে আমি নিজের কাছে রাখতে চাই।

—এই কথা? বেশ তো! নিঃসঙ্গতা কত পীড়াদায়ক তা আমি জানি অবন্তী। অনেকের সঙ্গে থাকতে আমার ভালই লাগবে। তুমি যে স্বার্থপরের মত দিদিকে তার নিজের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিচ্ছ না তা দেখে ভালই লাগছে।

স্থির চোখে তাকাল অবন্তী সুধাংশুর দিকে।

—পরিস্থিতি মানুষকে অনেক পালটে দেয়। এক সময়ে স্বার্থপরের মত নিজের সুখের কথাই ভেবেছি। ভেবেছি আমাদের বাড়ির নিরানন্দ পরিবেশ থেকে দূরে থাকব। কিন্তু এখন আর তা পারিনা। মায়ের কথা মনে হয়। দিদিকে

সরকারপুলে পাঠাবার পর মা যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। ওর কি হবে ওকে কে দেখবে এই চিন্তাতেই একেবারে শয্যা নিয়েছিলেন। হয়ত দাদা বেঁচে থাকলে এভাবে ভাবতেননা।

অবন্তীর দ্বিধা সংশয় আশঙ্কা দৃঢ়ভঙ্গীতে দূর করে দিতে চাইল সুধাংশু।

—তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই অবন্তী। কথা দিচ্ছি কোন রকম অসুবিধা হবেনা এ ব্যাপারে। আর কোন অনুরোধ কিংবা শর্ত থাকলেও বলে ফেলতে পার।

সুধাংশুর গলায় পরিহাসের ছোঁয়া টের পায় অবন্তী। তার আরেকটি অনুরোধ ছিল। কিন্তু রসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে সেটি কিভাবে ব্যক্ত করবে ভেবে পেলনা।

সুধাংশু উঠে দাঁড়ায়।

—আজ উঠি। কাল কিংবা পরশু আবার আসব। তাতে তোমার আপত্তি নেই তো?

—আসবেন। কিন্তু—

—কিন্তু কি? অসুবিধা আছে কোন?

—না অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছিলাম।

—অন্য ব্যাপার নিয়ে?

সুধাংশুর দুশ্চিন্তা টের পেয়ে হাসে অবন্তী।

—আমি কিন্তু চাকরি ছাড়বনা।

—চাকরি ছাড়বে কেন? আজকালকার দিনে এরকম ভাল একটি চাকরি পেয়ে কেউ আবার তা ছাড়ে নাকি? তোমার কোন ভয় নেই। বহাল তবিয়তে চাকরি করবে তুমি। আর আমার তো ভালই। সব সময়ে কাছে থাকবে তুমি।

—তখন সেটা ভাল লাগবে না।

—কে বলল ভাল লাগবে না?

হঠাৎ একটি অদ্ভুত কথা বলল অবন্তী।

—আমি অনেক অন্যায় করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

অবন্তীর দিকে সকৌতুক সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকায় সুধাংশু।

—তুমি নিজেই জাননা বিন্তী তুমি কত ছেলেমানুষ। তোমার মধ্যে রয়েছে একটা অবুঝ ছটফটে শিশু। সে বুঝতে পারছে না সে কি চায়। যে বুঝতে পারেনা কিসে তার ভাল হবে কিংবা কি তার ভাল লাগবে। তোমার এই শিশুর মত মনটা নিয়ে তুমি কখনও এর দিকে, কখনও ওর দিকে হাত বাড়িয়েছ।

অবাক হয়ে হচ্ছিল অবন্তী সুধাংশুর কথা শুনে। এভাবে কোন মানুষ যে অন্য মানুষকে বিচার কিংবা বিশ্লেষণ করতে পারে তা তার ধারণার বাইরে। তার সমস্ত চপলতা লঘুতা সুধাংশুর কাছে ছটফটে শিশুর ছেলেমানুষি বলে মনে হয়েছে। সুধাংশুর এত স্নেহ, এত বাৎসল্যের প্রতিদানে কতটুকু দেওয়ার ক্ষমতা আছে তার?

অবন্তীর কাছে ঘন হয়ে সরে আসল সুধাংশু।

—যা ঘটে গেছে তা ঘটে গেছে। তাকে মুছে ফেল মন থেকে। এখন থেকে বর্তমানের কথা ভাব বিন্তী!

কৃতজ্ঞ চোখে সুধাংশুর দিকে তাকিয়ে অবন্তী বলল আস্তে আস্তে থেমে থেমে—'তাই হবে।'

ষোল

নিজেকে নিয়ে ভাবলে আজকাল ভারী অবাক লাগে অবন্তীর। তার এমন রূপান্তরণ ঘটবে এ যেন সে কল্পনাও করেনি কোনদিন। ভাবী স্বামী ও সংসার নিয়ে অনেক সুন্দর ছবি এঁকেছিল সে মনে মনে।

তার সেই স্বপ্নের ছবির সঙ্গে এতটুকু মিল নেই সুধাংশুর। তবু সুধাংশু আসলে নির্ভেজাল আনন্দে ভরে ওঠে তার মন। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে সুধাংশুর দিকে তাকিয়ে। 'একে আমার এত কুৎসিত লেগেছিল আগে? কই এখন তো মনে হচ্ছে না?' অনেক ভেবে চিন্তে অবন্তীর মনে হয় আসলে সুধাংশু তার কাছে তার চেহারাটা নিয়ে শুধু আসেনা। স্নেহ, বাৎসল্য ভালবাসা, বিশ্বাস আর মর্যাদার একটা পরিমণ্ডলে হয় যেন সুধাংশুর সান্নিধ্যে। সেই পরিমণ্ডলে অবন্তীর মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। তার পুরনো চিন্তা বা বিশ্বাসগুলো ব্যাপ্তি খুঁজে পায়।

আজকাল মাঝে মাঝেই সুধাংশুর সঙ্গে পট্টনায়ক কিংবা অমিতের তুলনা করে সে। এ এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে তার মনে। সাধারণ মানদণ্ডে সুধাংশুর চেহারা এদের থেকে নিঃসন্দেহে অনেক নিকৃষ্ট। তবু কেন যেন অবন্তীর মনে হয় সুধাংশুর চেহারায় এমন কিছু আছে যা এদের চেহারায় নেই। সুধাংশু যখন তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে বলে—'বিন্তী তুমি কত সুন্দর', তখন অবন্তীর মনে পড়ে যায় পট্টনায়কের কথা। পট্টনায়কও তাকে স্তুতি করত। তবু দুজনের মধ্যে কত তফাৎ!

পট্টনায়কের চোখে বাসনার তাপ তার শরীরেও সঞ্চারিত করত দুঃসহ এক তাপ। যৌবনের খরতা বিকীরিত হতো তার সান্নিধ্যে। চোখের দৃষ্টি দিয়েও যেন

রমণ করত তাকে পট্টনায়ক। শরীরে মনে ছটফট করত অবন্তী।

অমিতের সান্নিধ্যে অন্য রকম প্রতিক্রিয়া হোত। অমিতও মুগ্ধ হতো তার সৌন্দর্য দেখে। কিন্তু সেই সং? তার মনে দেখা দিত বিচিত্র এক জটিলতা। অবন্তী বেশি সেজে আসলেও যেন সহ্য হতোনা তার। অবন্তীর সৌন্দর্য স্বার্থপরের মত একা উপভোগ করতে চাইত। প্রথম দিকে তার মনের সেই জটিলতা ধরতে পারেনি অবন্তী। পরে পরপর কয়েকটি ঘটনায় অমিতের মানসিকতা প্রকট হলো তার কাছে। অবন্তীর সৌন্দর্য, তার আকর্ষণক্ষমতা তার কাছে একই সঙ্গে উপভোগের ও বিরক্তির কারণ ছিল। অবন্তীকে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে কণ্টকিত থাকত সে। তবু অবন্তী চেয়েছিল তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে। কিন্তু তার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিল অমিত। তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল।

সুধাংশু এগিয়ে না এলে কি হতো ভাবতে পারেনা অবন্তী। তাকে নিয়ে অফিসে যে আজকাল সরস মুখরোচক আলোচনা চলে তা সে বুঝতে পারে। সেদিন সিঁড়িতে ছেলেগুলোর আলোচনার লক্ষ কি তা বুঝতে তার বা শ্যামলীর দেরি হয়নি। এভাবে বেশিদিন চললে কি হোত ভাবতেও শিউরে ওঠে সে। অফিসের চোখের সামনে কয়েকজন অপ্রকৃতিস্থ লোককে দেখতে পায় সে। কি কারণে তাদের এই মানসিক অসুস্থতা জানেনা সে। ইদানীং তারও ভয় হোত সেও না তাদের মত হয়ে যায়?

গভীর খাদের মত কুটিল সর্বনাশের সামনে এসে পড়েছিল সে। সুধাংশু তাকে নিশ্চিত অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আনল। মাথার উপরে ছাদ পেয়েছে সে এখন। অভিভাবকের সস্নেহ ভালবাসা দিয়ে সুধাংশু তার সব আশঙ্কা নির্মূল করে দিয়েছে। এসব কথা যখনি ভাবে কৃতজ্ঞতায় ভরে যায় তার মন।

প্রায় প্রতিদিনই আসে সুধাংশু তাদের বাড়ি। তার ছোড়দা ও বৌদির সঙ্গেও ভালরকম পরিচয় হয়ে গিয়েছে তার। সুধাংশুকে যে তারা দুজনেই বেশ পছন্দ করছে তা বুঝতে পারে অবন্তী। অবশ্য অপছন্দ করলেও কিছু এসে যেতনা। তবু সব দিক দিয়ে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে ভালই লাগে।

কিছুদিন আগে মার্গারেট মিচেলের গন্ উইথ দ্যা উইণ্ড বইটা পড়তে দিয়েছিল তাকে সুধাংশু। তার মতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি এটি। স্কারলেট ওহারার মানসিক রূপ বদলের ছবিটির সঙ্গে কোথায় তার নিজের মানসিক রূপবদলের ছবিটির মিল খুঁজে পায় সে। স্কারলেটের মত তারও চেতনার আবরণ সরে গেছে যেন।

তা সত্ত্বেও অস্বস্তি প্রকাশ করে সুধাংশু। অবন্তীকে নিবিড় ভালবাসার চোখে দেখতে দেখতে হঠাৎ কেমন অস্থির হয়ে যায়।

—তোমার পাশে আমাকে বড় বেমানান দেখায় বিন্তী। ঈশ্বর তো আর একটু যত্ন করে তৈরি করতে পারতেন আমায়?

প্রতিদিন প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করে অবন্তী।

—বিশ্বাস করো আমার কিন্তু কখনই মনে হয়না একথা। বরং মনে হয় আমার শুধু চেহারাটাই আছে। অন্য সব দিক দিয়ে তোমার অযোগ্য আমি।

সুধাংশুর একান্ত অনুরোধের তাড়নায় আজকাল 'তুমি' বলছে সে সুধাংশুকে। প্রথম প্রথম বাধবাধ ঠেকত। এখন অবশ্য বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। শুনে সুধাংশু আর আত্মসংবরণ করতে পারেনা। অবন্তীকে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে।

—একথা বলোনা বিন্তী। আমাকে তুমি কতটা দিয়েছ তা তুমি কি করে বুঝবে? সেটা বুঝি আমি।

এক মাসের ছুটি কাটিয়ে আবার অফিসে যোগ দিল অবন্তী। তাকে যে অনেকেই একটু বিশেষ চোখে লক্ষ করছে তা বুঝতে পারছিল সে। একমাত্র শ্যামলী ছাড়া আর কেউ জানেনা এর মধ্যে তার জীবনে কত বড় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। শ্যামলীকে তার নিজের মুখে বলতে হয়নি কিছুই। অবন্তীদের বাড়ি সুধাংশুকে একাধিকবার দেখে সব কিছু অনুমান করে নিয়েছিল সে। পরে অবশ্য জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিটুকু জেনে নিয়েছে।

শুনে শ্যামলী যে এতটা খুশি হবে তা সে ভাবতেই পারেনি। বন্ধুকে খুশি হতে দেখে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিল তার মন। শ্যামলীকে সে অনুরোধ করেছিল অফিসে কিছু না জানাতে। শ্যামলী চাপা স্বভাবের মেয়ে। বন্ধুর অনুরোধ রাখবেনা হতেই পারেনা। তবু অনেকের ভাবভঙ্গী দেখে অবন্তীর একটু কেমন কেমন ঠেকছিল। মিসেস চন্দ তার টেবিলের কাছে এসে অর্থপূর্ণ হাসি হাসেন।

—খবর সব ভাল তো অবন্তী?

অবন্তী কোন জবাব না দিয়ে অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—'উনি এরকম করে হাসছেন কেন? তবে কি কিছু শুনেছেন? কিন্তু কার কাছে শুনেছেন'?

মিসেস চন্দ কিন্তু কিছুই ভাঙ্গলেননা। অবন্তীর বিহ্বল অবস্থা দেখে রসিকতা করলেন—'কি ব্যাপার অবন্তী? বাক্যহারা একেবারে?' সংবিত ফিরে পেয়ে পরিস্থিতি সামলায় অবন্তী।

—কি জবাব দেব বলুন? এরমধ্যে আর ভাল খারাপ তেমন কি ঘটতে পারে?

—তা-ই নাকি?

টেনে টেনে প্রশ্ন করেন মিসেস চন্দ।

মনে মনে ভড়কে গিয়ে থেমে গেল অবন্তী। মিসেস চন্দ তাকে খুবই ভালবাসেন। তবু তার কথাবার্তা কেমন বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল তার কাছে। রজব আলী কিংবা রামন পর্যন্ত কেমন এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল তার দিকে। একদিন তার সামনে দিয়ে ঘুরে গেল পট্টনায়ক। ইচ্ছা করেই তার দিকে তাকিয়ে দেখল অবন্তী। কেমন যেন বাঁকা একটা হাসি খেলে যেতে দেখল সে তার মুখে। অবন্তী মনে মনে দারুণ চটে উঠে বলল—'শয়তান লম্পট! আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দিইনি বলে খুব অপরাধ করেছি তাই না?'

আশ্চর্য লাগছিল তার অমিতকে দেখে। একাধিকবার দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে। অদ্ভুত রাগী রাগী চোখে দেখছিল সে অবন্তীকে। মনে মনে তাকেও কথা শোনাচ্ছিল অবন্তী। 'কি ভেবেছিলে তুমি? তোমাকে আমার উদ্ধারকর্তা বলে খুব তোয়াজ করব? উচ্চাসনে বসে আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করবে তুমি?'

কেউ তাকে স্পষ্ট করে কিছু বললনা বা জিজ্ঞাসা করলনা। তবু অনেকের ভাবভঙ্গী দেখে অবন্তীর মনে সন্দেহ ঘনীভূত হলো যে ব্যাপারটা ইতিমধ্যে অবশ্যই জানাজানি হয়ে গেছে। তা না হলে এভাবে তার দিকে এরা তাকাতনা বা কথা বলতনা।

সুধাংশু তার শর্ত অমান্য করেনি। অবন্তীও ইচ্ছা করেই তার সঙ্গে কোন কথা বলল না। কিন্তু সারাক্ষণ অবন্তীর মনে হতে লাগল তাদের দুজনের সম্পর্ক জেনে ফেলেছে সকলে।

শ্যামলী বা সুধাংশুকে সে সন্দেহ করেনা। অপর কোন ব্যক্তির কাজ এটি। কিন্তু সেই ব্যক্তি কে হতে পারে তা হাজার ভেবেও অনুমান করতে পারলনা অবন্তী।

সেদিন ছুটির সময় শ্যামলীকে প্রশ্ন করল সে এ বিষয়ে।

—তুই কিছু জানিস শ্যামলী? আমার তো কেমন যেন মনে হোল সবাই জেনে ফেলেছে। কিন্তু কি করে সেটা সম্ভব হলো?

শ্যামলী হাসল।

—আমারও ধারণা অফিসের অনেকেই জেনে ফেলেছে। তবে তোর মত আশ্চর্য হচ্ছিনা। সুধাংশুদা এই এক মাসে খুব কম করেও কয়দিন তোদের বাড়ি গেছে জানিস। এই শহরে বাস করে সেটা জানা কি খুব অসম্ভব ব্যাপার? কেউ না কেউ নিশ্চয়ই দেখেছে। পরে সেটি নিয়ে কথা চালাচালি হয়েছে। তবে সবচেয়ে সন্দেহজনক তোদের দুজনের ভাবভঙ্গী। আমি তো দেখলাম তোরা কেউ কারুর সঙ্গে কোন কথা বলছিসনা।

অপ্রস্তুতের হাসি হাসে অবন্তী।

—প্রস্তাবটা আমারই। আমারই ইচ্ছা নয় আগের থেকে রাষ্ট্র হয় কথাটা।

—এই ব্যাপার? কিন্তু দেখলি তো তবু কেমন জানাজানি হয়ে গেল? এসব জিনিস বেশি দিন চাপা থাকেনা রে!

অবন্তী ম্লান বিষণ্ণ চোখে তাকায় শ্যামলীর দিকে।

—আমার মনে হয় শ্যামলী তোর সঙ্গে যেন মানাত ভাল। তোরা দুজনেই এত ভাল, এত সৎ!

উচ্ছ্বল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল শ্যামলী। তার সেই হাসি দেখে অবন্তীর মনে যেটুকু খোঁচা ছিল তাও মিলিয়ে গেল।

—কি পাগল তুই? নিজেকে এত খারাপ আর অসৎই বা ভাবছিস কেন? যা ঘটেছে তার দায় কি পুরোপুরি তোর? আসলে তুই বড় অনভিজ্ঞ। লোক চিনতে অক্ষম। তবে আমি খুব খুশি হয়েছি যে সুধাংশুদার সঙ্গে তোর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমি তো জানি তোকে কত ভালোবাসে সুধাংশুদা? এতদিন অন্ধের মত চলেছিলি। এখন যে তোর ভুল ভেঙ্গেছে এতে আমি কত খুশি হয়েছি বলতে পারব না।

একটু থেমে স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে আগের কথার সূত্র টেনে ধরে শ্যামলী।

—ভয়ঙ্কর একটা পরিবেশের মধ্যে বাস করছি আমরা অবন্তী। লোভ, লালসা, কপটতা আর নিষ্ঠুরতার ছড়াছড়ি দেখে বড় ভয় হয় মনে। ভাবি আমরা কোন রসাতলের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি একটু একটু করে? দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্ত মূল্যবোধ তৈরি হয়েছিল তার মধ্যে ধ্বস নামছে দেখতে পাই। ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গের সম্পর্কের মধ্যে পর্যন্ত কত ফাঁকি, কত শয়তানী আর কত নোংরামী চলেছে। আমার দুই দিদির কথা তুই জানিস। আরও কত ঘটনার কথা শুনেছি জেনেছি। দেখেশুনে এত ভয় হয় যে কি বলব? সুধাংশুদাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল অনেকের থেকেই উনি আলাদা। পরে বুঝেছি আমার ধারণা ভুল নয়। তোর ভাগ্য সত্যি ঈর্ষা করার মত।

কয়েকদিন পরে সসংকোচে একটা প্রশ্ন করল সুধাংশু অবন্তীর কাছে।

—বিন্তী একদিন আসবে আমাদের বাড়ি? আমার ইচ্ছা দুজনে মিলে মামাকে প্রণাম করব। আমাদের আর মুখে কিছু বলতে হবে না। আমি যে আমার পছন্দ করা মেয়েকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সংসারী হতে চলেছি তাতে উনি খুশিই হবেন।

অবন্তী ইতস্ততঃ করছিল।

—আমার ভয় করছে। বলা যায়না রেগেও যেতে পারেন। হয়ত আগের কথা মনে রেখেছেন।

—মামাকে চেনোনা তুমি। রাগ পুষে রাখার লোকই নন উনি। সুধাংশুর ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে মামার সঙ্গে দেখা করে অবন্তীর সে আশঙ্কা দূর হলো। সহৃদয় আন্তরিকতার সঙ্গে অবন্তীকে গ্রহণ করলেন ভবানীপ্রসাদ গুহ। পুরনো কথা ভুলে যাননি ঠিকই। একবার অনুযোগও করলেন সেই ব্যাপারে।

—খোকনের জন্য কত পাত্রী আনলাম। কিন্তু একটিকেও তার পছন্দ হলোনা। আমার সঙ্গে তা নিয়ে কেবলি খটাখটি লাগত। এখন বুঝতে পারছি আসলে ভবিতব্য ওর জন্য তোমাকে বেঁধে রেখেছে। ওর সাধ্য কি অন্য কাউকে বিয়ে করে?

অবন্তী বেশিক্ষণ থাকতে চাইলনা। বিয়ের আগে আর বেশি মেলামেশা করতে চায়না সে। চায়না লোক জানাজানি হয়। এখনও তার মনে ভয়ের ধুকপুকানি বন্ধ হয়নি। তার ভাগ্যচক্র এক জটিল চক্রনেমির আবর্তিত হচ্ছে ক্রমাগত। এখনও মাঝে মাঝে চমকে গিয়ে ভাবে আর কিছু ঘটবে না তো? তার যতটুকু ভোগ লেখা ছিল তার এখানেই ইতি তো?

সুধাংশু ঘুরে ঘুরে তাকে বাড়িঘর দেখাল। তার বইয়ের সংগ্রহ দেখাল। ভবিষ্যতে অবন্তী এসে কেমন ভাবে কি করে সেসব সাজাবে তা নিয়ে এক প্রস্থ আলোচনাও করে ফেলল তার সঙ্গে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে তার হারানো শৈশব ফিরে পেয়েছে যেন। পুতুল খেলার সঙ্গিনীকে নিয়ে শিশুর মত অনাবিল এক খেলায় মেতে উঠতে চাইছে। গম্ভীর স্বভাবের সুধাংশুর এই অন্তরঙ্গ চেহারাটা জানা ছিল না অবন্তীর। যত দেখছিল যত শুনছিল বিস্ময়ের থই পাচ্ছিলনা যেন।

একটি মানুষ তাকে কেন্দ্র করে জীবনে এমনভাবে উৎসবের সমারোহ আনতে চাইছে? তার সান্নিধ্য এত মূল্যবান তার কাছে?

অবুঝের মত অবন্তীকে ছাড়তে চাইছিল না সুধাংশু। শেষ পর্যন্ত সুধাংশুকে বুঝিয়ে টুঝিয়ে একরকম জোর করেই চলে আসতে হোল তাকে। অনাবিল আনন্দ নিয়ে ঝিরঝিরে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছিল সে বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনে এসে দেখা এল তার বোস জ্যাঠামশায়ের বড় মেয়ের সঙ্গে।

সুতপা দি তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—'এত দেরি হোল আজ'?

প্রশ্নটা ভাল লাগল না অবন্তীর। পাড়ার লোকে তার উপর খবরদারী করবে এ তো ভাল কথা নয়! অবন্তী গম্ভীরভাবে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—'দরকার ছিল।' সুতপা একটু ইতস্তত করে বলল—'কি বলব বিন্তী? বাড়ি এসো। তোমার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ভয়ে শিঁটিয়ে গেল অবন্তী—'কি হয়েছে

সুতপা দি? আমার বড় ভয়ে করছে'। সুতপা আস্তে আস্তে বলল—'খবরটা ভাল নয় বিন্তী। বাড়ি গেলেই বুঝতে পারবে।'

অবন্তী তবু দাঁড়িয়ে রইল।

—না তুমি বল। দিদির কি কিছু—

—না দিদির কিছু হয়নি। আমি বলতে পারছিনা বিন্তী। এরকম সাংঘাতিক খবর আমার মুখের থেকে নাই বা শুনলে।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় আসল অবন্তীর। ছোড়দার সঙ্গে বউদির সর্ম্পক একেবারেই ভাল নেই। প্রায়ই কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাটি হয় দুজনের মধ্যে। অবন্তী দেখে প্রায় সময়েই বাক্যালাপ বন্ধ থাকে। ছোড়দা আজকাল প্রায়ই তার আগের ঘরে একা শোয়। আজও কোন ঝগড়ার পরিণতিতে বউদিকে রাগের বশে খুন করে ফেলেনি তো ছোড়দা?

চিরকাল রগচটা, মেজাজী স্বভাবের তার ছোড়দা। তার পক্ষে এরকম আচরণ একেবারে অসম্ভব নয়। বিশেষ করে বউদির সঙ্গে এখন তার সম্পর্ক যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে এরকম কোন ঘটনা ঘটতেই পারে।

সুতপাদির সঙ্গে বাড়ি এসে ঘর ভর্তি লোকের মধ্যে বউদিকে দেখতে পেয়ে কিছুটা যেন আশস্ত হলো সে। সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প সম্ভবনা আছড়ে পড়ল তার চেতনায়। আর কোন সংশয় নেই। অঘটন ঘটেছে অবশ্যই তার ছোড়দার। একটু পরেই জানা গেল সব কিছু। বালিগঞ্জ স্টেশানে রেললাইনে কাটা পড়েছে অরণী। ঐ সময় সে কেন ওখানে গিয়েছিল সেটা খুবই আশ্চর্য। তার দোকানে থাকার কথা তখন। কেন যেন অবন্তীর মনে হল এটা অবশ্যই পুব পরিকল্পিত আত্মহত্যা। আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। পাড়া প্রতিবেশীদের টুকরো টাকরা আলোচনার মধ্যেও সেরকম ইঙ্গিত চাপা থাকলনা।

অর্চনাকে পাথরের নিষ্প্রাণ মূর্তির মত দেখাচ্ছিল। নিজেকেও তার মনে হচ্ছিল নিষ্প্রাণ পাথরের মত। স্পষ্ট করেও কিছু ভাবতেও পারছিল না। তার মাথা ঝিমঝিম করছিল। মাঝে মাঝে হাতুড়ির ঘা পড়ার মত তার চেতনায় একটি চিন্তা আছড়ে পড়ছিল নিয়মিত বিরতিতে। এমন হলো কেন?'

খবর পেয়ে অনেকেই এসেছিল। তাদের কথাবর্তা আলোচনা কিছুই কানে যাচ্ছিল না অবন্তীর। বোস জ্যাঠামশায়ের নির্দেশে অবন্তীই করল তার ছোড়দার মুখাগ্নি। যতটুকু না করলে নয় ততটুকু করল সে।

সুতপাকে সঙ্গে নিয়ে বোস জ্যাঠামশাই সারাক্ষণ অবন্তীকে সামলে রাখলে। সব কিছু শেষ হওয়ার পর অনেক রাত্রি বাড়ি ফিরে অবন্তী আর সামলাতে পারলনা নিজেকে। বুকভাঙ্গা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তার ভেতরে যে এত কান্না

জমেছিল তা সে নিজেই জানতনা। আর বউদি নিঃশব্দে কাছে বসে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল তার কান্না।

সে রাতে ঘুমোলনা তারা কেউ। স্বার্থপরের মত অবন্তীর মনে হচ্ছিল সুধাংশু কাজে থাকলে বেঁচে যেত সে। তার বুকে মাথা রেখে মনের জ্বালা অনেকটা লাঘব করতে পারত। মাঝে মাঝে এসব চিন্ত থেকে মনকে সরিয়ে সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবছিল সে।

তার ছোড়দা কোনদিন জীবনবিমুখ ছিল না। অনাসিক্ত বা বৈরাগ্যের ছিঁটেফোঁটাও তার মধ্যে ছিলনা। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত বেশি রকমের ভোগসুখপরায়ণ। বাবা আর দাদা মৃত্যুর পরও তেমন কোন ভাবান্তর চোখে পড়েনি। মায়ের মৃত্যুতে কিছুটা কাতর হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তার কতগুলো সুস্পষ্ট কারণ ছিল। মায়ের সর্ম্পকে শেষের দিকে ছোড়দার মনে যে একটা অপরোধবোধ তৈরি হয়ছিল তা বুঝত অবন্তী। শুধু মা কেন? অবন্তীর প্রতিও হঠাৎ নরম হয়ে পড়েছিল ছোড়দা। এতদিনের চেনা ছোড়দার রূপান্তর দেখে কম অবাক হতোনা অবন্তী।

তবু সে জেদ করে কাছে আসতে দেয়নি তার ছোড়দাকে। আসলে দাদার মৃত্যুর পর ছোড়দাকে একটা ঘৃণ্য বিশ্বাসহন্তা ঘাতক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না। সেই ছোড়দার মূহূর্তে সে যে এতটা কাতর হবে তা সে নিজেকে; ভাবেনি কোনদিন। এখন মনে হচ্ছে দিদিকে বাদ দিলে নিজের লোক সে পায়নি যার কাছে নিজের মনের ভাব লাঘব করতে পারে।

অবন্তীর জানতে ইচ্ছা করছিল হঠাৎ কেন তার ছোড়দার মানসিক গতিপ্রকৃতির এমন আমূল রূপান্তরণ হলো? তবে কি রক্তের গভীরে থেকে যায় অনেক প্রাচীন সংস্কার? যা সহসা চোখে পড়েনা? কিন্তু ওপরের সব ঢেউ থিতিয়ে গেলে গভীরতর সেই ঢেউ গ্রাস করে নেয় অন্য সব কিছু?

নিজের ভাগ্যের ছকটাকে বুঝতে চাইছিল সে। তার জীবনটা এভাবে ওলোটপালোট হয়ে যাচ্ছে কেন ক্রমাগত? কেন তাকে সুখী হতে দিচ্ছিল না তার ভাগ্য?

হঠাৎ তার মনে হলো তার সংস্পর্শে এসে সুধাংশুর জীবন দুঃখময় হয়ে উঠবে না তো? কিন্তু কাকে নিয়ে থাকবে তাহলে? এই বিশাল পৃথিবীতে একা থাকার কথা ভাবতেই পারেনা। সম্পর্কে বউদি ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে এক ছাদের তলায় থাকতে ইচ্ছা করেনা। বিষকন্যার মত অশুভ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে ও। পর পর দুটি তাজা প্রাণ অকালে চলে গেল। আরও কি সর্বনাশ করবে ঐ রাক্ষসী। সে জানেনা।

যতদিন এ তার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে ততদিন তাকে দগ্ধে দগ্ধে মারবে। কি সম্পর্ক তার এর সঙ্গে? সে কেন তার দায় বাইরে আজীবন? আর কয়েকটা দিন যাক্। সে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেবে আর তাদের একসঙ্গে থাকার অর্থ হয়না।

খবর পেয়ে শ্যামলীর সঙ্গে সুধাংশু এলো। তদের সাহচর্যে কথায় বার্তায় কিছুটা যেন স্বাভাবিক বোধ করল অবন্তী। তার মনের ভাব টের পেয়ে সুধাংশু তাকে বোঝাল কয়েক দিন ধরে। সে সুধাঠশুর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইছে না শুনে রীতিমত ধমক দিল সুধাংশু।

—একি ছেলেখেলা বিন্তী? তুমি বললেই আমি তা মেনে নেব কেন? এখন তোমার একার কথায় কিছু হবে না। আমি যা বলব যা করব তাই শুনবে তুমি।

তবু বুঝতে চায়না অবন্তী।

—আমার মনে হচ্ছে তোমার পক্ষেও খুব শুভ হবেনা আমার সঙ্গে তোমার জীবনকে জড়ালে।

দৃঢ় গলায় সব আপত্তি নস্যাৎ করে দিল সুধাংশু।

—এসব কি বলছ তুমি পাগলের মত? তুমি না বলেছিলে তুমি আর ভার বইতে পারছোনা? আমি স্বেচ্ছায় তোমার সব ভার বইতে চাইছি বিন্তী। তুমি না করোনা। আমি কোনদিন জোর করিনি। কিন্তু এখন দরকার হলে জোর করতে হবে।

একটু থেমে রসিকতা করে সে।

—প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগে নিয়ে যাব তোমায় আমার বাড়ি। আমি অনেকদিন তোমার পথ চেয়ে কাটিয়েছি। আর আমি অপেক্ষা করতে পারবনা। বিন্তী তোমার কষ্ট আমি বুঝি। কিন্তু কি করবে বল? এতো ভাগ্যের মার!

অর্চনার প্রসঙ্গ সুধাংশুর কাছে তোলেনি অবন্তী অপ্রয়োজনবশে। সে ভেবেছিল স্বাভাবিকভাবেই বিয়ের পর তাকে সুধাংশুর বাড়ি গিয়ে থাকতে হবে। বউদির কি হবে না হবে তা নিয়ে সুধাংশুর সঙ্গে আলোচনা করবে কি?

আগে একাধিকবার বউদির সম্পর্কে তার ক্ষোভ, তার ধারণা সে ব্যক্ত করেছে সুধাংশুর কাছে। তাদের পারিবারিক কেলেঙ্কারির কথা অজানা নেই সুধাংশুর। আগে সে চুপ করে শুনত অবন্তীর কথা। নিজের মতামত ব্যক্ত করতনা। কিন্তু এখন সে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছে। অবন্তী কিছু ব্যক্ত না করলেও একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অর্চনার প্রসঙ্গ তুলল।

—দিদি তো আমাদের সঙ্গে থাকবেন। কিন্তু বউদির কথা কি ভেবেছ?

একটু বিরক্ত হলো অবন্তী।

—বউদির কথা আমাকে ভাবতে হবে কেন? কি এমন সম্পর্ক আমার তার সঙ্গে?

শান্ত চোখে তাকাল তার দিকে সুধাংশু।

—ছিঃ বিন্তী। এভাবে বলোনা। একটি মানুষ যত অপরাধই করুক তার দুঃখটা মিথ্যে হয়ে যায়না। তোমার বউদির অপরাধের পরিমাণ কত তা আমরা নিক্তি দিয়ে মাপিনি। তবু উনি নিরপরাধ নন এটুকু আমরা জোর করেই বলতে পারি। কিন্তু তার শাস্তিও কি কম ভোগ করছেন? তোমার কাছেই শুনেছি তার বাড়ির লোকেরা পর্যন্ত সম্পর্ক রাখেনা তার সঙ্গে। তোমাদের বাড়িতে তার একমাত্র আশ্রয় ছিলেন তোমার ছোড়দা। তার সঙ্গেও সম্পর্ক খারাপ হয়ে উঠেছিল। তোমার কাছেই একথা আমি শুনছি। ব্যতিক্রম ছিলেন তোমার মা। তাকে আমি চোখে দেখিনি। তবু তার কথা যতটুকু শুনেছি বুঝেছি তিনি আমাদের নমস্য। তিনি যা পেরেছেন তা অনেকেই পারবেনা। আমার ধারণা তিনি বুঝেছিলেন যা ঘটেছে তার দায়টা কেবল মাত্র তোমার বউদির ওপর চাপিয়ে দিলে চলবেনা। সেজন্যই তোমাদের মত অতটা রূঢ় হতে পারেননি। ওর অর্ন্তদৃষ্টি সত্যিই অসাধারণ ছিল।

অবন্তীর মনে পড়ল ছোড়দা মারা যাওয়ার পর একদিন বউদি তার কাছে এসেছিল।

—বিন্তী তোমাকে কয়েকটা কথা বলব। হয়ত কোনদিন এসব বলতাম না। কিন্তু তোমাকে দেখে বুঝি আমাকে তুমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছনা। বিশ্বাস করো যা ঘটেছে তার সব দায়টুকু আমার ছিলনা। আমি দুর্বল ছিলাম। আমি অনেক কিছু ঠেকাতে পারিনি। কিন্তু প্রথম দিকে এই অপরাধে সায় ছিলনা আমার। তোমাকে যদি কয়েকটা কথা বলি—

উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠেছিল অবন্তী।

—এত নির্লজ্জ তুমি? এখনও বেশিদিন হয়নি ছোড়দা মারা গেছে এখনই তুমি তার নামে অপবাদ দিতে চাইছ? তুমি কেমন স্ত্রীলোক কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসব বলছ আমায়?

ম্লান দেখিয়েছিল অর্চনার মুখ।

—বিশ্বাস করো কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসব বলছিনা। শুধু মনে হোল—

—তোমার কি মনে হোল তা নিয়ে এতটুকু মাথাব্যথা নেই আমার। রূঢ়ভাবে অর্চনাকে থামিয়ে দিয়ে তার সামনে থেকে চলে এসেছিল অবন্তী। এসব কথা ঘুণাক্ষরেও জানেনা সুধাংশু। আশ্চর্য তবু সে যা বলছে তার সঙ্গে যেন কোথায় মিল খুঁজে পাচ্ছে অর্চনার কথায়।

তবু বিরক্ত লাগে অবন্তীর। অর্চনাকে নিয়ে মাথাব্যথা কেন সুধাংশুর? কি করতে চায় সে তার জন্য?

—এসব কথা থাক। আমি ভুক্তভোগী। আমার জ্বালা তুমি বুঝবেনা। কিন্তু তুমি কি বলতে চাইছ?

—আমি বলছি বউদিও আমাদের সঙ্গে থাকবেন। একজন নিরাশ্রয় মহিলাকে আশ্রয় দেবেনা তুমি অবন্তী? আমি চাই আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে থাকব। দেখবে কি সুন্দর সংসার হবে আমাদের। ভালবাসা, বিশ্বাস আর মর্যাদা থাকবে সেই সংসারের ভিতে। স্বার্থপরের মত শুধু নিজেদের সুখের কথা ভাবব কেন আমরা? কেন আমরা সবাইকে নিয়ে সুখী হবোনা? বউদি যাই করুন, যত অপরাধই করুন, এখন তার মত দুঃখী কে আছে? সকলেই আঙ্গুল দিয়ে দেখাবেনা তাকে? বলবেনা এই ভয়ঙ্কর স্ত্রীলোকটির জন্য দুইজন পুরুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল? বিন্তী তুমি বলছ তোমার দিদি এখন অনেকটাই ভালো। আমার বিশ্বাস আমাদের সংসারে এসে আরও সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে সে। আমরা তার বিয়ে দেব দেখেশুনে। আর বউদি থাকুননা আমাদের মাথার ওপরে অভিভাবিকার মত? তুমি তো চাকরি ছাড়বেনা। আমাদের বাড়ির ঘর গৃহস্থালীর ভার দিয়ে দেব তাকে। দেখবে কি সুন্দর ছন্দে চলবে সব কিছু। বিন্তী তুমি তোমার সব ভার, সব দায়িত্ব, সব চিন্তাভাবনা আমার ওপরে নিঃশর্তে ছেড়ে দাও। আমি তোমায় মিনতি করছি।

অবন্তীর সব প্রতিরোধ, সব প্রতিবাদ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। অনেক লড়াই করে রণক্লান্ত সৈনিকের মত পর্যুদস্ত বোধ করছিল সে। সুধাংশুর শক্তি মনেপ্রাণে অনুভব করতে করতে আত্মসমর্পণ করল সে নিঃশর্তে।

—আমি আর কিছু বলবনা। তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম সবকিছু। তোমার যেমন ইচ্ছা করো।

কৃতজ্ঞ চোখে অবন্তীর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ সুধাংশু অপলকভাবে, পরে আস্তে আস্তে তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসল নিজের বুকে। অবন্তীর শঙ্খশুভ্র পেলব ঘাড়ে দীর্ঘায়িত একটি চুম্বন এঁকে স্তবপাঠের ভঙ্গীতে বলতে লাগল সে বারবার—'তুমি ঠকবেনা বিন্তী। দেখ তুমি ঠকবেনা।'